

~*MASUD RANA SERIES*~

Palao Rana By Kazi Anwar Hossain



For more free Books, Songs, Software,
PC games, Movies, Natok,
Mobile ringtones, games and themes etc.
please visit
www.murchona.com/forum



Scanned By:

Abu Naser Mohammad Hossain (Sumon)

Email:

anmsumon@yahoo.com, anmsumon@gmail.com

মাসুদ রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

পালাও, রানা

স্পিটসবার্জেন-আর্কটিক সার্কেলের বরফমোড়া এক ল্যান্ডস্কেপ।
জায়গাটা নরওয়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল রাশিয়া, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে
আশঙ্কায় খমকে গেল বিশ্ব। জানা গেল, বাংলাদেশেরই এক কীর্তি
সন্তান জায়গাটাকে পেটে সাজিয়ে মস্কোর হাতে তুলে দিয়েছে।
একদল কমান্ডো নিয়ে ছুটে গেল মাসুদ রানা ও সোহানা। পুঁটা
বেরণেটে বিশ্বের সবচেয়ে কঠোর ট্রেনিং পাওয়া, সবচেয়ে সুশৃঙ্খল
এবং নির্দয় স্পেৎসনাজ বাহিনীর সামনে পড়ে গেল রানা বাহিনী।
পালাবে পথ নেই। সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে ম্যাকারভ।



সেবা বই

প্রিয় বই

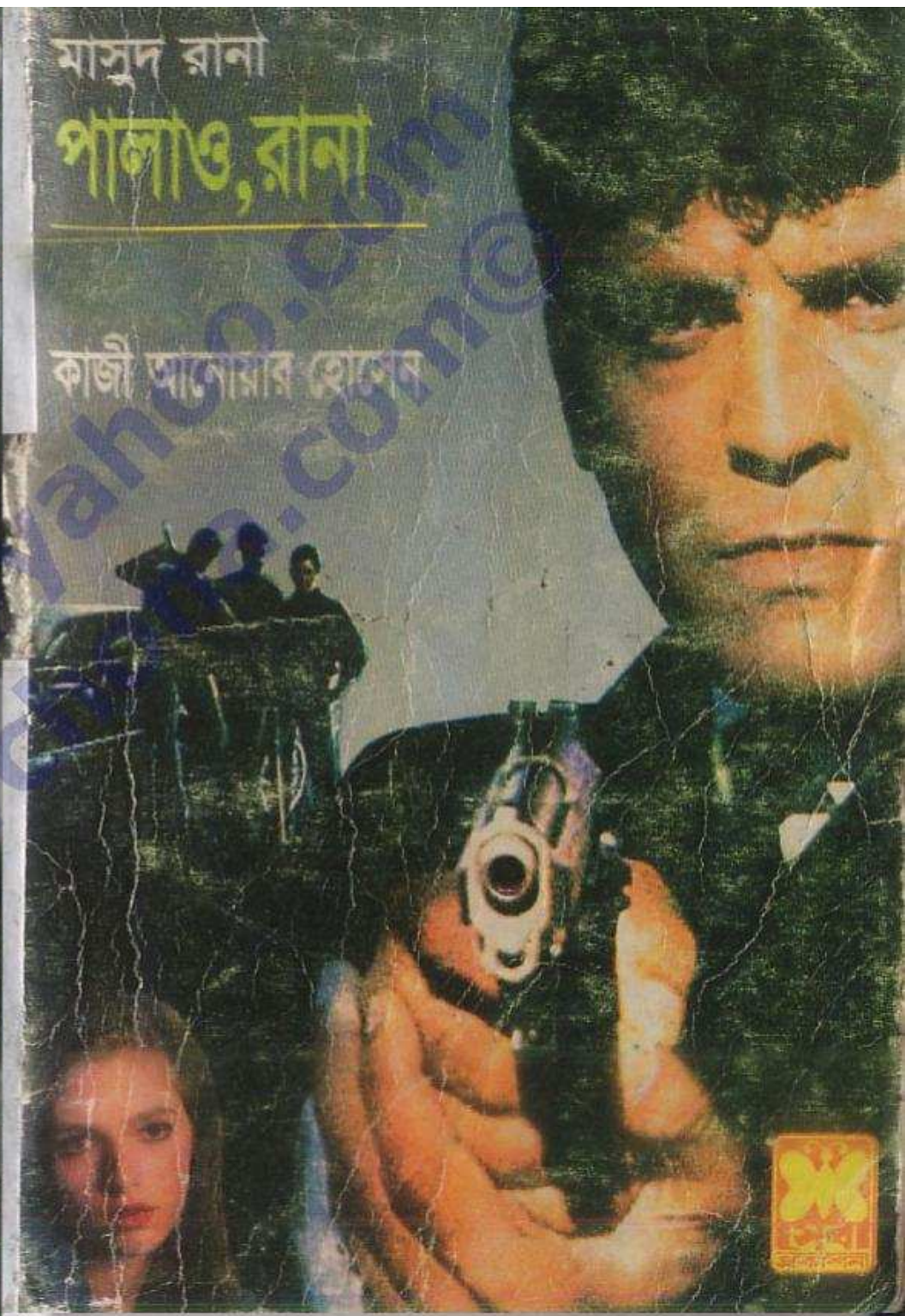
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ১৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাঙ্গাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো রুম: ৩৮/২ক বাঙ্গাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

পালাও, রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন



১১৩-১১৪	আমবৃশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-	২১৭-২১৮	মহাশিৱারী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১১৫-১১৬	আরেক বরমুতা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-	২১৯-২২০	দুই নক্ষত্র-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
১১৭-১১৮	কেনাথী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/-	২২১-২২২	কৃষ্ণাঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১১৯-১২০	নকশা ত্রাণ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-	২২৩-২২৪	কাপোছনা-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
১২১-১২২	রিপেটার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-	২২৫-২২৬	নকশা বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
১২৩-১২৪	মলমার্গ-১,২ (একত্রে)	৩৮/-	২২৭-২২৮	বৃত্ত সূত্র-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১২৬	বৃক+চ্যাপের	৪৪/-	২২৯-২৩০	বর্ষা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১২৮-১২৯	১২৮ শিকের-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-	২৩১-২৩২-২৩৩	রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
১২৯-১৩০	শর্বা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-	২৩৪-২৩৫	অশ্রুমায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
১৩২-১৩৩	শুকপক্ষ+কুব্জবেশ	৪৪/-	২৩৬-২৩৭	বার্ষ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৩৩-১৩৪	স্বর্গদেব শ্রুত-১,২ (একত্রে)	৩৬/-	২৩৮-২৩৯	নীল দংক-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১৩৫-১৩৬	স্বর্গপুত্র-১,২ (একত্রে)	৪৫/-	২৪০-২৪১	সাঁটসিয়া ১০০-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৭-১৩৮	অক্ষকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-	২৪২-২৪৩-২৪৪	কালপুত্র-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
১৩৯-১৪০	মহাশয়ক-১,২ (একত্রে)	৩৫/-	২৪৫-২৪৬	নীল বহু ১,২ (একত্রে)	৩২/-
১৪১-১৪২	মহাশয়ক-১,২ (একত্রে)	৪০/-	২৪৭-২৪৮	সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-	২৪৯-২৫০	অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৬/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃখ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-	২৫১-২৫২	স্বীকৃত স্মৃতি ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৪৭-১৪৮	বিশ্বব্য-১,২ (একত্রে)	৪১/-	২৫৩-২৫৪	রক্তচোরা+সাত হাজার ধন	৪৩/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদেব-১,২ (একত্রে)	৪৩/-	২৫৫-২৫৬	বিদ্যাবাস+মাদকত্ব	৪৩/-
১৫১-১৫২	শুভ সুস্থ-১,২ (একত্রে)	৪০/-	২৫৭-২৫৮	অপারেশন বসনিয়া+ট্যাগেটি বাংলাদেশ	৩৮/-
১৫৩-১৫৪	নন্দিনী মধ্যরাত+মাকিয়া	৪৬/-	২৫৯-২৬০	হুয়াংলু+সুখরাজ	৩৬/-
১৫৫-১৫৬	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৩৭/-	২৬১-২৬২	ক্রিস্টে হিয়া ১,২ (একত্রে)	৪৬/-
১৫৭-১৫৮	কে কেন ভিজাবে+কুচক	৪৭/-	২৬৩-২৬৪	মুহুরা কান+সীমালকন	৪৫/-
১৫৯-১৬০	যুক্ত বিশ্ব-১,২ (একত্রে)	৪৮/-	২৬৫-২৬৬	মায়ন প্রোজার+কুবুবি	৪১/-
১৬১-১৬২	চাঁই সাত্তাজ-১,২ (একত্রে)	৩২/-	২৬৭-২৬৮	বড়ের পূর্ণাঙ্গ+কানসাপ	৩৮/-
১৬৩-১৬৪	জুয়াজী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-	২৬৯-২৭০	আরেক নৃত্যবাস+শরতানের ঘাঁটি	৪৬/-
১৬৫-১৬৬	সত্যাবা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-	২৭১-২৭২	দুর্গম গিরি+তুঙ্গপের তাস	৩৮/-
১৬৭-১৬৮	যাত্রী হারানোর+অপারেশন চিতা	৪০/-	২৭৩-২৭৪	মরণবাণ+সিমেট প্রজেক্ট	৪২/-
১৬৯-১৭০	আক্রমণ ৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-	২৭৫-২৭৬	গুদুভুদু+অগ্নিবর্ণ	৩৭/-
১৭১-১৭২	১৭০ শাপন সফল-১,২,৩ (একত্রে)	৫৪/-	২৭৭-২৭৮	ককটের বিশ্ব+সর্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
১৭৩-১৭৪	দংক-১,২ (একত্রে)	৪২/-	২৭৯-২৮০	বোনটন জলহে+সরকের সিকনা	৩৩/-
১৭৫-১৭৬	স্নাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৩৬/-	২৮১-২৮২	শহতানের দেগের+কিলার কোবরা	৪২/-
১৭৭-১৭৮	ভিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-	২৮৩-২৮৪	কুহেলি রাত+শঙ্করের মক্কা	৪৩/-
১৭৯-২০০	ডাবল এজেক্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-	২৮৫-২৮৬	বিবাহ ধরা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
২০১-২০২	অমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-	২৮৭-২৮৮	পালাও, রানা+স্বপ্নময়	৪৭/-
২০৩-২০৪	অগ্নিশপ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-	২৮৯-২৯০	দুই সিনেমা ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২০৫-২০৬	২০৫ জাশানী ফ্যান্টাসী-১,২,৩ (একত্রে)	৫৩/-	২৯১-২৯২	স্বাভাবিক+আরেক গল্প	৪২/-
২০৭-২০৮	সাক্ষর শরতান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-	২৯৩-২৯৪	স্বাভাবিক+আরেক গল্প	৪২/-
২১০-২১১	গল্পসংগ্রহ-১,২ (একত্রে)	৩৬/-	২৯৫-২৯৬	স্বাভাবিক+আরেক গল্প	৪২/-
২১২-২১৩	২১২ নক্ষত্র-১,২,৩ (একত্রে)	৪৫/-			

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি শুধু প্রকৃত বিক্রয়, তাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিলিং, ক্রেকড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মূল্য বা কটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হতে চলেছে। নভেম্বরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত টানা চার মাস সূর্যের মুখ দেখিনি আকটিক ল্যান্ডস্কেপ। এ আধারের যেন কোন অভ নেই। অবশ্য মেঘমুক্ত আকাশে দিনের বেলা বরফের প্রতিফলন অদ্ভুত এক আলো সৃষ্টি করে, অনেকটা জোহনার মত। দেখতে কোন সমস্যা হয় না।

প্রথমদিকে ব্যাপারটা ভাল লাগত না পলকভনিক (কর্নেল) ম্যাকরডের। দিনকে মনে হত মরা মরা, নিরীহ। গত দু'মাসে তা সয়ে গেছে, এখন সে সব ভুলে গেছে সে। মনে মনে হাসল লোকটা, একদিন হয়তো এই পরিবেশই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে তার কাছে। হয়তো মক্কোর প্রতিদিনের সূর্যকেই তখন আর ভাল লাগবে না।

মক্কোর কথা মনে হতে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরলো। দু'মাসের কিছু বেশিই হবে আকটিক অঞ্চলের স্পিটসবার্গেন নামের বাজপড়া এই জায়গায় এসেছে সে, এরমধ্যে স্ত্রী আর একমাত্র ছেলের মুখ দেখার সুযোগ হয়নি। আরও কতদিন হবে না, সেটা অনিশ্চিত। দু'মাস, চার মাস? নাকি ছয় মাস? কানের লতি চুলকে সামনে তাকাল সে। যত মাসই লাগুক, কিছু করার নেই তার। ভাবচক্র দেখে মনে হচ্ছে, শুধু তার কেন মক্কোরও কিছু করার নেই।

সে ক্ষমতা যদি কারও থাকে, তো প্রফেসর ত্রিপাঠীর আছে। এখন সে-ই স্পিটসবার্গেনের মা-বাপ। লোকটা যা বলে, এক কথাই তাই মনে নেয় মক্কো। কোন প্রশ্ন তোলে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, পলিট ব্যুরোর বেশিরভাগ সদস্যের সাথে কড়া দহরম-মহরম রয়েছে মানুষটার। রীতিমত শঙ্কা করে তারা সবাই প্রফেসরকে। ম্যাকরড জানে, এই লোকটির প্রস্তাব পেয়েই স্পিটসবার্গেনকে হজম করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

এ-ও আরেক অদ্ভুত কাণ্ড। কোন বিদেশীর কথা মত তার দেশ কখনও এমন কাজ করেছে বলে নিজের নেই। সত্যিই বড় অদ্ভুত।

কন্ট্রোল টাওয়ারের জানালা দিয়ে বাইরের এয়ারফিল্ডের দিকে তাকাল কর্নেল ম্যাকরড, তারপর পূর্বদিকে। প্রথমেই চোখে পড়ল বিশাল কোল-লোডিং জেটি। ওটার কাছেই প্রফেসরের মাইনিং অফিস। বড়, দোতলা বিল্ডিং। ওটার দু'পাশে আরও কয়েকটা বিল্ডিং আছে, ওগুলো অন্য মাইনারদের। মাথায় বরফের পুরু স্তর। জুন মাস পর্যন্ত থাকবে ওরকমই। তারপর, সূর্য উঠলে একটু একটু করে পলতে শুরু করবে।

পশ্চিমের প্রশস্ত ফিল্ডের দিকে তাকাল কর্নেল। স্রেফ বরফের মাঠে পরিণত হয়ে গেছে ওটা। সামনে লংইয়ারবিয়ন এয়ারফিল্ডের রানওয়ে। বড় এক পাহাড় আছে ওটার শেষ মাথায়। যদিকে চোখ যায়, সেদিকেই পাহাড় এই হতচ্ছাড়া

জায়গায়। তবে রানওয়ের শেষ মাথার পাহাড়টা অনাগুলোর মত এবড়োখেবড়ো বা চোখা চুড়োর নয়, ওটার চুড়া প্রায় সমতল।

দূর থেকে ভৌতিক কঠামোর মত লাগে দেখতে। তার ওপরে টিপ টিপ করে জুলছে কিছু তারা। মাথা প্রায় সমতল বলে স্থানীয়রা পাহাড়টার নাম রেখেছে পুটা বেরগেট। গরমকালে চেহারা বদলে যায় ওটার, এখানকার এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের কাছে শুনেছে সে, জুলাইয়ে বরফ পুরোপুরি গলে যায়, তখন জ্যাস্ত হয়ে ওঠে পাহাড়ের ওপাশের এক ছোট উপত্যকা। লাল ও হলুদ রঙের ছোট ছোট ফুলে ভরে ওঠে জায়গাটা। বুনো রেইনডিয়ার তার নিচের ঢালে চরে বেড়ায়। কখনও কখনও পোলার বেয়ারও দেখা যায় একটা-দুটো।

কিন্তু বছরের এই সময়ে প্রাচী বেরগেট জমে থাকে, মুখ ভার করে থাকে। চেহারা দেখলে ভয় লাগে।

'ফ্লাইট ঠিক সময় লাগু করছে তো, পলকভনিক? পিছন থেকে ভরাট গলার প্রশুটা শুনে সচকিত হলো কর্নেল।

'ইয়েস, স্যার,' প্রায় অ্যাটেনশন হয়ে পেল লোকটাকে দেখে। প্রফেসর ত্রিপাঠী, দৈর্ঘ্যে প্রায় তার সমানই হবে মানুষটা, কিন্তু চওড়ায় বেশি। দেহের তুলনায় মাথাটা বড়। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া, কাঁচাপাকা চুল। এলোমেলো। জুলফির কাছে বেশিরভাগ পাকা। ওগুলো তার চেহায়ায় চমৎকার একটা আভিজাত্যের ছাপ এনে দিয়েছে। বয়স পঞ্চাশের মত।

ওভারকেট খুলে দরজার হুকে ঝুলিয়ে রাখল সে, এক পা টেনে টেনে ধীরপায়ে এসে দাঁড়াল তার পাশে। এক পায়ে সমস্যা আছে শুধু লোকের। চেহারা বেশ প্রসন্ন। অতিরিক্ত শ্রদ্ধা করে বলে হোক, অথবা ভয় করে বলেই হোক, একটু সরে দাঁড়াল কর্নেল ম্যাকারভ। কেন যেন এই লোকের বেশি কাছে যেতে সাহস হয় না তার। নিজের চারদিকে ব্যক্তিত্ব আর কর্তৃত্বের এমনই এক দুর্ভেদা দেয়াল তৈরি করে রেখেছে লোকটা, যার থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ বলে মনে হয়।

প্র্যান-প্রোগ্রাম প্যাকা হওয়ার পর মস্কোয় প্রফেসরকে প্রথমবার দেখেই টের পেয়েছিল সে, এ লোক হুকুম তামিল করতে জন্মায়নি। জানেছে হুকুম দিতে।

'ফটিন অ্যান্ড জিরো ফাইভ আওয়ারে, রাইট?' এবারের প্রশুটা নির্ভুল কশ উচ্চারণে করল লোকটা। তাকে এশিয়ান মনে হয় ম্যাকারভের, খুব সম্ভব ভারতীয়। অনেকগুলো ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে।

'রাইট, স্যার,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সে। ভেতরে ভেতরে বিস্মিত, একদম নীরব সময় লোকটা কি করে জানল ভেবে। কর্নেল নিজেই জেনেছে পাঁচ মিনিট আগে। মারমানস থেকে আকাশে ওড়ার পর এখানকার টাওয়ারকে জানিয়েছে সেটার পাইলট। ম্যাকারভ জানালে তবুই ত্রিপাঠীর জানার কথা, অথচ সে জানায়নি। তার কোন ধারণাই নেই যে এখানকার ঐতিহ্য টেলিফোনে আড়ি পাতার ব্যবস্থা করে রেখেছে ত্রিপাঠী। এমনকি তারটাতও। অ্যারোক্রাফটের ম্যানেজার হয়ে যেদিন সে এসেছে, তার কদিন আগে থেকে।

তার চিন্তা পড়ে ফেলল প্রফেসর। ত্রিপাঠীর কোণে হাসির আভাস দুটি ফুটি করলেও ফুটল না। মিলিয়ে গেল। ঘড়িতে নজর বুলিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে

তাকাল। তারপর যেন নিজেই শোনাচ্ছে, এমনভাবে বলল, 'সময় বেশি নেই। বাকি প্রস্তুতি সেরে ফেলা ভাল।'

'স্যার!' ব্যস্ত হয়ে উঠল কর্নেল। রুমের আরেক মাথায় বসা নরওয়েজিয়ান ট্রাফিক অফিসার লোকটার দিকে তাকাল। ফলভিক নাম তার। ছোটখাট, পঞ্চাশ-পঞ্চাশের মত বয়স। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। 'মিস্টার ফলভিক, নতুন কোন ইনফর্মেশন?'

কাজ থেকে মুক্ত তুলল না সে। মাথা নাড়ল, 'না।' জানা কথা, জবাবটা 'না'-ই হবে। কেন না, খবর কিছু এলে সঙ্গে সঙ্গে তাকেই জানাবে ফলভিক। তবু ত্রিপাঠীকে তৎপরতা দেখানোর জন্যে প্রশুটা করেছে সে। 'আমি কি কিংসে যাব, স্যার?'

'এখনই কেন?' বলল প্রফেসর। 'সময় আছে এখনও। শুধু শুধু ঠাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কি দরকার?'

সামনে তাকাল। মুহূর্তে ভুলে গেছে কর্নেলের কথা। অন্য কথা ভাবছে। স্পিটসবার্গেনের বড় এক কয়লা খনির মালিক সে। স্পিটসবার্গেনকে ২০ বিলিয়ন ডলারে মস্কোর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে সুযোগ বুঝে।

ওটা আসলে কথার কথা। সোয়ালবার আর্কিপেলাগোর এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা গ্রাস করতে পারলে সোভিয়েত ইউনিয়নের কি লাভ, সেই আইডিয়াই কেবল বিক্রি করেছে সে মস্কোর কাছে। প্রথমে দর হৈকেছিল ৪০ বিলিয়ন, কিন্তু ওরা এমন অনুনয়-রিনয় শুরু করে দিল, শেষ পর্যন্ত অর্ধেকই রাজি হতে হলো। না হয়ে উপায় ছিল-না। ওদেশের পলিট ব্যুরোর কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্যের সাথে তার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাদের মাধ্যমেই প্রেসিডেন্টের কানে প্রশুটা পৌঁছে দিয়েছিল সে। পরে যখন তারাই ধরাধরি শুরু করে দিল, তখন রাজি না হয়ে উপায় কি?

অর্ধেক টাকা চুক্তি অনুযায়ী আগেই পেয়ে গেছে সে, এখন ভালয় ভালয় অবশিষ্ট কাজ মিটে গেলে বাকি টাকা নিয়ে কেটে পড়বে। পশ্চিমা বিশ্বের সাথে মস্কোর কুস্তা-কামড়াকামড়ির মধ্যে থাকার কোন ইচ্ছে তার নেই।

বুক ভরে আর্কটিকের ঠাণ্ডা বাতাস টেনে নিল সে। সামনের উন্মুক্ত এয়ারফিল্ডের দিকে তাকিয়ে মনে মনে জন মানরো লংইয়ারের উদ্দেশে বলল, 'চির স্বর্গবাসী হও, ভায়া। সুখে থাকো। পরক্ষণে আনমনা হয়ে গেল।

বরফ যুগে এই এলাকা ছিল নো-ম্যানস-ল্যান্ড, ভাবছে প্রফেসর ত্রিপাঠী। কেউ আসত না। অনেক-অনেক পরে, ১৯০৫ সালে এক আমেরিকান, জন মানরো লংইয়ার ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হয় এখানে। কোল মাইনিং শুরু করে। তার দেখাদেখি আরও অনেকেই আসে। প্রচুর কয়লা এখানে কাজেই মাইনিং ব্যবসা দিনে দিনে বিস্তার লাভ করতে থাকে।

একবারে গায়ের ওপরে বলে কয়েক বছর পর জায়গাটা দখল করে নেয় নরওয়ে। প্রথমে এ নিয়ে হস্ততানি করেছিল মস্কো, কিন্তু সে সময় ভারশালিত রাশিয়া দুর্বল ছিল বলে বিশেষ কাজ হয়নি তাতে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা নরওয়ের দখল মেনে নেয়। মাইনিং ব্যবসা আরও বাড়ার ব্যাপারে অসলোর সাথে

আলাপ-আলোচনা শুরু করে। প্রথমবার তাতে ছেদ পড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে। যুদ্ধ শেষে কয়লা উত্তোলন শুরু করে তারা। কয়েক বছর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেলে আবার তা বন্ধ হয়ে যায়।

নাজি বাহিনী দখল করে নেয় গোটা সোয়ালবার আর্কিপেলাগো। যুদ্ধের শেষ দিকে রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংল্যান্ড সম্মিলিত অভিযান চালিয়ে দখল করে অঞ্চলটা। সে কথা মনে রেখে যুদ্ধের পর নরওয়ে নতুন আইন করে স্পিটসবার্গের ক্ষেত্রে। তা হলো: যে কোন দেশ বা ব্যক্তি নির্দিষ্ট অঞ্চল কর দিয়ে কয়লা তুলতে পারবে সেখান থেকে। তবে কোনমতেই জায়গাটাকে সামরিক স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে না কেউ।

এ নিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, রাশিয়াসহ প্রায় বিশটি দেশ সই করে তাতে। সেই থেকে বলাতে গেলে সবার এজমালি সম্পত্তি ছিল স্পিটসবার্গের। কোন বুট বা মেলা নেই, হাঙ্গামা ছজ্জত নেই, সবাই যে যার খনি থেকে কয়লা তুলছে, দেশে পাঠাচ্ছে।

ত্রিপাঠীও শুরু করেছিল কাজ, কিন্তু ক'মাস যেতে না যেতেই অদ্ভুত এক আইডিয়া জন্ম নেয় তার মাথায়। সেটাকে ঘেমেজে মস্কোর কাছে বিক্রি করার উদ্যোগ নেয়। আর কি ভাগ্য, টোপ ফেলতে না ফেলতে টোপ-ফাৎনা-ছিপ সবসুদ্ধ গিলে ফেলে ওরা। অবশ্য গিলবে না-ই বা কেন? সেটা এমনই এক প্রান, কাজে লাগাতে পারলে মাত্র দু'বছরের মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্র বদলে যাবে। একটাই মাত্র পরিশক্তি থাকবে তখন বিশ্বে-সেটা হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

পাশ থেকে খুক করে কেশে উঠল কর্নেল। 'স্যার, সময় হয়ে এসেছে।'

মাথা ঝাকাল প্রফেসর। আকাশের দিকে তাকাল। একটু পরই দেখা দেবে ওটা। তারপর...

দুই

'লংইয়ার ইনফরমেশন, দিস ইজ অ্যারোফ্লোট টু ও সেভেন,' রেডিওতে এয়ারলাইনার পাইলটের দূরগত কণ্ঠ শোনা গেল।

সিধে হয়ে বসল নরওয়েজিয়ান এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার। উঠে রুমের মাঝখানের দীর্ঘ ক্লসসোলের কাছে এসে একটা মাইক্রোফোন তুলে নিল। 'অ্যারোফ্লোট টু ও সেভেন,' জানালার কাছে দাঁড়ানো লোক দুটোর ওপর চোখ রেখে বলল সে। 'গো অ্যাহেড।'

সিভিল এভিয়েশনের জন্য নাম রাখা বুলি আওড়াই শুরু করল পাইলট, সন্ধ্যা অ্যারাইভেল টাইম জানাল। ফলভিক জানাল বাতাসের গতি, এডিভ ডেস্পারেচার, ভিজিবিলিটি ইত্যাদি। এখানকার রানওয়ে পূর্বদিক থেকে প্রায় সোজা পশ্চিমে গেছে। এ মুহূর্তে বাতাস বইছে পশ্চিম থেকে। কাজেই বাতাসের বিপরীতেই ল্যান্ড করা উচিত রুশ লাইনারের, ভাবছে ফলভিক। সেটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু রুশরা কখনোই তা করে না। কারণ তাতে পাহাড়ঘেরা প্রশস্ত এক উপত্যকার ওপর পৌঁছে উচ্চতা কমাতে হয়। তাতে কিন্তু সমস্যা হয় না কোন, আর সব দেশের এয়ারলাইনার তাই করে। কেননা লংইয়ারবিয়ন এয়ারফিল্ডে ইসট্রুমেন্ট-ল্যান্ডিং সিস্টেম অত্যাধুনিক-একবারে লেটেন্সি। তারপরও রুশরা বুকি নিয়ে বাতাসের দিকে পিছন ফিরে ল্যান্ড করে। তাতে একটা সুরিষেও অবশ্য আছে, প্রশস্ত ফিওর্ডের ওপর দিয়ে পৌঁছতে অনেক কম সময় লাগে। কিন্তু ল্যান্ডিংয়ের সময় নিজের গতি আর বাতাসের ঝাঝা সামলে উঠতে জান খারাপ হয়ে যায় পাইলটের।

ল্যান্ডিং উইল বি অন রানওয়ে 'ওয়ান জিরো,' পাইলটের ব্রিটিশ উচ্চারণের ইংরেজি ভেসে এল।

'স্টেশন ম্যানেজার' ম্যাকারভের দিকে ফিরল ফলভিক। বলল, 'বাতাসের গতি বিশ নট। অন্য মাথায় নামা উচিত টু ও সেভেনের। নইলে টাচ ডাউন খুব ফাস্ট হবে।'

'সেটা তাকেই ভাবতে দিন,' জবাব দিল কর্নেল। 'বুকিটা তাকে নিতে হচ্ছে, আপনাকে নয়।'

শ্রাগ করল কন্ট্রোলার। আমার কি?-ভাবল সে। পরামর্শ দেয়া দরকার, দেয়া হয়েছে। শোনা না শোনা ওদের ইচ্ছে।

'কমেসিং ডিসেন্ট,' পাইলট বলল। কণ্ঠ পরিষ্কার উদ্বেগ।

'নিজের ইচ্ছেমত ল্যান্ড করুন,' নিরাসক্ত জবাব ফলভিকের। 'রানওয়ে ক্লিয়ার আছে।' তার প্রথম বাক্যটা ল্যান্ডিংয়ের সমস্ত দায়-দায়িত্ব টু ও সেভেনের পাইলটের কাঁধে চাপিয়ে দিল। রুটিন প্রিনে সময়টা লিখে রাখল সে।

কয়েক মিনিট পর জেট বোয়িংয়ের গর্জন শোনা গেল রেডিও বীকনে। মর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে প্রফেসর ত্রিপাঠী। নাক প্রায় জানালার সাথে ঠেকে রয়েছে। চেহারা চাপা উদ্বেগ। টু ও সেভেনের নেভিগেশন লাইটের বিলিক দেখছে সে। ফিওর্ডের অন্য মাথার দিকে চলে যাচ্ছে ওটা, উচ্চতা কমে আসছে একটু একটু করে। তিন হাজার ফুটে নেমে ঘুরবে ওটা, তারপর শুরু হবে ফাইনাল অ্যাপ্রোচ। অ্যাকশন শুরু হলে যা যা ঘটবে, মনে মনে তার কাল্পনিক ছবি দেখছে প্রফেসর।

নিচের টারম্যাকের দিকে তাকাল। একজন নরওয়েজিয়ান পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। নিরস্ত। তার নীল ইউনিফর্ম ট্রাউজার হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বুটের ভেতর গৌজা। হাঁটুতে শুরু করল লোকটা, প্রকাণ্ড খিলানের মত হ্যাঙ্গারের দিকে যাচ্ছে। ওটাই টার্মিনাল বিল্ডিং হিসেবে ব্যবহার হয়। ঘুরে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারকে দেখল সে। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বসে আছে লোকটা। শব্দ দৃষ্টিতে ফিওর্ডের দিকে তাকায় রয়েছে। লোকটার সতর্কবাণী কিছুটা অস্বস্তিতে ফেল দিলেও শেষ পর্যন্ত সামলে নিল ত্রিপাঠী। কিছুই ঘটবে না, ভাবছে সে, নিরাপদেই ল্যান্ড করছে পারকেটু ও সেভেন। যদি কোনরকম মিসজাজ না করে বসে পাইলট।

ফিরে আসতে শুরু করেছে লাইনার। ফ্লাকাসে আলোয়, ওটার নেভিগেশন লাইটগুলোকে চলমান তারার মত লাগছে। হঠাৎ করে ল্যান্ডিং লাইট দুটোও জ্বলে

উঠল ওটার। দুটো দানবীয় চোখ যেন, মোটা বাঁম হুঁড়ে খুঁজছে ঘাস করার মত কি আছে।

'আরোরোফ্রোট টু ও সোভেন ফাইনালস্,' উচু গলা শোনা গেল পাইলটের।

'রানওয়ে ইজ ফ্রী ফর ল্যান্ডিং,' সাড়া দিল ফলভিক। এই কথাটা আত্র কোন লাইনারের ফেলে ব্যবহার করে না সে, করে শুধু আরোরোফ্রোটের বেলায়। অপ্রচলিত ইডিয়ম ওটা।

ওদিকে ত্রিপাঠী ও ম্যাকারভ রক্তধ্বাসে তাকিয়ে আছে আলোর পিছনে প্লেনটার সুবিশাল কাঠামোর দিকে। ক্রমে আকাশ ছেয়ে ফেলতে শুরু করেছে ওটা। টাচ ডাউনের সুবিধের জন্য শূন্য সমান্তরাল করছে ওটাকে পাইলট। লেজের দিকটা মনে হচ্ছে যেন নিচ হয়ে আছে। ল্যান্ডিং লাইটের তীব্র আলোয় চোখ ঝলসে গেল প্রফেসরের, তবু নজর সরাবার কথা ভাবছে না সে, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে।

একবারে শেষ মুহূর্তে পাইলট ডুল করেছে বুঝতে পেরে দম আটকে এল তার। শেষ পর্যন্ত মিসজাজই করে বসেছে হারামজাদা, আশঙ্কা হলো ওর। একটু দেরিতে টাচ ডাউন করল টুপোলভ, করেই কামানের গোলার বেগে টাওয়ারের সামনে দিয়ে পুবদিকে ছুটে গেল। চোখের কোনা দিয়ে ফলভিককে ক্র্যাশ বাটনের দিকে হাত বাড়াতে দেখল ত্রিপাঠী, অসহায়ের মত রানওয়ের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। বাটন টিপে দেবে কি না বুঝতে পারছে না।

ওদিকে রিভার্সে দেয়ার ফলে ভয়াবহ গর্জন ছাড়ছে টুপোলভের তিন এঞ্জিন। ছোটখাট একটা ভুবার ঝড় লেগে রয়েছে লেজের সাথে, অনুসরণ করছে প্লেনটাকে। গোটা টাওয়ার ধরধর করে কাঁপছে, বনবন করতে জানালার কাঁচ। পাইলট ঘন ঘন বেক চাপছে বলে টুপোলভও কাঁপছে ভীষণভাবে।

এরমধ্যে গোটা রানওয়ে খেয়ে ফেলেছে ওটা। শেষ আখার ঢালের দিকে ছুটছে এখন কাঁপতে কাঁপতে। ঢাল নেমে গেছে ফিওর্ড-ওয়েইস্ট ল্যান্ড ওটা। বিপর্যয়টা বোধহয় তেমনো গেল না ভেবে শক্ত হয়ে উঠল প্রফেসর। এত মতের প্ল্যান শেষ মুহূর্তে এভাবে কেঁচে যাচ্ছে দেখে মাথা বিগড়ে গেল। দু'হাত শক্ত মুঠো পাকিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'স্টপ! স্টপ! হারামজাদা মাথামোটা...!'

ওদিকে কর্নেলের দেহ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে কি যেন বলছে বিভ্রবিত্ত করে। গাল, চোখের কোণ কঁচকে আছে। ঠোঁট সরে গেছে দাঁতের ওপর থেকে। গেল! ভাবছে সে, দুর্ঘটনা ঘটলে তদন্ত হবে, ফাঁস হয়ে যাবে সব। তারপর... সারা দুনিয়া ছি ছি করবে।

অন্যদিকে ফলভিক আর উপায় নেই দেখে বাটনে তালুর চাপ বাড়াতে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ পাল্টে গেল পরিস্থিতি। দানবটাকে মোটামুটি বাগে নিয়ে এল পাইলট, রানওয়ের একদম আঁড়ে কড়া বুক কয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলল। শক্তিশালী সিঁড়ির ধাক্কায় সামনের দিক বেশ খানিকটা নিচ হয়েই দোল খেয়ে উঠে পড়ল ওটার নাক। এঞ্জিনের ভয়াবহ হুমকির খেমে গেল চক্ৰ করে, অলসভঙ্গিতে ঘুরে এ-মুহুর্তে হলো উল্টামুহুর্ত। চেপে রাখা দম একসাথে ছাড়ল ত্রিপাঠী ও ম্যাকারভ।

ফলভিকও। বাটন থেকে হাত সরিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'গিয়েছিল আরেকটু হলে!'

'আমার তা মনে হয় না,' আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে মাথা নাড়ল কর্নেল ম্যাকারভ। 'আপনি বোধহয় জানেন না, আমাদের পাইলটরা শুধু পৃথিবীর সেরা নয়, সবচেয়ে অভিজ্ঞও।'

ঘুরে টাওয়ারের সামনে এসে দাঁড়াল প্লেন, এয়ারফিল্ডের কর্মচারীরা গ্যাংওয়ে নিয়ে ছুটল ওটার দিকে। টাওয়ারে উপস্থিত অপর দু'জনকে দেখল ফলভিক, নিচু গলায় কি যেন বলছে বয়স্ক মানুষটা, 'স্টেশন ম্যানেজার' তার প্রতিটা কথায় মাথা দুলিয়ে সাম্ন দিচ্ছে। কি বলছে মাইনার? ভাবল সে। তাকে এত হুজুর হুজুর করছে কেন লোকটা?

ওদিকে আরোরোফ্রোটের পায়ে ভিড়েছে গ্যাংওয়ে। চারজন দাঁড়িয়ে আছে ওটার গোড়ায়। তাদের দু'জন নরওয়েজিয়ান পুলিশ, একজন এয়ারপোর্ট কমান্ড্যান্ট, এবং শেষেরজন ম্যাকারভের সহকারী। এয়ারলাইনারের দরজা একটু খুলল, তারপর পুরোটা। এক সুন্দরী স্টয়ার্ডেস দেখা দিল দোরগোড়ায়, ম্যাকারভের সহকারীর উদ্দেশ্যে কিছু বলল। এর একটু পর দোরগোড়ায় দেখা দিল প্রথম 'যাত্রী'।

গাঢ় রঙের পুরু কোট পরা। তার পিছনে একই পোশাকের আরও কয়েকজন বের হলো। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল প্রফেসর। দেখতে সাধারণ মনে হলো ও ওরা আসলে অসাধারণ। পৃথিবীর সেরা সৈনিক-স্পেশসমাজ। সবচেয়ে কঠোর ট্রেনিং পাওয়া, সবচেয়ে সুশৃঙ্খল এবং নির্দয়, রুশ প্যারট্রুপার।

টাওয়ারের ভেতরে কোন শব্দ আসছে না বাইরে থেকে। প্রফেসর ত্রিপাঠীর মনে হচ্ছে মুক ছায়াছবি দেখছে সে। যার চিত্র-নাট্যকার সে নিজে।

কোট পরা ডজনখানেক যাত্রী নেমে এসে নিচের তিন নরওয়েজিয়ানকে সুকৌশলে ঘিরে ফেলল। তারপরই শুরু হলো আসল খেলা। সোভিয়েত বর্ডার পুলিশ ট্রুপের এক ফুল ইউনিফর্মড অফিসার দেখা দিল দোরগোড়ায়, এক মুহূর্তও দেরি না করে নেমে আসতে শুরু করল সে। তার পিছনে একদল পুলিশ। মিলিটারি গ্রেটকোর্টের ওপরে লেদার বেল্ট ও হোলস্টার পরে আছে তারা। এয়ারপোর্ট কমান্ড্যান্টকে বেইনী ভেঙে বের হওয়ার বাথ চেঁচা করতে দেখল প্রফেসর। মানুষটার চেহারাও হাত নাড়ায় প্রতিবাদের ভাষা, কিন্তু দৃঢ়ভাবে ধামিয়ে দেয়া হলো লোকটাকে। তার অর্থহীন আফালন দেখে হাসল সে।

এদিকে বহ্নাহতের মত দাঁড়িয়ে ছিল এয়ার কন্ট্রোল অফিসার ফলভিক। হঠাৎ সচকিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কি হচ্ছে এসব? কারা এসেছে ওই প্লেনে?'

স্রোতের মত বর্ডার ট্রুপস নামছে টুপোলভের পেট থেকে, জগিং করতে করতে নিচে এসে লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছে তারা। ওদিকে দুই নরওয়েজিয়ান পুলিশকে দু'দিক থেকে ধরে রেখেছে 'যাত্রীরা'। জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

'এ অন্যান্য!' উত্তেজনায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ফলভিক। 'এখানে সৈন্য পাঠিয়ে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে আপনার দেশ। চরম অন্যান্য করেছে। আমি সিনেলম্যানকে রিপোর্ট করতে যাচ্ছি এখনই।'

তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল প্রফেসর। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তাই করুন, গ্লীজ। তাকে এখনই এখানে আসতে বলুন। আমি কথা বলব তাঁর সাথে।'

'আপনি!' বিশ্বয় ফুটল ফলভিকের চেহারায়া। 'আপনি কে? গভর্নর আপনার সাথে কেন...'

'কারণ ইনিই সব,' ম্যাকারভ থামিয়ে দিল লোকটাকে। হাত ইশারায় পিছনের এয়ার ফিল্ড দেখিয়ে বলল, 'ওখানে এখন যা ঘটছে, সব এর পরামর্শেই ঘটছে। তাই আপনার গভর্নরকে এর সাথেই কথা বলতে হবে।'

'আপনি কি বলছেন বুঝতে পারছি না আমি,' একটু একটু কাঁপছে নরওয়েজিয়ান এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার। 'কি ঘটছে এসব?' আতঙ্কিত চোখে বাইরে তাকাল। ফিল্ডে ছোটোছোটো করছে রুশ বর্ডার পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা। এখানে-সেখানে পজিশন নিতে গুরু করেছে। সবার হাতে অত্যাধুনিক রাইফেল। তাদের অ্যাকশন দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে সবকিছু।

'এখনও কিছুই ঘটেনি,' ম্যাকারভ বলল। 'আপনি যা দেখছেন, তা কেবল সূচনা। আসল ঘটনা একটু পর ঘটবে। আপনি গভর্নরকে ফোন করুন এখনই। তার ডেস্কের ওপরের দুটো টেলিফোনের একটা নির্দেশ করল সে। ওটা সরাসরি গভর্নরের অফিসের সাথে সংযুক্ত, জানা আছে তার। 'দ্যাট'স আন অর্ডার!'

কাঁপা হাতে রিসিভার তুলল ফলভিক। 'কি... মানে, কি বলব তাঁকে?' ব্যাটারি ফোলা গালে কমে এক চড় মারতে ইচ্ছে হলো কর্নেলের। কিন্তু সামলে নিল। 'বলবেন, সোয়ালবারের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন নরওয়ের সাথে জয়েন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্যবস্থা পড়ে তুলতে আগ্রহী। রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে...'

চোয়াল বুলে পড়ল লোকটার। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সামনে দাঁড়ানো লোক দুটোকে দেখছে পালা করে। হঠাৎ কথাটার ভেতরের অর্থ ধরতে পারল সে, রাগ ফুটল চেহারায়া। বুক টান করে দাঁড়াল। 'এটা আমাদের দেশ, মিস্টার! রাশিয়ার সাথে কোন রকম "জয়েন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন" গড়ার কোন ইচ্ছে নেই আমাদের।'

'ভুল বললে, বন্ধু,' হাসি ফুটল কর্নেলের মুখে। আড়চোখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নির্বিকার প্রফেসর ত্রিপাঠীকে দেখে নিল। 'এখানে আমরা মেজরিটি। তেইশশো রুশ মাইনার। নরওয়েজিয়ান আছে মাত্র এগারোশো। নাকি আজকাল গণতন্ত্রে আর আস্থা নেই নরওয়ের?'

'ভূতের মুখে রাম নাম?' বলল ফলভিক। 'সোয়ালবার ট্রীটি...'

'ওটা পাঁচ দশকের পুরনো,' বাধা দিল কর্নেল। 'অচল হয়ে গেছে। আমার দেশ নতুন ট্রীটি স্বাক্ষরিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। সে যাক, আপনি খবরটা জানাবেন গভর্নরকে না আমি জানব?'

বেশ সময় নিয়ে কাজটা করল ট্রাফিক অফিসার। তারপর রিসিভার ক্রোডলে রেখে হাতের উল্টোপাশে কপালে বেলাল। এত শীতেও ওখানে একটু একটু ঘাম জামাছে টের পেয়ে অবাক হলো সে।

'আমি ঘণ্টা পর আরও দুটো প্লেন আসছে আমাদের,' তাকে সামলে ওঠার

সময় দিয়ে বলল কর্নেল, 'ওস্তোবোর ল্যান্ডিংয়ের ব্যাপারে অ্যাবসোলিউট প্রায়োরিটি দিতে হবে আপনাকে। মনে রাখবেন, আপনি যতক্ষণ আমাদেরকে সহযোগিতা দেবেন, ততক্ষণ আমরাও আপনাকে সহযোগিতা দিয়ে যাব।'

বক্তব্য শেষ করে সমর্থনের আশায় প্রফেসরের দিকে তাকাল লোকটা। সব কথা ঠিকঠাক মত বলা হয়েছে কি না জানতে চায়। মাথা সামান্য নেড়ে সমর্থন জানাল ত্রিপাঠী।

মনে মনে হাসছে। ছয় মাস আগে ঠিক যেভাবে যা ঘটবে ভেবেছিল, সেভাবেই ঘটছে সব। মস্কোকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে সে। এখন আর একটা কাজ শুধু বাকি, ওটা শেষ হলেই বাকি টাকটা পেয়ে যাচ্ছে। তারপর ছুটি।

তিন

ব্রাসেলস হিলটন। রিসেপশন রুমের বারম্যানরা আজ জিনস, কাউবয় শার্ট এবং স্টেটসন হ্যাট পরেছে। কোমরের বেলেট হোলস্টার, তার মধ্যে নকল কোল্ট। এর কারণ, আজকের রাত 'স্টেট অভ জর্জিয়া' হিসেবে পালন করছে হিলটন। সারা হলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিজনেস গেস্টদের স্কচ আর বারবন পরিবেশন করছে বারম্যানরা।

হলের এক প্রান্তে একটা নিচু স্টেজ, তার ওপর স্কারলেট ও'হারা সেজে দাঁড়িয়ে আছে আমেরিকান এক সুন্দরী। শুধু সুন্দরী নয়, খুবই সুন্দরী সে। ধপধপে সাদা ক্রিনোলিন স্কার্টে তার রূপ যেন হাজার গুণ বেড়ে গেছে। পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফ্রক-কেট পরা রেট-বটলার।

'আমাদের চেয়ে ও দুটোকে আরও বড় আহাম্মকের মত লাগছে,' এক বারম্যান আরেক বারম্যানের উদ্দেশে ফিস্‌ফিস করে বলল। 'কি বলো?'

'গর্দভের মত লাগছে,' জবাব দিল এরিক ব্রাউন। কাউবয় গিয়ারে ভীষণ অস্বস্তি লাগছে তার। কিন্তু এসব নিয়ে এ মুহূর্তে আলোচনা করতে চায় না। কিছুই করতে রাজি নয় সে এখন, স্রেফ তথ্য জোগাড় করা ছাড়া। এ ধরনের পার্টিতে কান বাড়া রাখলে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

একটু পর স্টেজে উঠল গেস্ট অভ অনার, মার্কিন রাষ্ট্রদূত। বিশালদেহী মানুষ। নীল সুটে তাকেও ভালই মানিয়েছে ও'হারার পাশে। তার দিকে তাকিয়ে গালে টোল ফেলে হাসল মেয়েটা। 'আশা করি আপনার লাইব্রেরির জন্যে এই স্মারক স্মৃতিটি গ্রহণ করে আমাদেরকে ধন্য করবেন, স্যার,' একটা বই এগিয়ে নিল।

মিল ওটা রাষ্ট্রদূত, একটু ইতস্তত করে ও'হারার গালে চুমু খেল। 'আজ এখানে আমরা যে অবিশ্বাস্য সমর্থনা দেয়া হলো,' বলল লোকটা। 'তার কথা সারাজীবন মনে থাকবে আমার। আমি কৃতজ্ঞ।' হাততালির শব্দে মুগ্ধ হয়ে উঠল হল। ওর মধ্যেই ভাষণ দিয়ে চলল রাষ্ট্রদূত: 'এখানে উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে

খন্য মনে হচ্ছে আমার... মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও বেলজিয়ামের মধ্যকার দূর বন্ধুত্ব...
 অতিয়েদের ওপর সতর্ক নজর রেখেছে এরিক ব্রাউন। সিলকের ড্রেস পরা
 এক মোটা, বয়স্ক বেলজিয়ান মহিলাকে টেবিল থেকে সম্ভরণে এক টুকরো
 ফুটবের গ্ল্যান তুলে সবার অলঙ্কে দ্রুত মুখে পুরতে দেখে হাসল মনে মনে।
 লোভ, ভাবল সে, বয়স বাড়লে বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে এই জিনিসটার
 বাড়াবাড়ি দেখা দেয়।

রপ্তদেতের দীর্ঘ ভাষণ শেষ হলো এক সময়, 'গন উইদ দা উইন্ড' জুটি
 বিদেয় নিল ওয়ালয়ের তালে তালে, তারপর শুরু হলো ডিনার। সময় যত
 গড়াচ্ছে, ততই নার্ভাস হয়ে উঠছে এরিক ব্রাউন। সাজা তার অপেক্ষায় আছে।
 দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলে না গেলে হয়। থাকবে তো মেয়েটা? যন্ত্রের মত এক
 কূটনীতিকের গ্লাসে বারবন চালতে চালতে ভাবল, ওর দেরি দেখে চলে যাবে না
 তো?

নিশ্চয়ই না। ও থাকবে, যাবে না। কারণ সাজাও ওই মোটা মেয়েছেলেটার
 মত লোভী। অবশ্য খাওয়ার বেলায় নয়, এখনও ওর সে বয়স আসতে অনেক
 দেরি আছে। সাজার একমাত্র আকর্ষণ হচ্ছে এরিক ব্রাউন। তাকে ছাড়া ইদানীং
 আর কিছু ভাবতেই পারে না মেয়েটা। বিয়ে করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে।
 মনে মনে হাসল এরিক, পাগল আর কাকে বলে!

ঠিক আটটায় ডাক ডি আরেনবার্গ রেস্টুরেন্টে পা রাখল সাজা কারমেন। পরিচিত,
 প্রায় নিয়মিত খন্দেরটিকে দেখে হাসিমুখে বাউ করল ম্যানেজার। পথ দেখিয়ে
 নিয়ে চলল নির্দিষ্ট টেবিলের দিকে। মেয়েটা বসতে মৃদু গলায় বলল, 'ভায়োলা,
 ম্যাডাম। ড্রিন্স?'

'থ্যান্স ইউ,' হেসে মাথা দোলাল সাজা। লোকটার অপসূরমাণ পিঠের দিকে
 তাকিয়ে থাকল। ডাক ডি আরেনবার্গ তার খুব প্রিয়। এখানকার পরিবেশ খুব
 আপন মনে হয়। রান্নাও চমৎকার। জায়গাটা রয়্যাল প্যালেসের কাছেই এক নির্জন
 রাস্তায়। হিলটন থেকে হেঁটে আসতেও মাত্র দশ মিনিট লাগে। এরিকের সুবিধে
 হয়। ওর সুবিধের জন্যেই এই রেস্টুরেন্ট বেছে নিয়েছে সাজা। হিলটনে থাকে সে।

ম্যানেজার ফিরে এল তার পছন্দের পানীয় মাসকাডেট ওয়াইন নিয়ে। গ্লাসটা
 টেবিলে রেখে সাজার হাতে মেনু তুলে দিল। কিন্তু ওটা একপাশে সরিয়ে রাখল
 সে। 'আমার ফ্রেন্ড এলে অর্ডার দেব।'

'নিশ্চই, ম্যাডাম।' সরে এল ম্যানেজার, এমন এক জায়গায় দাঁড়াল যেখান
 থেকে মেয়েটাকে ভাল করে দেখা যায়। মেয়েটা ইংরেজ, ম্যানেজার জানে। ধারণা,
 বয়স তেরিশ পেরিয়েছে। এই বয়সের নৃমণীদের কি বলে মেন ইংরেজরা? ইংলিশ
 রোজ না? হ্যাঁ, তাই। তবে এই ফুলটি তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারাতে বসবে, জন্ম
 সে। পাঁচ দশ বছর আগে যে সপ্তম ছিল, তার কিছুই প্রায় নেই। যৌনাবদন বলে
 কী একটা থাকে মেয়েদের মধ্যে, তাও নেই। তবুও পর চেহারাও সাদামাটা।

তাহলে ওর চেয়ে অল্পবয়সী ওই জার্মান ছোকরা কি দেখে মেয়েটাকে পিছনে
 লোপে জাচ্ছে? শুধুই শরীরটার লোভে? মেয়েটার ফিগার আছে তাতে কোন সন্দেহ

নেই, কিন্তু যৌবন... শ্রাণ করল ম্যানেজার। অন্ধকারে সব বেড়ালকেই কালো মনে
 হয়।

সে জানে ন্যাটো হেডকোয়ার্টার সে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করে মেয়েটা।
 বেতনও নিশ্চয়ই ভাল পায়। হিলটনের এক বাবামানের সাথে মেয়েটির এই ঘনিষ্ঠ
 সম্পর্ক... এরিক কোথায় চাকরি করে, একদিন দুর্ঘটনাবশত ব্যাপারটা জানতে
 পেরে খুবই বিস্মিত হয়েছিল সে। কে মেন তাকে বলেছিল লোকটা ফ্রী-ল্যান্স
 সাংবাদিক। খবরটা মিথ্যা প্রমাণ হওয়ায়... এরিক ব্রাউনকে দেখে সোজা হলো
 সে। সিলক টাই আর কার্ডির জ্যাকেটে লেখকের মত দেখাচ্ছে ছোকরাকে। 'ওউ
 ইভনিং, স্যার।' এগিয়ে এসে বলল ম্যানেজার। যদিও খুব একটা উৎসাহ দেখাল
 না। বারম্যান তো বারমানই, সে যতবড় হোটেলেরই হোক না কেন। 'ম্যাডাম
 আপনার অপেক্ষায় আছেন।'

দ্রুত পায়ে সাজার কাছে এসে দাঁড়াল যুবক। তার হাতে চুমু খেয়ে বলল,
 'আমি খুব দুঃখিত, ডার্লিং। কাজে আটকে গিয়েছিলাম।'

'ও কিছু নয়,' হাসল সাজা। 'বেশিক্ষণ হয়নি আমি এসেছি।'

ম্যানেজারকে সিন্থানো আর সোজার অর্ডার দিল এরিক। এ সময় হুইস্কি
 হলেই ভাল হত, কিন্তু বেলজিয়ান হুইস্কির দাম বেশি মনে হয় তার। এক বোতল
 কিনতে গেলে একদিনের রাহাখরচের অর্ধেকই বেরিয়ে যায়। তাই কিনে খায় না
 সে। দরকারও পড়ে না। ন্যাটো, কমিশারি থেকে তার জন্যে দামী দামী ব্রিটিশ,
 আমেরিকান ডিউটি ফ্রী হুইস্কি কিনে রাখে সাজা। রাতে ওর অ্যাপার্টমেন্টে
 দেদারসে তাই গেলে।

'আজ দেরি হলো কেন, ডার্লিং?' যুবকের হ্যান্ডসাম চেহারার দিকে অপজক
 তাকিয়ে আছে সাজা। এমন এক সুদর্শন, সুপুরুষ তার বয়স্কেন্ড, ভাবলেই
 দেহমনে পুলক জাগে। তাকে রোজই কাছে পায় সে, কিন্তু তাতে ওর মন ভরে
 না। বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত ভরবেও না। যত ইয়েই হোক না প্রতিদিন।

'আর বোলো না,' চোখেমুখে বিরক্তি ফোটাল এরিক। 'কড় এক পার্টি কাভার
 করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। ম্যাগাজিনের সম্পাদক বলল, আর কি। যাচ্ছেতাই!
 এমন বোরিং, কি বলব? দুটো মণ্টা...'

'আহা, বেচারী!' চোখমুখ করুণ হয়ে উঠল সাজার। ইচ্ছে হলো এখানেই
 একটু আদর করে প্রেমিককে।

'ভেবো না,' এরিক বলল। 'আগামী মাসে ডের স্পিগেলে একটা ফিচার
 রাইটারের পদ স্থাপি হচ্ছে। তখন এইসব ছোটখাট ম্যাগাজিনে আর থাকছি না
 আমি। সে যাক, এখন বলো কি অর্ডার দেয়া যায়,' বলে স্কর নামাল সে।
 'এমনিতে আজ দেরি হয়ে গেছে। বেশি খাওয়া ঠিক হবে না, কি বলো?'

রাশ করল সাজা। দুটি নত হয়ে এল আপনাপনি। 'হ্যাঁ।
 স্ট্রিপড কি,' ভাবল এরিক ব্রাউন। ম্যাকনামো! 'তোমার চুলে সোনালী রং
 করালো কেমন হয়? আমার তো মনে হয় চমৎকার লাগবে।'

'সত্যি?' আবার রাশ করল মেয়েটা। 'কিন্তু অফিসের লবাই কি বলবে কে
 জানে!'

কি বলবে মানে? তুমি না বলেছিলে তোমার বস জেনারেল অ্যাডারসন র্ত্ত মেয়েদের পছন্দ করে?

'তা করে, মাথা ঝাঁকাল সান্দ্রা। কিন্তু তার জন্যে কেন ও-কাজ করতে যাব? করলে তোমার জন্যে করতে পারি।'

'ঠিক আছে। তাহলে তাই করো।'

'অবশ্যই!' বলল সান্দ্রা। 'জানো, এরিক, তোমার সাথে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ নিজেকে খুব ধনা মনে হয় আমার।'

মাথা নাড়ল যুবক। 'না, মাই লাভ। বরং আমারই নিজেকে ধনা মনে হয়।'

ওয়েটার এসে অর্থহীন প্যানপ্যানানির হাত থেকে উদ্ধার করল তাকে। খাওয়ার ফাঁকে অন্য বিষয় তুলল সে। 'তোমার অফিসের খবর কি? আজ নিশ্চই খুব ব্যস্ত দিন গেছে?'

'হ্যাঁ। খুব অস্থিরতার মধ্যে কেটেছে।'

'গুনলাম রুশরা নাকি সোয়ালবার ছেড়ে যাওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে?' বলল এরিক। 'রয়টার দিয়েছে খবরটা। আমি অবশ্য ওটা কবজা করার সুযোগ পাইনি। অন্য এক ফ্রী ল্যান্সার আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে। ছোটখাট মিডিয়ায় কাজ করার এই হচ্ছে এক যন্ত্রণা। অল্প পয়সায় যার-তার কাছ থেকে খবর কেনে ওরা।'

'অর্থাৎ এই খবরের বিনিময়ে তুমি কিছু পাচ্ছে না তোমার ম্যাগাজিন থেকে?'

'পাব কি করে? আমার আগেই তো আরেকজন পাঠিয়ে দিয়েছে।'

সহানুভূতির চোখে এরিককে দেখল সান্দ্রা। 'তোমার এডিটর এ ব্যাপারে জানতে আগ্রহী?'

শ্রাণ করল যুবক। 'জানি না। তবে আগ্রহী হবে না-ই বা কেন? হাজার হোক, পত্রিকার এডিটর তো!'

'কিন্তু তোমাদের মিউনিখ তো আর্কটিক থেকে অনেক দূরে।'

'তা হোক, মাথা দোলল জার্মান। 'এটা কি যা-তা খবর? কানায়ুযায় গুনলাম, ন্যাটো নাকি এরইমধ্যে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে ঝাড়া হয়ে গেছে। আমার তো মনে হয় এই ঘটনা মেজর কনফারেন্সের জন্য দেবে রাশিয়া আর ন্যাটোর মধ্যে।'

মাথা দোলল সান্দ্রা। 'হ্যাঁ! তা হয়তো দেবে।'

'বোঝো তাহলে!' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল এরিকের। 'এরকম মুহূর্তে যদি এখনকার ভেতরের দু'চারটে খবর আগেভাগে পেয়ে যাই, তাহলে আমার, আই মীন, আমাদের ভবিষ্যৎ... তুমি বুঝতে পারছ তো আমি কি বলতে চাইছি, ডার্লিং? আমি অবশ্য বলছি না তুমি এমনি কিছু করো যাতে তোমার ক্ষতি হয়। তেমন কিছু কিছুতেই চাইব না আমি।'

ইচ্ছে করেই কিছু সময়ের বিরতি দিল সে। কয়েক চামচ বীফ আর জ্যাকেট পটেটো মুখে পুরে ওগুলোকে বাগে এনে ভর করল আবার। 'তবে কথা হলো, এ ব্যাপারে কিছু স্থপ নিউজ যদি ওদেরকে দিতে পারি, তাহলে নিশ্চই ডের স্পিগেলের চোখে পড়ে যাব আমি। তখন ওরাই খুঁজে নেবে আমাকে। বিয়েটা

তাহলে বেশ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে পারব আমরা।'

'কিন্তু, ডার্লিং, এ ব্যাপারে আমি নিজেও ঠিকমত কিছু জানি না,' সান্দ্রা বলল। 'এমন কি সোয়ালবারের নামটাও আজই প্রথম গুনলাম। তুমি ন্যাটো প্রেস অফিসের সাথে যোগাযোগ করলে ভাল হত না?'

বেশ্যা মাগী! মনে মনে বলল এরিক। 'ন্যাটো! করেছিলাম। ওরা কোনও মন্তব্য করতে রাজি নয়।'

'কিন্তু আমি সত্যি বলছি, এখনও ব্যাপারটা সম্পর্কে ভালমত কিছুই জানতে পারিনি আমি।'

'আহা, ঠিক আছে!' তাকে আশস্ত করার ভঙ্গিতে বলল এরিক। 'আজই জানতে হবে, এমন কথা কখন বললাম আমি? আজ না হোক কাল জানতে পারবে। কাল না হোক পরও। আফটার অল, তুমি ন্যাটো মিলিটারি কমিটির চেয়ারম্যানের অন্যতম পি.এ। তোমাকে তো জানতেই হবে।'

কিছু বলল না সান্দ্রা। খাওয়া থামিয়ে চুপ করে কি যেন ভাবছে। তার চোখে মুখে অজানা ভাবের ছায়া দেখে মনে মনে ঘাবড়ে গেল এরিক। বুঝল, বেশি চাপাচাপি হয়ে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'এই দেখো, ফালতু কথায় সময় নষ্ট করছি আমরা। এদিকে খাবার ঠাণ্ড হয়ে যাচ্ছে। নাও, নাও। খেয়ে নাও! তারপর? নতুন ওয়াল পেপার লাগিয়েছ অ্যাপার্টমেন্টে?'

এক ঘণ্টা পর। সান্দ্রার চমৎকার অ্যাপার্টমেন্টের বেডরুমে ক্লাস্ত দেহে শুয়ে আছে এরিক ও সান্দ্রা। প্রেমিকের বাহুতে মাথা রেখে চোখ বুজে আছে ভুগু মেয়েটা, ঘুম পাচ্ছে খুব। একটু একটু ভারী হয়ে উঠছে নিঃশ্বাস। এই সময় আবার পুরানো প্রসঙ্গ তুলল যুবক। মৃদু কণ্ঠে নিজের জীবন ও লক্ষ্যের কথা বলল, কাল্পনিক ব্যবসায় বাবার শেষ সম্বল পেনশনের কয়েক হাজার মার্ক খুইয়ে কিভাবে মাসের পর মাস অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে বেঁচে থাকার জন্যে নতুন একটা সম্বল বুঁজে বেড়িয়েছে, বেশ ইনিয়ো-বিনিয়ো বলল এরিক।

সান্দ্রার খেয়াল হলো, কখন যেন অজান্তেই উঠে বসেছে সে। এরিকের 'দুঃখের' কাহিনী শুনে বুক ফেটে যাচ্ছে তার। চোখ দিয়ে দরদর করে পানি গড়াচ্ছে। 'তোমার বাবা এখন কি করেন? মানে ওদের সংসার...' কান্নায় গলা বুজে এল তার। প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না।

ওকে আড়াল করে চোখ মটকাল এরিক। মনে মনে হেসে খুল। 'বাবা? বেঁচে নেই। ওই টাকার শোকে...' ইচ্ছে করে কথা অসমাণ রাখল।

'মা?'

'মা আছে। মিউনিখে। তাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হয়।' চালিয়ে গেল সে, যদি এই পূর্ব-পশ্চিম ক্রাইসিস নিয়ে কয়েকটা স্থপ নিউজ করতে পারে, তাহলে হয়তো দিন ফিরবে। হয়তো কেন, অবশ্যই ফিরবে। ডের স্পিগেলের চাকরিটা পেলে বালিনে থাকা সুযোগ পাবে, মায়ের যত্ন নিতে পারবে। সান্দ্রারও ভাল লাগবে ওখানে। না লেগেই পারে না, কারণ বালিনের মত সুন্দর শহর ইওরোপে খুব কমই আছে ইত্যাদি ইত্যাদি বলে অল্পক্ষণের মধ্যেই একেবারে

অল্পদিনেই বাকি সব প্রাইভেট মাইনিং কোম্পানি পিছনে পড়ে গেল। অল্পদিনেই তাদের ফেলে অনেক মাইল এগিয়ে গেল সে। জমে উঠল ব্যবসা।

আরও একটা কাজ করল সে জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে। স্পিটসবার্গে যে জিনিস ছিল না, সেই রাগবি ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করল। চ্যাম্পিয়ন দলের জন্যে নগদ পুরস্কার ও ট্রফির ব্যবস্থাও করল সে। ফুটবল আগেও খেলা হত এবনে, কিন্তু কোন টুর্নামেন্ট হত না। এ কাজ করায় রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠল প্রফেসর। কয়েক মাসের মধ্যে জমে উঠল রাগবি খেলা। গত দু'বছরে আটটা টুর্নামেন্ট হয়েছে, তার পাঁচটায় জিতেছে তার দল। দু'বার জিতেছে নরওয়ে, একবার জার্মানি।

নিজের অবস্থান ভালমত পোক্ত করে পরবর্তী কাজে হাত দিল ত্রিপাঠী। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও খনির সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তার প্রধান সাহায্যকারী, রুশ সময় মন্ত্রী জেনারেল বরিস ইভানোভিচ স্টোলিপিনকে অচিন্তনীয় এক প্রস্তাব দিয়ে বসল। লোকটা সে সময় বাৎসরিক ছুটি ভোগ করছিল নিজস্ব দাচায়।

ছোটখাট মানুষ। বয়স পঁয়ষট্টির মত। সারা দেহ বনমানুষের মত লোমে ঢাক। ভুরু জোড়া ঔয়োপোকার মত মোটা, খুব ঘন। চোখ ছোট ছোট, তবে দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। বিপত্তীক। ছেলেমেয়েও নেই। একদম ঝাড়া হাত-পা।

প্রস্তাব শুনে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লোকটা। 'তুমি কি বলতে চাইছ, বুখলাম না।'

'বলছি, ধরো যদি এমন হয়, এক বছর পর দেখা গেল বিশ্বে একটাই মাত্র পরাশক্তি, আর তার নাম সোভিয়েত ইউনিয়ন। আমেরিকা তার তুলনায় হাজার মাইল পিছনে পড়ে গেছে, কেমন হয়?' বলল প্রফেসর।

আবারও তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাসল স্টোলিপিন। 'কাম অন, স্পাসিবো (বন্ধু)! তুমি ভাল করেই জানো তা কখনোই সম্ভব নয়।' ভোদকার গ্লাস তুলে নিল।

'আমি যদি বলি খুবই সম্ভব? যদি বলি তোমরা চাইলে মাত্র ছয় মাসে কাজটা সেয়ে ফেলা যায়?'

বিষম খেল মন্ত্রী। 'কিভাবে?'
রহস্যময় হাসি হাসল প্রফেসর। 'এবং ধরে নিতে পারি সে জন্যে শত শত বিলিয়ন, এমনকি ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করতেও পিছপা হবে না মস্কো?'

'অবশ্যই না! কক্ষনো না! কিন্তু সে সুযোগ...মানে...'
'আমি সে সুযোগ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে পারি, বন্ধু, দু' প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল প্রফেসর। 'বিনিময়ে মাত্র চল্লিশ বিলিয়ন ডলার চাই আমার।'

গ্লাস রেখে ঝাড়া দ'মিনিট তার দিকে অপেক্ষা তাকিয়ে থাকল স্টোলিপিন। 'যা বলছ বন্ধু বলছ তো? প্রমাণিসাফস করে জানাতে চাইল। 'তোমাকে আমি যতদূর চিনি, তাত্তে প্রকৃত এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তুমি ফালতু কথা বলছ নও।'

ওয়েল, দেন ইউ নো, আমি বলতে কখনো বলিনি। বা বলছি কাজের কথাই বলেছি।

আবার দীর্ঘ নীরবতা।

'তোমার প্রস্তাবটা ঠিক কি?' প্রশ্ন করল মন্ত্রী।
হাসল প্রফেসর। 'আগে কথাবার্তা পাকা হোক, তারপর সব জানতে পারবে।'

'একটু আভাস তো অন্তত দেবে! তুমি জানো এতবড় একটা সিদ্ধান্ত আমি একা নিতে পারি না। পলিট ব্যুরোর অন্যান্য সদস্য আছে, পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল, মানে খোদ প্রেসিডেন্ট আছে, তাদের সবার সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে। তারপর না...'

'আমিও তো তাই চাইছি,' বলল সে। 'এখন তোমাদের প্রেসিডেন্টও দাচায় আছেন। পলিট ব্যুরোর বাকি সদস্যরাও আছে। প্রয়োজনে একটা প্রাইভেট মীটিংয়ের ব্যবস্থা করতে পার তুমি। সবাইকে জানাতে পার আমার প্রস্তাবের কথা।'

'সে না হয় হলো। কিন্তু প্রস্তাবটা কি, সেটাই তো এখনও...'
'সময় হলে আমি জানাব। তার আগে আমাকে কিছু ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে।'

চোখ কুঁচকে উঠল মন্ত্রী। 'যেমন?'
মুচকি হেসে তার কাঁধে হাত রাখল প্রফেসর ত্রিপাঠী। 'ভুল বুঝো না, বন্ধু। তুমি, তোমরা আমাকে অনেক সাহায্য করেছ। আমি তার বিনিময়ে তোমাদের জন্যেও কিছু করতে চাই। তবে...'

'তবে কি?'

'দাবির অর্ধেক টাকা পেলে প্র্যান জানাব আমি। বাকিটা তোমাদের কাজ হয়ে গেলে দেবে।'

'কাম অন, ডিয়ার। তুমি মুখ খোলার আগেই বিশ বি-লি-য়-ন ডলার দাবি করছ। ব্যাপারটা একটু অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে না?'

তার চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়ল ত্রিপাঠী। 'না। কারণ আমি মুখ খুললেই প্র্যান জানার কিছু বাকি থাকবে না আর। তখন হয়তো টাকাটা পাব না আমি।'

'অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে আর বিশ্বাস করো না,' একটু গম্ভীর হলো বরিস স্টোলিপিন।

'বরিস, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। এটা কনট্রাক্ট, লেন-দেনের ব্যাপার। তোমরা আমাকে সাহায্য করেছ ঠিকই, কিন্তু সে জন্যে আগেই গুনে গুনে টাকা দিতে হয়েছে আমাকে। হয়েছে না? তাহলে আমাকে টাকা দিতে তোমাদের দ্বিধা থাকবে কেন?'

গুম মেরে বসে থাকল সময় মন্ত্রী।
'অবশ্য গুধু টাকা দিলেই চলবে না,' প্রফেসর বলল। 'একই সাথে আমার সাথে লিখিত এক চুক্তিও সই করতে হবে তোমাদেরকে। প্রেসিডেন্ট এবং পলিট ব্যুরোর যতজন সদস্য তোমরা রয়েছ, সবাইকে গুটায় সই করতে হবে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল মন্ত্রী। 'বরিসের চুক্তি?'

হাসি ফুটল প্রফেসরের মুখে। 'বাকি টাকা পরিশোধের, এবং আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বাসের চুক্তি।' গলা স্বপ্ন করে একদম বাদে নামিয়ে ফেলল সে। 'একই সাথে তোমার আর

আমার মধ্যেও একটা চুক্তি হবে। সেটা হবে খুব গোপনে, তুমি-আমি ছাড়া কেউ জানবে না তার খবর।

'তোমার কথাবার্তা ধোঁয়াটে লাগছে। খুলে বলো। দ্বিতীয় গোপন চুক্তিটা কিসের?'

চারদিকে তাকাল ত্রিপাঠী। 'এ ঘরে হয়তো কোন লুকানো মাইক্রোফোন-টোন থাকতে পারে।'

চোখ বড় বড় হয়ে উঠল মন্ত্রী। 'আমার দাচার!' বলেই হা- হা করে হেসে উঠল। 'কি আবোল-তারোল বকছ তুমি?'

পাশা দিল না ত্রিপাঠী, উঠে গিয়ে টিভি অন করল। ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে ফিরে এল নিজের জায়গায়। 'রিটায়ার করতে আর ক'বছর বাকি তোমার, বরিস?' প্রশ্ন করল সে।

'বছর পাঁচেক। কেন?'

'অবসর জীবন কোথায় কাটাতে চাও?'

শ্রাণ করল মন্ত্রী। 'এ নিয়ে কখনও চিন্তা করিনি। আর...আমি একা মানুষ, যে কোন এক জায়গায় কাটিয়ে দেব আর কি! কেন জানতে চাইছ এসব?'

জবাব দিল না ত্রিপাঠী। 'ধরো, যদি সুইটজারল্যান্ড কি বেলজিয়াম বা আর কোথাও তোমার অবসর জীবন কাটানোর ব্যবস্থা করে দেয়া হয়, তুমি আপত্তি করবে?'

জবাব না দিয়ে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ছোটখাট মানুষটা। চেহারায় চিন্তার ছাপ।

'বড় বাড়ি, লেটেস্ট মডেলের গাড়ি, ব্যাঙ্কে নিজের নামে কয়েক মিলিয়ন ডলার, ইচ্ছেমত খরচ করার স্বাধীনতা, জীবন যতভাবে সম্ভব উপভোগ করার সুযোগ, এসব পেতে ইচ্ছে করে না তোমার?'

জবাব নেই।

'আমাকে সাহায্য করার বিনিময়ে এসব খুব সহজেই তুমি অর্জন করে নিতে পারো, বরিস।'

'কি ধরনের সাহায্য?' মন্ত্রী অন্যানন্দ।

সেদিন আরও দু'ঘন্টা মন্ত্রী স্টেলিপিনের দাচার ছিল প্রফেসর ত্রিপাঠী। সমস্ত খুঁটিনাটি তাকে জানিয়ে, প্র্যান-প্রোগ্রাম পাকা করে তবে ফিরেছে। তাকে সাহায্য করবে কথা দিয়েছিল সমর মন্ত্রী, করেছেও। সে যতটা চেয়েছিল, তার চেয়ে বরং বেশিই করেছে।

তার তত্ত্বাবধানেই রুশ প্রেসিডেন্ট ও পলিট ব্যুরোর সদস্যদের স্বাক্ষর করা চুক্তিপত্র আর প্রথম দশ বিলিয়ন ডলারের চেক তার নাসাউ অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। ওখান থেকে সে সব সরিয়েও ফেলা হয়েছে অন্যখানে। আর দশ বিলিয়ন বাকি। কয়েকদিনের মধ্যে রুশরা ল'ইয়ারবিরেনে তাদের অর্লি ওয়ানিং রাডার বসাতে যাচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজটা হয়ে গেলেই দ্বিতীয় চেক পাচ্ছে সে।

ততক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্রীর স্বার্থ দেখার দায়িত্ব তার নিজের। কর্নেল ম্যাকারভ ততক্ষণ তার সব অর্ডিনেট হিসেবে কাজ করবে।

হঠাৎ করে বাস্তবে ফিরে এল প্রফেসর। ঘড়ির ওপর চোখ পড়তে ব্যস্ত হয়ে ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়াল। 'নরডিল,' সেক্রেটারির নাম উচ্চারণ করল সে। 'ম্যাকারভকে আসতে বলো।'

পাঁচ মিনিট পর নক করে ভেতরে ঢুকল ম্যাকারভ। তাকে দেখে মাথা ঝাঁকাল প্রফেসর। 'দরাজ গলায়-বলল, 'গুড ইভনিং, পলকভনিক!'

'গুড ইভনিং, স্যার।'

'বসুন, কথা আছে। ড্রিঙ্কস? হেলপ ইণ্ডরসেলফ,' হাত ইশারায় বাঁ দিকের দেয়ালঘেষে রাখা খুঁদে লিকার কেবিনেটটা দেখাল।

চার

রানা এজেন্সি। লন্ডন। সোয়ালবার ঘটনার চারদিন পরের কথা।

'বলেছি না আর কথা নয়?' ভেড়ে উঠল সোহানা। 'অনেক হয়েছে, এবার একটু ঘুমিয়ে নাও। সকাল হতে দেরি নেই।'

'চেষ্টা তো করছি, ঘুম না এলে আমি কি করব?' নিরীহ গলায় বলল মাসুদ রানা।

'সোটেই চেষ্টা করছ না তুমি। কেবল বক বক করছ।'

শব্দ করে হেসে উঠল ও। 'এই দেখো, একেই বলে "যার জন্যে করি চুরি সে-ই বলে চোর"।'

'মানে?' সোহানা বলল। রানার বেডরুমের কিং সাইজ খাটের হেড রেস্টে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে ও, ধপধপে সাদা শীটে বুক পর্যন্ত ঢাকা। জানালা দিয়ে আসা অন্তিমিত চাঁদের মৃদু আলোয় ওকে অপূর্ব লাগছে রানার। ধপধপে সাদা চাদরে ছড়িয়ে আছে ওর একরাশ কালো চুল, তার মধ্যে ফরসা মুখটা যেন ঝলমল করছে।

'আমার সঙ্গে কিছুদিন কাটাতে বলে এতদূর থেকে কাজ ফেলে ছুটে এসেছ...'

'কারেকশন,' বাধা দিল সোহানা। 'কাজ ফেলে আসিনি, শেষ করে তবে এসেছি।'

'ওই আর কি! সে কথা মনে রেখেই তো আমি চেষ্টা করছি তোমাকে সঙ্গ দিতে, আর তুমি সে জন্যে আমাকেই দায়ী করছ!'

'হয়চ্ছে। এক দিনেই সব সঙ্গ দিয়ে ফেললে কাল কি দেবে? নাও, শুয়ে পড়ো। আমি চলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।'

ক্লোরিডায় এক কাজে এসেছিল সোহানা। রানা লন্ডনে ছুটিতে আছে জানতে পেতে তাড়াতাড়ি সেটা সেরে কয়েকদিন ওর সাথে কাটাতে বলে গতকাল এসেছে এখানে। সাতদিনের ছুটির দরখাস্ত ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছে অবশ্য, কিন্তু রাহাত বান ছুটি দেবেন কি না ভেবে চিন্তায় আছে।

সারাদিন কেবল গল্পই করেছে ওরা। বহুদিন পর একান্তে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে মনের জমে থাকা সমস্ত কথা খুলাস করেছে। কিন্তু মন ভরেনি, দিন গেছে, রাতও যায় যায়, তবু কথা ফুরোতেই চায় না। এত কথা, এত গল্প কোথায় জমা ছিল, ভেবে অবাক দু'জনেই।

এয়ারকন্ডিশনারের একঘেয়ে গুঞ্জন শুনতে শুনতে চোখ জড়িয়ে এসেছিল, চলে প্রিয় নারীর ছোঁয়ায় তা আরও গাঢ় হলো, স্মিগ্ধ একটা অনুভূতি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল রানা। কতক্ষণ পর জানে না, টেলিফোনের শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল, চোখ মেলল চট করে। তাকিয়ে দেখল তখনও ঠিকমত আলো ফোটেনি। তবে ফরসা হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

ওর বুকের কাছে সোহানাকে ওটিসুটি মেরে শুয়ে থাকতে দেখল রানা। ঘুমে বিভোর। একরাশ কালো চুলের মধ্যে ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা অপূর্ব লাগছে।

আবার ফোন বাজতে হুঁশ হলো ওর। সোহানার ওপর দিয়ে বুকে ওপাশের বেড সাইড টেবিল থেকে টেলিফোনের হ্যান্ডসেটটা তুলে নিল ও, বিচ্ছিন্ন শব্দে হাই তুলে কানে লাগাল। 'ইয়েস!'

'ঘুম ভেঙেছে তাহলে!'

রাহাত খানের গলা শুনে একটা বাঁকি খেয়ে উঠে বসল ও। বেখেয়ালে উদ্যম হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে দেখে তাড়াতাড়ি শীট দিয়ে নিজেকে ঢাকল। আর যাই হোক, অন্তত এই লোককে ভুলেও বেডরুমে আশা করেনি। 'স্যার!'

ওর সম্বোধন শুনে চট করে চোখ মেলল সোহানা, মুহূর্তে গায়েব হয়ে গেছে ঘুম। মুখ সামান্য হাঁ।

'আপনি কোথায়, স্যার?'

'পথে,' বললেন রাহাত খান। 'নরফোক যাচ্ছি।'

তার মানে বুড়ো প্রেনে? ভাবল ও, স্যাটেলাইট ফোনে... 'বলুন, স্যার।'

'ওখানকার ন্যাটো হেডকোয়ার্টার্সে থাকব আমি। তোমাকে দরকার ওখানে, চলে এসো!'

করণ চোখে সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'আজই?'

'এখনই!' কড়া মিলিটারি মেজাজ ফুটল বুকের গুলায়। 'তোমার ছুটি ক্যানসেল হয়ে গেছে।'

'জি, স্যার,' একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল ও।

'সোহানাকেও নিয়ে এসো। ওর ছুটিও গ্র্যান্ট হয়নি। ফাস্ট অ্যাভেইলেবল ফ্লাইটে চলে এসো দু'জনে। রাখছি।'

লাইন কেটে গেছে শুনে হ্যান্ডসেট নামাল ও, শূন্য দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল সোহানা।

'ছুটির হাতে হ্যান্ডিকেন।'

'কারণ?'

'আমার, তোমার।' এক মুহূর্ত পর ব্যাপারটা খোলাস হতে আধ হাত জিভ কাটল রানা। 'আই, তুমি এখানে, সে কথা বুড়ো জানল কি করে?'

'অ্যা!' চোখ বড় বড় হয়ে উঠল সোহানার। 'কী বলছ?'

'উনি জানেন তুমি এখানে আছ।'

'ছি, ছি!' গালে লাল বং ফুটল সোহানার। 'কি লজ্জা! কি ভাবলেন উনি?'

'এখন আর লজ্জায় লাল হয়ে লাভ কি?' বলল রানা। 'যা হওয়ার হয়ে গেছে।'

এখন ওঠো, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।

'কেন? এখনই কিসের জন্যে...'

'আমরা নরফোক যাচ্ছি,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'বুড়ো যেতে বলেছে। হলো?' ওর দিকে হাত বাড়াল।

'আই, অসভ্য! কি হচ্ছে!' ধাবা মেরে ওর হাত সরিয়ে দিল সোহানা। 'বস ডেকেছেন? কেন?'

'কি জানি!' শ্রাগ করল ও। 'উঠে পড়ল বিছানা' ছেড়ে। মনে হয় দেখতে চাইছে তুমি পোয়াতি হয়েছে কি না।'

বেড সাইড টেবিল থেকে ওকে এক ঝটকায় টেবিল ঘড়িটা তুলে নিতে দেখে একদাফে বাধরুমে গিয়ে ঢুকল রানা, দু'হাতে মাথা আড়াল করে রেখেছে। খিল খিল করে হেসে উঠল সোহানা।

নর্থ আটলান্টিক ট্রাটি অর্গানাইজেশন বা ন্যাটোর জন্মস্থান প্যারিস। সিন নদীর তীরে বিখ্যাত প্যালাইস দো শ্যালিয়ট ভবনে ছিল প্রথম অফিস। কিন্তু ১৯৬৬ সালে সংস্থার কাজকর্মে বিরক্ত, ফুরুর প্রেসিডেন্ট দা গল তার দেশ থেকে অবিলম্বে ন্যাটোর অফিস সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেন। সে সময় বেলজিয়াম এগিয়ে আসে, নিজের দেশে অফিস খোলার প্রস্তাব দেয় ন্যাটোকে। দেশের উত্তরাঞ্চলীয় শিল্প শহর মনস-এর অর্থনৈতিক অবস্থা খুব করুণ ছিল তখন, অধিবাসীদের বেশিরভাগই বেকার। কাজ নেই।

সেখানেই গড়ে উঠল সুপ্রিম কমান্ডার অ্যালাইড ফোর্সেস ইউরোপ-এর হেড অফিস। ন্যাটো সদর দফতর গড়ে উঠল ব্রাসেলস এয়ারপোর্টের কাছে এভেরি নামে এক জায়গায়। এখনও সেখানেই আছে ওটা। দু'হাজারেরও বেশি আন্তর্জাতিক ও মিলিটারি স্টাফ দিনরাত কাজ করে এখানে, তাদের সাথে রয়েছে সংস্থার পনেরোটি সদস্য দেশের পনেরোশো কূটনৈতিক প্রতিনিধি। ন্যাটোর অফিশিয়াল ভাষা ইংরেজি ও ফরাসী।

সকালের রাশ আওয়ার ট্রাফিকের সাথে তাল রেখে অফিসের উদ্দেশে ছুটছে সান্ধ্য কারমেন। কিন্তু অফিসের কথা ভাবছে না সে, ভাবছে এরিক ব্রাউনের কথা। দু'জন একসাথে রাত কাটালে যা হয়, আজও তাই হয়েছে-ঘুম কম, প্রেম বেশি। এরিকের এই এনার্জিকে রীতিমত শ্রদ্ধা করে সান্ধ্য। মাস দেড়েক হলো তাদের পরিচয় ঘটিছে, এবটমধ্যে ওর অতীতের সঙ্গীহীনতার ঘাটতি প্রায় পুষিয়ে দিয়েছে মানুষটা। এত সুখ সহ্য হচ্ছে না সান্ধ্যর, মনে হচ্ছে, ও বুঝি পাগল হয়ে যাবে।

মেহন গেতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গার্ডকে পাস দেখাল সান্ধ্য, আনমনে ভাবছে, ও আমাকে গোধ ফেলোছে। এখন ও অসন্তুষ্ট হলে তারই ক্ষতি। এরিক সবে গেলে কি নিয়ে বাচবে সে?

গার্ড গেট খুলে স্যালিউট করল, বীরগতিতে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে সংস্থার সদস্য দেশগুলোর ফ্ল্যাগ পোস্ট। শিশির ভেজা সকালে নিখর হয়ে বুলছে ফ্ল্যাগ। ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোল সাজ্জা, ন্যাটোর চার মাথাওয়ালা নক্ষত্রের ব্রোঞ্জ মনুমেন্ট ঘুরে মূল ভবনের কার পার্কে গাড়ি রেখে বেরিয়ে এল। ভেতরে ঢুকেই বুলল অবস্থা গরম। সবাই ব্যস্ত।

জোরে পা চালাল সে। হলুদ কাপেট মোড়া দীর্ঘ করিডর পাস পেরদাস ধরে অফিসের দিকে এগোল। পাস পেরদাসের অর্ধ ওয়াস্টেড ওয়াকিং। প্রশস্ত করিডরের শেষ মাথায় আরেকটা সিকিউরিটি ডেস্ক, নীল ইউনিফর্ম পরা দুই সিভিলিয়ান গার্ড আছে ওটার। ডেস্কে ইংরেজি ও ফরাসীতে নোটিস আছে, তাতে লেখা: যে সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ছুটিতে যাবে, তাদেরকে এখানে গেট-পাস জমা রেখে যেতে হবে।

নোটিসটা দেখলেই উরসুলার কথা মনে পড়ে সাজ্জার। ওর সহকর্মী ছিল মেয়েটা। '৮২ সালে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ন্যাটো ডকুমেন্ট চুরি করে পালিয়ে গেছে পূর্ব জার্মানিতে। ও মরে গেছে না বেচে আছে, জানে না সাজ্জা, কিন্তু আজও মেয়েটাকে ভালবাসে ও। শত্রুপক্ষের স্পাই জানার পরেও।

'ওয়েলকাম টু প্যানিক স্টেশনস্, মিস্,' নিজের বড়সড় রুমে পা রাখতে হাসিমুখে স্বাগত জানাল এক ব্রিটিশ সার্জেন্ট, ওয়েব। 'দশটায় কাউন্সিলের ইমার্জেন্সি মীটিং বসবে প্রেজেন্টেশন রুমে। জেনারেল ব্রিফ করবেন।'

'সোয়ালবারের ব্যাপারে?' প্রশ্ন করল সাজ্জা। সে একা বসে না এই রুমে, সার্জেন্ট ওয়েব আর লুসিও বসে। তার ও লুসির পদ এক, জেনারেলের সেক্রেটারি। ওয়েব ক্লার্ক। লোকটা বেশ হাসিখুশি, রসিক।

'এই মুহূর্তে সোয়ালবার ছাড়া আর কোন ইস্যু আছে পৃথিবীতে?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে।

'তা বটে,' সাজ্জা হাসল। কোট খুলে ঝুলিয়ে রাখল। 'জুলিয়া আসেনি?'

'এখনও না।' একটা পাতলা ফাইল এগিয়ে দিল ওয়েব। 'এটা ওয়ার্ড প্রসেসরে দিতে হবে। গরম জিনিস, চীফ অভ স্টাফের অফিস থেকে এসেছে।'

ওটার ওপর বড় করে NATO SECRET লেখা দেখে আশ্রয়ী হয়ে উঠল সাজ্জা। 'কত কপি চাই?'

'পঞ্চাশটা।'

কাজের ফাঁকে 'জিনিসটার' ওপর শুধু চোখ নয়, মনও বোলাল সাজ্জা। ঠিকই বলেছে এরিক, ব্যাপারটা সম্ভবত পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংঘাতময় পরিস্থিতির কারণ হয়ে উঠতে যাচ্ছে। তথ্যগুলো ভাল করে মনে গেঁথে নিল সে। এরিককে কতখানি জানানো যায়, ঠিক করে ফেলল।

নরফোক, অর্জিনিয়া। এইদিন দুপুরের কথা।

ইউএস নৌবাহিনীর অন্যতম প্রাচীন ও বিখ্যাত এক ভবনের মাথায় মৃদু রাতসে দুলছে দুটো ফ্ল্যাগ। একটা যুক্তরাষ্ট্রের, অন্যটা ন্যাটোর। সুপ্রিম কমান্ডার অ্যালাইড কমান্ড আটলান্টিক বা SACLANC-এর অফিস। SACLANC হচ্ছেন এ

দেশের আটলান্টিক কমান্ডের সি-ইন-সি অ্যাডমিরাল হাওয়ার্ড কিং। ব্রাসেলসের সংস্থার মহাসচিব ও মিলিটারি কমিটি প্রধান জেনারেল অ্যাডারসনের অধীনে ন্যাটোর দায়িত্ব পালন করেন তিনি। অন্যটা যথারীতি দেশের প্রেসিডেন্টের অধীনে।

মাঝারি উচ্চতার মানুষ তিনি, পট্রাগোয়া। বয়স বাষট্টি, কিন্তু দেখলে পঞ্চাশের বেশি মনে হয় না। মুখটা প্রায় গোল। ধূসর চুল। তাঁর রুমটা বিশাল। দেয়ালে বুলছে অসংখ্য মার্কিন যুদ্ধ জাহাজের ছবি। আর আছে প্রকাণ্ড এক ওয়াল ম্যাপ। উত্তর গোলার্ধের যে বিস্তীর্ণ এলাকা ন্যাটোর আওতায় রয়েছে, তার পুরোটা আছে ওতে। একদিকে নর্থ পোলের দক্ষিণ থেকে শুরু করে ট্রপিক অভ ক্যাপার পর্যন্ত, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব থেকে নিয়ে ইউরোপের গোটা উপকূল রেখা ও উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত।

নিজের বিরাট ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন হাওয়ার্ড কিং। মুখ শুকনো। চিন্তিত, অন্যানন্দ। তাঁর মুখোমুখি বসা তাঁর ডেপুটি, ব্রিটিশ ভাইস-অ্যাডমিরাল (অব.) ফ্রান্স শিপলেক এবং মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। শিপলেক প্রকাণ্ডদেহী মানুষ, প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা। মুখটাও প্রকাণ্ড। যখন হাসেন, ঘরদোর কাঁপে। একটা ব্যাপারে এই তিনজনের মিল আছে, প্রত্যেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। তখন থেকেই পরস্পরের বন্ধু ওঁরা।

এ মুহূর্তে সোয়ালবার প্রসঙ্গে আলোচনায় মগ্ন তিন বৃদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধে তাঁদের তুলনায় অনেক সফল স্ট্রাটেজিস্ট ছিলেন রাহাত খান, তাই সোয়ালবার সমস্যার সমাধান কি ভাবে করা যায়, তার কৌশল ঠিক করতে তাঁকে ডাকা হয়েছে। অবশ্য আবছা ইঙ্গিতে তিনিই সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছেন। কি ঘটতে চলেছে কিভাবে যেন আন্দাজ করতে পেরেছেন তিনি, তাই আসার পথে মাসুদ রানাকে খবর দিয়ে এসেছেন।

'মাসুদ রানা আসছে?' ঝুঁকে বসে বললেন কিং।

'হ্যাঁ,' বললেন রাহাত খান। 'ওর এক বান্ধবীসহ।'

'এই বান্ধবীটি কে?'

'আমাদেরই আরেক অপারেটর।'

'আই সী!' একটু ভাবলেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু ও কাজটা করবে তো?'

'করবে,' দৃঢ়ভাবে বললেন বৃদ্ধ। 'ত্রিপাতীর সাথে ওর কিছু ব্যক্তিগত দেনা-পাওনার ব্যাপার আছে। তাছাড়া সোয়ালবার ওর চেনা জায়গা।'

'তাই নাকি?' শিপলেক প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ। কয়েক বছর আগে সিআইয়ের এক আর্কটিক মিশনের লীড দিতে ওদিকে গিয়েছিল ও। কাজ সেয়ে ওখানে কয়েকদিন থেকেও এসেছে।'

ডেপুটির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন কিং। 'যাক!'

এরমধ্যে অন্যকাজে মগ্ন হয়ে পড়েছেন মেজর জেনারেল। সোয়ালবারের অনেক ওপর থেকে মার্কিন স্যাটেলাইটের তোলা একগাদা ছবিতে দ্বিতীয়বারের মত চোখ বোলাচ্ছেন। ইন্ড্রা-রেড ছবি। তাতে দেখা যাচ্ছে লংইয়ারবিয়োন এয়ারফিল্ড সীল করে দিয়েছে রুশরা। ব্যারিকেড স্পট দেখা যায়। কিছু ছবিতে

দেখা যায় বড় বড় কয়েকটা প্যাকিং কেস। ফ্রাইট এয়ারক্রাফট থেকে ওগুলো আনলোড করার ছবিও আছে।

ছবি রেখে একটা ফোল্ডার তুলে নিলেন বন্ধু। ওর মধ্যে কিছু পত্রিকার সোয়ালবার ঘটনা সম্পর্কিত খবরের কাটিং-ঘটনার দু'দিন পর প্রকাশ হওয়া প্রথম খবর। প্রতিটা পত্রিকার খবর একই রকম, সূত্র এক। লংইয়ারবিয়ন এয়ার ফিল্ডের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক কর্মচারী টেলিফোনে খবরটা জানিয়েছে তাদের।

মূল বক্তব্য এরকম: গত '-' তারিখ স্থানীয় সময় দুপুর ১৪.০৫ ঘটায় অ্যারোফ্লোটের একটা ফ্লাইটে (টু ও সেভেন) একদল ফুল-ইউনিফর্মড রুশ বর্ডার পুলিশ এসে লংইয়ারবিয়ন এয়ার ফিল্ডে অবতরণ করে এবং ফিল্ড দখল করে নেয়। তাদের সাথে সিভিল ড্রেসের আরও একদল লোক ছিল। পরিচয় জানা না গেলেও তারা যে রুশ নিরাপত্তা বাহিনীর কোন বিশেষ শাখার সদস্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হরাইজন মাইনিং কোম্পানি নামে স্থানীয় এক প্রাইভেট কোম্পানির কিছু 'খনি শ্রমিকও' পরে তাদের সাথে যোগ দেয়।

এই কোম্পানির মালিকের পরিচয় অজ্ঞাত। সবাই তাকে প্রফেসর ত্রিপাঠী বলে জানে। লোকটার পুরো পরিচয়, জাতীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়নি। তার মাইনে কেবল রুশ শ্রমিকরাই কাজ করে। কিছুদিন আগে এই লোকই এ-অঞ্চলে লংইয়ারবিয়ন গোল্ড কাপ নামে এক রাগবি টুর্নামেন্ট প্রবর্তন করে।

খবরে প্রফেসর ত্রিপাঠী ও অ্যারোফ্লোটের 'স্টেশন ম্যানেজার' ম্যাকারভের নাম এসেছে কয়েকবার। বলা হয়েছে, ফ্রাইটটি অবতরণের পর রহস্যজনক কারণে এই প্রফেসর ত্রিপাঠী মস্কোর হয়ে কথা বলে স্পিটসবার্গেনের গভর্নর প্রিবেনসেন সিসেলম্যানের সাথে। গভর্নর রাশিয়ার এই পদক্ষেপকে নরওয়ের সার্বভৌমত্বের ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ বলে অভিযোগ করলে তাকে জানানো হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এ কাজ করতে বাধ্য করেছে মস্কোকে।

পূর্ব আটলান্টিক আর ব্যারেন্ট সাগরে মহড়ার নামে দীর্ঘ দু'মাস যাবৎ ক্রুজ মিসাইলবাহী অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ মোতায়ন করে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। মস্কো অনেক প্রতিবাদ জানিয়েছে, কানে তোলেনি। আগেও কয়েকবার এধরনের গোয়েন্দাবৃত্তি চালিয়েছে তারা। তাই এবার বাধ্য হয়ে কাজটা করতে হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে। সোয়ালবারের খুব কাছেই কোলা পেনিনসুলা, রুশ নর্দার্ন ফ্লীটের হোমবেস। যুক্তরাষ্ট্রের খামখেয়ালী পন্থার জন্যে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত...

ঘটনার দিন সন্দের সময় লংইয়ারবিয়ন এয়ার ফিল্ড 'ক্রোজড' ঘোষণা করা হয়েছে। কোন বিমান নামতে দেখা হচ্ছে না।

একটা হালকা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ওটা রেখে দিলেন রাহাত খান। 'নরওয়ে কোন কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে না কেন?'

'আর নিয়েছে' হতাশ করে বললেন হাওয়ার্ড কিং। 'রাশিয়ার প্রশ্নে ওরা সব সময়ই সফট।'

'কথাটা ঠিক নয়' বললেন রাহাত খান। 'আটোত্তর সালের "হপেন আইল্যান্ড ইসিজেলের" কথা স্মরণ করো। ইন্টেল্লিজেন্স সার্ভেইল্যান্স ইকুইপমেন্টস বোঝাই

পালাও, রানা

একটা রুশ প্লেন ক্র্যাশ করেছিল ওখানে। সোয়ালবারের সামান্য দক্ষিণে।'

'মনে আছে,' শিপলেক বললেন। 'রাশানরা জোর করে ওটার ধ্বংসাবশেষ তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, ওরা দেয়নি। শুধু তাই নয়, ব্যাটারী জোরাজুরি করতে নরওয়েজিয়ান এক করভেট ক্যাপ্টেন গুলি করার হুমকিও দিয়েছিল। উপায় নেই দেখে পিছু হটতে হয় রুশদের।'

'এবারও তাই করতে হবে,' হাওয়ার্ড কিং বললেন। 'বীচিতে ভালমত একটা গুতো না খেলে নড়বে না ওরা। ন্যাটোর এখন একমাত্র কাজ...'

'"ন্যাটোর" বলছ কেন?' বাধা দিলেন ডেপুটি শিপলেক। 'সমস্যাটা তো তোমাদের সৃষ্টি।'

'তাই বলে এরকম সরাসরি রুশ হুমকির মুখে ন্যাটো বসে থাকবে?' কিঙের কণ্ঠে রাগের আভাস। 'শোনো, বন্ধু, এটা ওদের সু-পরিকল্পিত একটা পদক্ষেপ। আমাদের ক্যারিয়ার ব্যারেন্ট সী-তে গেছে, তাতে হয়েছে কি? আমাদের ডিফেন্স সেক্রেটারির কথামত ব্যারেন্টের যে অংশ আন্তর্জাতিক সীমায় পড়ে, ঠিক সেই পর্যন্তই গিয়েছি আমরা।'

মাথা ঝাঁকালেন ডেপুটি। 'অন্যলোক "তোমাদের" ডিফেন্স সেক্রেটারি, কিং, অন্য কোন দেশের নন।'

'তুমি বলতে চাইছ, এই কারণে ন্যাটো আমাদেরকে সহযোগিতা দেবে না? ভুলে যেয়ো না এতবছর আমরাই ইওরোপের নিরাপত্তা দিয়েছি।'

'জানি। তারপরও তোমাদের প্রেসিডেন্ট আর ডিফেন্স সেক্রেটারিকে একটা তিক্ত বাস্তব মেনে নিতে হবে, বন্ধু, ওরা যে ব্যারেন্ট সী-কে নিজেদের হোমওয়ার্টার বলে দাবি করে, সেখানে মহড়া দিতে গিয়ে মস্কোকে বেইজ্জত করেছে তোমরা। তার প্রতিশোধ হিসেবে টেকনিক্যালি ন্যাটো টেরিটরি সোয়ালবারে ধাবা চালিয়েছে রাশিয়া।'

'কাজেই ন্যাটোকে এখন পাল্টা কিছু করতে হবে,' জোর দিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল কিং।

'অফিশিয়ালি কিছু যদি দাবি করো তোমরা, তা বোধহয় পূরণ হবে না। আমার মতে ইওরোপিয়ানরা প্রতিবাদ জানানোর চেয়ে বেশি কিছু করবে না। সোয়ালবার তাদের জন্যে কোন হুমকি নয়।'

'কিন্তু আমার দেশের জন্যে হুমকি,' দুম্ব করে ডেকে কিল মারলেন অ্যাডমিরাল। 'ম্যাপের দিকে তাকাও, ফ্র্যাঙ্ক। এক ধাক্কায় আমাদের দিকে আটশো মাইল এগিয়ে এসেছে ওরা। এখন যদি ওখানে আর্লি ওয়ার্নিং রাডার বসায়, অবস্থা কি দাঁড়াবে ভেবে দেখো। কেবল আমাদের দিকেই এগিয়ে এসেছে বলে বগল বাজিয়ে না, তোমাদের দিকেও চ্যারশো মাইল এগিয়েছে। ধারাল ছুরি দিয়ে ইওরোপকে নিখুঁতভাবে দু'ভাগ করে ফেলেছে।'

দুই বন্ধুর সাথে রাহাত খানও তাকালেন ম্যাপটার দিকে। একটুও বাড়িয়ে বসেননি হাওয়ার্ড কিং। সোভিয়েত ইউনিয়ন লংইয়ারবিয়নে আর্লি ওয়ার্নিং রাডার বসাতে পারলে মিসাইল সুপারিয়ারটির গোটা ডাইমেনশনই বদলে যাবে। শ্রেফ টোড়া সাপে পরিণত হবে আমেরিকা। তারওপর রুশরা যদি ওখানে ইন্টারসেপ্টর

পালাও, রানা

এয়ারক্রাফট বেস স্থাপন করে, তাহলে তো সমূহ বিপদ।

আমেরিকান বোম্বার্ক বিমান বা লো-ফ্লাইং মিসাইল আর সোভিয়েত ইউনিয়নের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না কখনও। অটোলাটিকের ওপরেই ওগুলোকে গুলি করে ফেলে দেবে ওরা। বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি হয়ে উঠবে তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন।

বুবলাম, মাথা নাড়লেন শিপলেক।

‘কি বুঝলে?’ বললেন কিং। ‘এরপরও বলছ ন্যাটো আমাদের পাশে দাঁড়াবে না এরকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে?’

‘আমি নিজের কথা বলছি না। বলছি সবাইকে এক জোট করতে প্রচুর সময় লাগবে। ততদিনে দেরি হয়ে যাবে অনেক।’

‘তাহলে আমি যেভাবে বুবলাম সেইভাবে করো,’ পরামর্শ দিলেন রাহাত খান। ‘একটা ক্র্যাভেস্তিন মিশন পাঠাও। ওরা যদি রাডার বসায়, ধ্বংস করে দিয়ে আসবে। সব সদস্য যদি রাজি না হয় আমেরিকা, ব্রিটেন আর নরওয়ে, তোমরা এই তিন দেশ মিলে সেরে ফেলো কাজটা। তাতে সময় অন্তত বাঁচবে।’

মুদু হাসি ফুটল অ্যাডমিরালের মুখে। রাহাত খানের দিকে ফিরলেন তিনি। ‘তাই করব আমরা। ওপরে ওপরে কূটনৈতিক তৎপরতা চালাবার ভান করব, আর ভেতরে ভেতরে... খান ঠিকই বলেছে। ক্র্যাভেস্তিন মিশন পাঠিয়েই ধ্বংস করে দিতে হবে ওদের রাডার। অস্কোকে বুঝিয়ে দিতে হবে আমাদের ধ্বংসেরও একটা সীমা আছে। তাছাড়া ন্যাটোর টার্মস অনুযায়ী সোয়ালবার তো অটোলাটিক কমান্ডেরই আডারে, ইউরোপিয়ান কমান্ডের নয়।’

‘তবু ব্রাসেলসকে না জানিয়ে কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না তোমাদের,’ বললেন বুদ্ধ। ‘ওদেরকেও জানাও তোমরা কি করতে চাইছ। তাছাড়া সোয়ালবারে কিছু করতে গেলে কমান্ডো মিশনের গ্রাউন্ড-লেভেল ইনকমিশন প্রয়োজন হবে। অসলোর কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চাও। এই ইনফর্মেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’

‘রাইট,’ মাথা ঝাকালেন ভাইস-অ্যাডমিরাল।

‘তুমি তাহলে কাজ শুরু করে দাও, ফ্রাঙ্ক,’ কিং বললেন। ‘ব্রাসেলস আর অসলোকে আমাদের পদক্ষেপ সম্পর্কে আভাস দাও। গ্রাউন্ড-লেভেল তথ্য চেয়ে পাঠাও। মাসুদ রানার সাথে কথাবার্তা বলে আজই প্রেসিডেন্টকে সব জানাচ্ছি আমি।’

শিপলেক নিজের রুমে চলে যেতে রাহাত খানের দিকে ফিরলেন অ্যাডমিরাল। ‘কফি?’ ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়ালেন, এই সময় বেজে উঠল গুটা। ‘ইয়েস!’ এক মুহূর্ত পর শ্রায় লাফিয়ে উঠলেন তিনি। ‘শিওর, সেভ দেম ইন, প্লীজ!’

কয়েক মহুর্ভ পর পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা ও সোহানা। অ্যাডমিরাল কিং আসন ছাড়লেন, কয়েক পা এগিয়ে নিজেই পরিষ্কার পর্ব সেরে নিলেন ওদের সাথে। ‘গ্যাড টু মীট ইউ টু। প্যান্ডাস ফর কামিং।’

‘ইট’স আওয়ার সেম্বার, স্যার,’ কবীর দিল রানা। দুই তাকাল রাহাত খানের দিকে। মাঝে দু'লিখে ওদেরকে বসতে বললেন তিনি।

রানার দিকে ফিরলেন বুদ্ধ। ‘তোমাদের আসতে বলেছি জরুরী একটা কাজে। লংইয়ারবিয়নের ঘটনা তো শুনেইছ।’

‘মোটামুটি, স্যার।’

‘সেই ব্যাপারে অ্যাডমিরাল কিছু বলবেন এখন,’ বললেন তিনি। ‘শুনলে তুমি হয়তো ইন্টারেস্টেড হয়ে উঠতে পার। হাওয়ার্ড, বলো।’

‘এক মিনিট,’ ইন্টারকামে কফির অর্ডার দিলেন তিনি। রিসিভার রেখে আসল প্রসঙ্গ তুলতে যাচ্ছিলেন, এই সময় ঘরে ঢুকলেন ফ্রাঙ্ক শিপলেক। ‘আহ, ফ্রাঙ্ক! মীট দিস বিউটিফুল ক্যাপন।’ বিউটিফুল শব্দটা সোহানার ওপর চোখ রেখে বললেন কিং, এবং বেশ জোর দিয়ে।

দু'জনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনিও বসলেন। অ্যাডমিরালের উদ্দেশে বললেন, ‘ওদিকে কাজ শুরু হয়ে গেছে। ব্রাসেলস কাউন্সিল মীটিং কল করেছে।’

‘ওড! অসলো?’

‘কাজে লেগে পড়েছে।’

‘খ্যাঙ্ক ইউ। ওসব পরে হবে, আগে...’ রানার দিকে ফিরলেন অ্যাডমিরাল। ‘নাউ, মেজর মাসুদ রানা। রাহাত খান আমাদের দু'জনেরই অনেক পুরনো বন্ধু। লংইয়ারবিয়নের ঘটনায় রুশদের হয়ে মধ্যস্থতা করছে প্রফেসর ত্রিপাঠী নামের এক লোক, শুনেছেন তো? রাহাত বলছে, লোকটা মোটেও ভারতীয় নয়, আসলে বাংলাদেশী। তাই... পরামর্শের জন্যে আপনাদের ডেকেছে ও।’

বিশ্মিত দৃষ্টিতে বুদ্ধের দিকে তাকাল রানা। সোহানাও লজ্জা ভুলে তাকাল। ‘বাংলাদেশী?’ রানা বলল। ‘কে, স্যার?’

‘কবীর চৌধুরী,’ গমগমে কণ্ঠে বললেন বুদ্ধ।

‘কবীর চৌধুরী!’

‘হ্যাঁ। ঘটনা খুলে বলো, হাওয়ার্ড,’ বললেন বুদ্ধ।

‘বলছি,’ নড়েচড়ে বসে পুরো ঘটনা খুলে বলতে শুরু করলেন কিং। কবীর চৌধুরীর প্রসঙ্গ শেষ হতে লংইয়ারবিয়ন দখলের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন কি কি সুবিধে পাচ্ছে, তাও বললেন। একটাও প্রশ্ন না করে শুনে গেল রানা।

তার বলা শেষ হতে রাহাত খান মুখ খুললেন। ‘সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি ওখানে আর্গি ওয়ানিং রাডার বসায়; বসাবে তো অবশ্যই, তাহলে কমান্ডো মিশন পাঠিয়ে ওটাকে ধ্বংস করে দেয়ার ইচ্ছে এদের। মিশনের লীডার হিসেবে তোমার নাম প্রস্তাব করেছে আমি। এদের কাজও হবে, তার সাথে আমাদের কাজও হবে।’

‘বুঝতে পেরেছি, স্যার। কিন্তু আমরা একটা রাডার ধ্বংস করে রেখে এলে ক’দিন পর ওরা আবার একটা বসাবে। তাহলে মিশন পাঠিয়ে লাভ কি? শুধু কবীর চৌধুরীর ব্যাপার তো একজন বা দু'জন গিয়েই মিটিয়ে ফেলা যায়।’

‘আসল ব্যাপার হচ্ছে, শিপলেক বললেন এবার, ‘এজন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না আমরা। কিন্তু নেস্টট টাইম তা আর সম্ভব হবে না। আপনারা ওই রাডার ধ্বংস করে দেয়ার সাথে সাথে সাথে আকাশে-সাগরে ট্রেসিং রকেড সোষণা করবে নাহলে, কোন রুশ প্লেন বা জাহাজ যাতে ওই এলাকার ধারেকাছেও যেতে না পারে, সে ব্যবস্থা করবে। তাহলে একদিন ওরা নিজেরাই ওই জায়গা ছেড়ে

চলে যাবে। আফটার অল, রাডারই যদি বসাতোনা পারল, তাহলে ওখানে থেকে করবেই বা কি?

'বেশ, রানা বলল।

'মিশন লীড দিতে আপনার কোন আপত্তি বা...?' অ্যাডমিরাল হাওয়ার্ড কিং প্রশ্ন করলেন।

'না, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ও। তিন বৃদ্ধের দৃষ্টি বিনিময় হলো দ্রুত।

'থ্যাক ইউ, মেজর, কিং বললেন।

'আপনি তো আগে একবার গিয়েছিলেন লাইয়ারবিয়নে।' ক্র্যাঙ্ক শিপলেক প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, বেশ কয়েক বছর আগে।

'ঠোট মুড়ে একটু ভাবলেন শিপলেক। 'কতদিনের মধ্যে যাত্রা করতে পারবেন বলে মনে করেন?'

'আগে ওখানকার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে হবে আমাকে,' রানা বলল।

'দ্যাট ইজ, গ্রাউন্ড-লেভেল ইনফর্মেশন। ওটা ভাইটাল।

'সে-কাজ অলরেডি শুরু করে দিয়েছি আমরা। আশা করছি দুই-তিন দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ইনফর্মেশন পেয়ে যাব।

'তাহলে প্রায় দশদিন।

'ওকে। সদস্য বাছাইয়ের পর এক্সারসাইজ দরকার হবে নিশ্চই?' কিং প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, মাখা দোলাল ও।

'কোথায় করতে চান?'

একটু ভাবল রানা। 'হাই সিয়েরায়।

'নো প্রবলেম। আর কিছু?'

'গ্রাউন্ড-লেভেল তথ্য পেলে কমান্ডো বাছাই ইত্যাদি কাজে হাত দেব আমি। বাই দ্য ওয়ে, সোয়ালবারে কোন নরওয়েজিয়ান স্ট্রীপার এজেন্ট বা সেল আছে কিনা জানতে হবে। থাকা উচিত। ভেতরের সাহায্য দরকার হবে আমাদের।'

ব্রাসেলস। অফিস ছুটি হওয়ার একটু আগে জেনারেল অ্যান্ডারসনের স্টাফ অফিসার ব্রিগেডিয়ার কার্টিস এসে ঢুকল সান্ড্রা-জুলিয়ার রুমে। 'এই যে, মেয়েরা,' বলল সে। 'জরুরী ব্যাপার, আরও কিছুক্ষণ থাকতে হবে তোমাদেরকে।'

'কিন্তু, স্যার, জুলিয়া হড়বুড় করে উঠল। 'আজ বয় ফ্রেন্ডের সাথে থিয়েটারে যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে আমার। টিকেট করা আছে। আমি না গেলে ও ঠিক মেরে ফেলবে আমাকে।'

'তাহলে মন্ত ক্ষতি হতো মানে আমার? অফিস ব্রিগেডিয়ার।' বাট দিস্ ইউ টপু থায়োরিটি। নরওয়েকে কিছু একটা হচ্ছে।

চেহারা করণ হয়ে উঠল জুলিয়ার। 'সান্ড্রা...'

'ঠিক আছে, আমি থাকছি,' সান্ড্রা বলল। 'আমার কোন কাজ নেই সফের পর।'

'ধন্যবাদ, ডার্লিং,' চুল ঠিক করে বাউপট তৈরি হয়ে নিল মেয়েটা। 'আমি না গেলে এনরিকো পাগল হয়ে যাবে।

'মাও,' সান্ড্রা হাসল। 'কিন্তু আমার প্রয়োজনের সময়...'

'আচ্ছা,' হাত নেড়ে দরজার দিকে পা বাড়াল সে। 'সে হবে খন। কাল দেখা হবে, চলি।'

সে বেরিয়ে যেতে ব্রিগেডিয়ারের দিকে ফিরল সান্ড্রা। 'ক্রাইসিস, স্যার?'

'হ্যাঁ। জেনারেল মেশিনগান ফ্যারারের হাত একনাগাড়ে অর্ডার দিচ্ছেন।'

আটটার পর অফিস ছাড়ার সুযোগ পেল সান্ড্রা। গাড়িতে ওঠার আগে অফিস বিল্ডিংয়ের দিকে ডাকাল, কিছু কিছু রুমের আলো নেভানো দেখল ও। বেশির ভাগ জ্বলছে। ডিপ্লোম্যাটরা ব্যস্ত। আপার্টমেন্টে পৌছতে না পৌছতে টেলিফোনের রিং শুনে হাসল মেয়েটা, বুঝতে পেরেছে কে হতে পারে।

'কেমন কাটল দিন?' প্রশ্ন করল এরিক। 'খুব ব্যস্ত গেছে মনে হচ্ছে?'

'মোটামুটি। তুমি কোথায়?'

'হোটলে।'

'তোমার দিন কেমন কাটল?'

'খুব বাজে,' এরিক বলল। 'একদম জঘন্য! ন্যাটো কি ইশতেহার ইস্যু করেছে আজ, দেখেছ?'

'না।'

'আমি পড়ছি, শোনো। "দ্য ন্যাটো কাউন্সিল মেট ইন ক্রোজড সেশন অ্যান্ড কনসিডারড দ্য সিরিয়াস ইস্যুজ লাইচ অ্যারাইজ..." সাচ অ্যান্ড সাচ। শেষে বলছে, "দ্য অ্যালাইজ উইল রিমেইন ইন ক্রোজ কনসাল্টেশন"। এ কোন কথা হলো? এ থেকে কি বুঝব আমি? এতরাত পর্যন্ত এই করল আজ তোমার অফিস?'

'কিন্তু আমার সাথে কাউন্সিলের কোন সংশ্লিষ্ট নেই,' সান্ড্রা বলল।

'সে না হয় হলো,' উদ্ভা প্রকাশ পেল এরিকের কণ্ঠে। 'কিন্তু এতবড় এক কাণ্ড ঘটে গেল, অথচ ন্যাটো "ক্রোজ কনসাল্টেশন" ছাড়া কিছুই করবে না, এটা কেমন কথা? ম্যাপাজিনকে কি বলব, ভেবে পাচ্ছি না আমি।'

'দুর্ভাগ্য, ডার্লিং,' সান্ড্রা বলল। 'এ ছাড়া আজ আর কোন খবর নেই। বিশ্বাস করো।'

'তুমি বলতে চাইছ, আজকের মীটিঙে কাউন্সিল কোন মিলিটারি থ্রেটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি না তুমি জানো না?'

সতর্ক হয়ে গেল সান্ড্রা। জানে, নিয়েছে, কিন্তু সে কথা এরিককে বলা যাবে না। 'না, না! কি বলছ তুমি? ওরকম কিছু ন্যাটো ভাবছে না। তাহলে আভাস অন্তত পেতাম আমি।'

আরও মিনিটখানেক কথা বলে ফোন রেখে দিল এরিক ব্রাউন। সামনে বসা মোটা, বিনমুটে চেহারার লোকটাকে দেখল। এক্সটেনশন ইয়ারফোনের মাধ্যমে এক্ষণ তাদের কথা শুনছিল সে। 'ও সত্যি কথাই বলা হচ্ছে,' এরিক বলল। 'কাল ওর সাথে দেখা করে নতুন খবর কিছু আছে কি না জানার চেষ্টা করব।'

'আমি যোগাযোগ করব কাল,' এক্সটেনশন ওয়্যারার পদক্ষেপে রেখে বলল

লোকটা। 'এখন নিয়মিত যোগাযোগ রাখা দরকার আমাদের। আপনার কাজের ধারা হেড অফিসের পছন্দ হয়েছে।'

'আমিও সেই আশাতেই লেগে আছি,' যুবক বলল। 'তিন বছর আগে যদি জানতাম এয়ার ফোর্সের চাকরি ছেড়ে এই করতে হবে, তাহলে কখনোই রাজি হতাম না আমি।'

'স্টাসিতে কাজ করা কতখানি সম্মানের জানানো?' রাগ রাগ গলায় বলল লোকটা। 'আপনি ভাগ্যবান। যদি আপনার এই প্রজেক্ট সফল হয়, তাহলে প্রমোশন নিশ্চিত। তারওপরে একটা মেয়ের সাথে ইচ্ছেমত...' থেমে গেল সে ইচ্ছে করেই।

'আপনার ওকে মেয়ে মনে হতে পারে,' এরিক বলল।

'কেন? আপনার অন্য কিছু মনে হয়?'

'হয়। ছাগলী মনে হয়। মনে হয় ছাগলীর সাথে প্রেম করছি।'

'রেশি' কথা বলেন আপনি,' বিরক্ত চেহারায় উঠে পড়ল বিদ্যুটে। 'কাজ করুন। রুশ কাউন্টারপার্ট ইনফর্মেশনের জন্যে চাপ দিচ্ছে। চলি, কাল দেখা হবে।'

দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে বিছানায় বসল এরিক ব্রাউন। চিন্তায় পড়ে গেছে। বুঝে ফেলেছে সাজ্জার ওপরে থেকে খুব দ্রুত অগ্রহ হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে সে। ওর প্রতি ঘৃণা জন্মাচ্ছে। সাজ্জা ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলে বিপদ। কিন্তু এর কোন সমাধান দেখতে পাচ্ছে না এরিক ব্রাউন।

'সোহানাকেও দলে নিয়ে নিয়ো,' বললেন রাহাত খান।

জেট এঞ্জিনের তীব্র গর্জনে কথাটা ঠিকমত শুনতে পেল না রানা। 'জি?'

'বলছি, সোহানাকে সঙ্গে নিয়ো।'

'কোথায়, স্যার?' মনের ভুরু কুঁচকে উঠল ওর।

'মিশনের সাথে,' পাইপ টানায় মন দিলেন বৃদ্ধ। নরফোক এয়ারপোর্টে পেনে ওঠার অপেক্ষায় আছেন। ন্যাটোর খুদে এক বিমানে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। খুঁটাই ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছে তাঁকে। রানা-সোহানা এসেছে বিদায় জানাতে। ভাইস অ্যাডমিরাল শিপলেকও এসেছেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে তার সাথে কথা বলছে সোহানা।

'সোহানাকে! সারে, এটা খুব বিপজ্জনক মিশন হতে চলেছে। ওকে এসবের মধ্যে নেয়া কি ঠিক হবে?'

'কেন?' কটমট করে তাকালেন বৃদ্ধ।

'না...মানে...'

'ওকে এসব ক্ষেত্রে অযোগ্য মনে করো তুমি?'

'না, স্যার,' বলল ও। 'বলজিলাম...' আমি তা অস্বীকার করতে লাগল, আর কি বললে ভেবে পাচ্ছে না।

ওর মনের অদৃষ্টি বুকে মনে মনে হাললেন বৃদ্ধ। ভয় পেয়েছে রানা। সোহানা আহত হতে পারে, বা মরে যেতে পারে, এই ভয়ে আপত্তি তুলছে ও। সোহানার

ব্যাপারে ক্যাটা বিন্দুমাত্র কুঁকি নিতে চায় না।

'সোহানার যদি মৃত্যু আসে,' কিছুটা নরম গলায় বললেন তিনি, 'তুমি ঠেকাতে পারবে না। ঠিক যেমন তোমার মৃত্যু সোহানা বা আমি ঠেকাতে পারব না। মৃত্যু যখন হওয়ার হবে। সব ছেড়ে ঘরে বসে থাকলেও সময়মত হবেই।'

'জি, স্যার।'

'তাছাড়া ও সাথে থাকলে তোমারই লাভ। মিশন কঠিন হবে সন্দেহ নেই। এ সময়ে মাতৃভাষায় কথা বলার মত একজনকে অন্তত পাবে ও সাথে থাকলে। আর এসব ক্ষেত্রে ও যে-কারও সমকক্ষ, না নিতে চাওয়ার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখি না আমি।'

'ঠিক আছে, স্যার,' পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করল রানা। 'আপনি যা বলেন। বন্ধ শিপলেক ও সোহানার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে বিদায় নিলেন রাহাত খান। রানাকে বললেন, 'কোন সমস্যা হলে যোগাযোগ করো আমার সাথে।'

'জি।'

ত্রিনিটি পনেরো পর মাটি ছাড়ল ন্যাটোর প্লেনটা, ডাকার উদ্দেশে উড়ে চলল। ওটা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত একভাবে তাকিয়ে থাকল রানা-সোহানা।

সঙ্গে মনিয়ে আসছে তখন।

ন্যাটোর অতিথি হিসেবে ওদেরকে নরফোক শেরাটনের তিন রুমের লাক্সারি সুইটে তুলে দিয়ে গেলেন শিপলেক। সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে ওয়ে পড়ল ওরা। একে আগের রাতে ঘুম হয়নি, তার সাথে অল্প হলেও জেট ল্যাগের ধকল কাটাতে ঘুম প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পরদিন সকাল থেকে মিশনের খুঁটিনাটি নিয়ে কাজ শুরু করার ইচ্ছে রানার। খুব জটিল, কঠিন কাজ। মাথা পরিষ্কার রাখতে হবে সে জন্যে। কিন্তু ঘুম সহজে এল না। কবীর চৌধুরীর চিন্তা মাথায় ঢুকল রানার। সান ফ্রান্সিসকো ঘটনার পর বেশ কিছুদিন খবর ছিল না লোকটার, সময়টা নিশ্চয়ই লংইয়ারবিয়নে কাটিয়েছে সে। কিন্তু এতবড় এক আন্তর্জাতিক ঘটনায় সে কেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করছে?

কবীর চৌধুরী শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্টদের সেবা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভেবে হাসি পেল ওর। আর কত খেলা দেখাবে লোকটা?

'রানা!' কোমল কণ্ঠে ডাকল সোহানা।

'উম?'

'ঘুম আসছে না?'

'নাহ। কবীর চৌধুরীর চিন্তা মাথায় ঢুকে পড়েছে।'

'সত্যি। ও রাশিয়ার হয়ে কাজ করছে, ওনতে কেমন অদ্ভুত লাগছে যেন।'

'আমিও তাই ভাবজিলাম,' রানা বলল।

'এখন ঘুমাও। পরে ভেবো।'

'আচ্ছা,' পাশ ফিরে সোহানাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে সুবোধ বালকের মত চোখ বুজল ও। পরক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ল।

পাঁচ

'অসলো থেকে ডেলিগেশন আসছে,' বলল ম্যাকারভের 'সহকারী'। ক্যাপ্টেন সে, ক্যাপটেন পাপুকিন। রডজের চক্ৰিশ হবে বয়স, হালকা-পাতলা, দীর্ঘদেহী। কিন্তু মুখটা যেন পাথর কঁদে তৈরি। 'ডিউ ইন ফিফটি মিনিটস্'। এসএএস ডিসি নাইন। ডিটেইলস্ টেলিপ্রে আছে, দেখে নেবেন।'

'অসলো থেকে?' অবাক হয়ে তাকে দেখল ফ্রেডারিক ফলভিক।

'হ্যাঁ। আয়োজন কমপ্লিট,' এয়ারফিল্ডের ওপর চোখ রেখে বলল যুবক।

আসন ছেড়ে উঠল নরওয়েজিয়ান ট্রাফিক অফিসার। টাওয়ারের জানালা দিয়ে ফিল্ডে তাকিয়ে আরও অবাক হলো। এক কনটিনজেন্ট রুশ বর্ডার পুলিশ ড্রিল করছে সেখানে, পীকড ক্যাপ পরা এক ওয়ারেন্ট অফিসার পরিচালনা করছে ড্রিল। বোঝা যাচ্ছে গলার রং ফুলিয়ে অর্ডার করছে লোকটা, কিন্তু ফলভিক শুনতে পাচ্ছে না কিছুই। দলটা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সিনিয়র অফিসার প্রেজেন্ট-কর্নেল ম্যাকারভ। গায়ে কালো রঙের ভারী ওভারকোট, মাথায় অস্ত্রাখান টুপি।

'কি হচ্ছে ওখানে?' জানতে চাইল সে।

'গার্ড অভ অনারের শক্ততি নেয়া হচ্ছে। কমরেড কর্নেল রাগত জানাবেন প্রতিনিধি দলটাকে।'

'ম্যাকারভ! প্রফেসর ত্রিপাঠী নয়?'

কঠিন হাসি ফুটল পাপুকিনের মুখে। 'কমরেড ত্রিপাঠী কোন সামরিক অফিসার নন। তার কাজ পরে, আগেরটা কমরেড কুর্নেলের। এটা তাঁর ডিউটি।'

আধ ঘণ্টা পর ডিসি-নাইনের পাইলট অ্যাপ্রোচ রিপোর্ট করতে গটগট করে টাওয়ার থেকে বেরিয়ে গেল যুবক, তার ভারী বুটের শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল। একটু পর এয়ারফিল্ডে দেখা গেল তাকে। এক হাতে পীকড ক্যাপ সামলে দৌড়ে যাচ্ছে ম্যাকারভের দিকে। রিপোর্ট করতে যাচ্ছে নিশ্চয়ই, ফলভিক ভাবল। তার ধারণাই ঠিক, সহকারীর বলা শেষ হতে মাথা ঝাকাল কর্নেল, চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল সার্জেন্ট মেজরকে।

খবরটা গভর্নরকে জানানো দরকার ভেবে গভর্নর হাউসে ফোন করল ফলভিক, একটা অপরিচিত গলা সাড়া দিল। বলল, গভর্নর খবরটা জানান, এয়ারফিল্ডের পথে রয়েছেন তিনি। রিসিভার রেখে জানালার এসে দাঁড়াল সে, টারম্যাকে দুটো গাড়ি এসে চুকতে দেখল। একটা গভর্নর প্রিবেনসেন সিসেলম্যানের অন্যটা প্যাসেঞ্জার ত্রিপাঠীর। দুইটা চোখের আড়ালে চলে গেল ও দুটো টার্মিনাল ভবনের দিকে যাচ্ছে। ঘুরে অন্য এক জানালার এসে দাঁড়াল ফলভিক, এখান থেকে মোটা ব্যাপারটা দেখা যাবে।

সময়মত ল্যান্ড করল ডিসি-৯, গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল টার্মিনাল ভবনের

পালাও, রানা

সামনে। সঙ্গে সঙ্গে চার রুশ বর্ডার পুলিশ লাল কার্পেট নিয়ে ছুটল। প্লেন কোথায় দাঁড়াবে, কার্পেটের রোলের এক মাথা কোথায় থাকলে অন্য মাথা গ্যাংওয়ের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছবে, সব ঠিক করাই ছিল, কাজেই কোন সমস্যা হলো না। জারগামত রুপ করে ফেলে দেয়া হলো রোল, এক পুলিশ ওটার প্রান্তে উঠে দাঁড়িয়ে থাকল, অন্য তিনজন রোলটাকে গাড়িয়ে নিয়ে চলল প্লেনের দিকে। কাজ শেষ হতে চারজনই গ্যাংওয়ের গোড়ায় অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল। তাদের মুখোমুখি রয়েছে ত্রিপাঠী, ওরফে কবীর চৌধুরী ও ম্যাকারভ। একটু পর ক্যাভিনেডিয়ান এয়ার সিস্টেম বোরিঙের দরজা খুলে গেল, কার্পেটের পাশে তার আগেই দাঁড়িয়ে গেছে রুশ পুলিশ কনটিনজেন্ট।

প্লেন থেকে প্রথমে বের হলেন নরওয়ের পরিবেশ মন্ত্রী-মহিলা। এক হাতে ফারকোট সামলে নেমে এলেন তিনি ধীর পায়ে। পঞ্চাশ মিটার দূর থেকেও তাঁর চেহারা বিস্ময় দেখল ফলভিক। এরপর নামলেন বিচার মন্ত্রী। পরিবেশ মন্ত্রীর পা কার্পেট স্পর্শ করামাত্র হুঙ্কার ছাড়ল সার্জেন্ট মেজর, প্রাণ এল যেন পুলিশ সদস্যদের দেহে। সার্জেন্টের মুখ নাড়া দেখে ফলভিক বুঝল লোকটা বলছে, 'প্রেজেন্ট-এ-এ-এ-স্ট আর্মস!'।

বিস্ময় আর গাঙ্গীরের সাথে প্যারেড পরিদর্শন করলেন দুই মন্ত্রী, তাঁদের এইডরা দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। পাঁচ মিনিট পর শেষ হলো অনুষ্ঠান, গাড়িতে করে গভর্নর হাউসের দিকে চলে গেল সবাই।

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, ক্যাপ্টেনের গলা শুনে ঝাকি খেয়ে সচকিত হলো ট্রাফিক কন্ট্রোল অফিসার। 'সব ধরনের ট্রাফিকের জন্যে এয়ারফিল্ড এখন থেকে আবার ক্লোজড ঘোষণা করেছেন কমরেড কর্নেল,' বলল সে। 'কেবল ব্যারেন্টসবার্গ থেকে আসা কন্টারের বেলায় প্রযোজ্য হবে না এ ঘোষণা।'

'সেরকম হলে ম্যাকারভের আমার সাথে কথা বলে নেয়া উচিত ছিল,' জবাব দিল সে।

কঠিন চেহারা তাকে দেখল পাপুকিন। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'উনি এখন ব্যস্ত!' মাথা নেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করল। 'যা বলেছি তাই করুন।'

'এক্সেলেন্ট প্যারেড হয়েছে, ডিষ্ট্রিক্ট মিখাইলাভিচ,' নিখাদ প্রশংসার সুরে বলল কবীর চৌধুরী। 'ঠিক এরকমই চেয়েছিলাম আমি। কংগ্রেসুলেশনস্।'

বিনয়ে গলে যাওয়ার দশা হলো ম্যাকারভের। 'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

মস্তো থেকে তার জন্যে পাঠানো একেবারে নতুন, বাকঝাকে খিল নিমজিনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কবীর চৌধুরী। গভর্নর হাউসের দিকে যাচ্ছে। নামান দুটো সরকারী অলভো গাড়ি, একটার রয়োজন গভর্নর অন্যটার দুই নরওয়েজিয়ান মন্ত্রী। আগে আপে যাচ্ছে ও দুটো। এয়ার ফিল্ড থেকে চার কিলোমিটার দূরে গভর্নর হাউস। উপকূল ঘেঁষে চলে গেছে রাস্তা। রাস্তার একদিকে কোন স্টোরিজ বিল্ডিং, অফিস, জেটি ইত্যাদি।

কিন্তু কবীর চৌধুরীর মন নেই কোনদিকে, আসন্ন ম্যাচিঙের চিন্তায় মগ্ন। 'মন্ত্রীরা যদি রাতে থেকে যান, তাহলে ডিনার পার্টির আয়োজন করতে হবে,' বলল

পালাও, রানা

সে। 'যতক্ষণ নিজেদেরকে ওরা শত্রু ঘোষণা না করছে, ততক্ষণ ওরা আপনাদের বন্ধু, রিমেমবার।'

'ইয়েস, স্যার,' সামনের প্যাসেঞ্জারস' সীটে বসা ম্যাকারভ মাথা দোলাল। 'আমিও ডিনারের কথাই ভাবছিলাম।'

সম্ভ্রষ্ট হলো কবীর চৌধুরী। পাত্র নির্বাচনে সত্যিই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে সে, কোন ভুল করেনি। কর্নেল এঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে যেমন ভাল, তেমনই রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট চতুর। অবশ্য হওয়ারই কথা। পাঁচ মাস আগে মস্কোয় যখন উপযুক্ত একজন সহকারী খুঁজছে সে, তখন কেজিবির বাছাই করা দেড়শো আর্মি পার্সোনেলের ফাইল মন্ত্রী বরিস স্টোলিপিন তুলে দিয়েছিল তার হাতে। 'বেছে নাও যাকে খুশি,' বলেছিল সে।

প্রতিটা ফাইল-খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে কবীর চৌধুরী, তারপর একে বেছে নিয়েছে। অতুলনীয় রেকর্ডের অধিকারী এই লোক। ক্যারিয়ার অফিসার হিসেবে চাকরিতে ঢুকে অল্পদিনের মধ্যেই নিজগুণে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য পদ অর্জন করে নিয়েছে সে। এই সদস্যদের ওপর নির্ভর করেই চলে পলিট ব্যুরো।

কিছুটা সন্দেহ অবশ্য প্রথম প্রথম ছিল কবীর চৌধুরীর, কারণ সে জানে, রেকর্ডে অনেক সময় অতিরঞ্জিত তথ্য থাকে। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই লোক হাতে কলমে প্রমাণ করে দিয়েছে, সে যা চাইছিল, কর্নেল ঠিক তাই। কবীর চৌধুরীর হিসেব আগেই হয়ে গিয়েছিল—সোয়ালবারে ক্রশ অবতরণের পর অসলোর সাথে রাজনীতির একা-দোকা খেলবে সে, সেই সুযোগে আরেকজনকে দুর্গম প্রাচীরের পাহাড়ের সমতল চূড়ায় মস্কোর আর্লি ওয়ানিং রাডার বসাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

যে কোন পেশাদার সৈনিকের ক্ষেত্রে 'সুযোগ' হচ্ছে ভবিষ্যৎ। প্রতিযোগিতামূলক কাজ করে জীবনে বহুদূর যেতে পারে সে, তবে তার সাথে যদি 'সুযোগ' যোগ হয়, তাহলে হয় পোয়াবারো। সারাজীবনের জন্যে অপেক্ষার প্রয়োজন হয় না, আচমকা এক লাফে অনেক পথ অতিক্রম করে ফেলতে পারে সে।

ছাত্র জীবনে সামরিক বাহিনীর তিনটি শাখার সাহায্যকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (DOSAP)-এর সদস্য ছিল বরিস মিখাইলোভিচ ম্যাকারভ বা ভিকি। শটিং, নাতার, বায়িং, কুস্তি, সাইক্রিং, ড্রাইভিং, সবকিছুতে এক নম্বর ছিল। স্কুল জীবন শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় সে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে।

তার বাবা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক বীর অফিসার, আর্মি মেজর। সেই সূত্রে ভার্শিটি থেকে এক নম্বর হয়ে বেরবার সাথে সাথে অফিসার স্কুলে ডাক পড়ে ম্যাকারভের। সেখানে দশ বছর কেটেছে তার। এরপর নিজের যোগ্যতাবলে বড়ার ট্রুপাসে বদলির আবেদন জানায় সে। সঙ্গে সঙ্গে তা অনুমোদন হয়। এই বাহিনীর অফিসারদের রাজনৈতিকভাবে বিশ্বস্ত হওয়া খুবই জরুরী, এবং সেটা তার মধ্যে ছিল যথেষ্ট আনন্দ।

কিছুদিন পর মেজর পদে উন্নীত হয় ম্যাকারভ, অ্যাঙ্গোলার মার্কসবাদী

সরকারের সেনাবাহিনীর অ্যাডভাইজার হিসেবে বদলি হয়ে যায়। সেখানেই পেশাদার সৈনিক জীবনের প্রথম সুযোগটি আসে। সে-দেশে ত্রিমুখী যুদ্ধ চলায় তখন দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে। একদিকে সরকারী বাহিনী, অন্যদিকে ছিল অ্যাপোলার বিদ্রোহী নেতা জোনাস সাভিরির গেরিলা বাহিনী ও তাদেরকে সহায়তাকারী ক্রশ বাহিনী। শেষের দলটির হয়ে কাজ অবশ্য তাদের বলির পাঠা কিউবান আর্মিই করত।

কোন আফ্রিকান ভিয়েতনামে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে পলিট ব্যুরোর ছিল না। তাই সে যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেয়নি রেড আর্মি। মস্কোর কয়েকশো মিলিটারি অ্যাডভাইজার ছিল কেবল। ম্যাকারভের দায়িত্ব ছিল পরের তিন বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো। অসম্ভব এক কাজ ছিল সেটা।

এক অসহ্য গরমে মগজ পর্যন্ত টগবগ করে ফুটত, তার ওপর রাস্তা বলে তেমন কোন পদার্থ ছিল না ওদেশে। ছিল কেবল কাঁটাঝোপ আর ধুলোমোড়া ধু-ধু প্রান্তর। কিছু নদীও ছিল—এই শুকনো, খটখটে, এক ঘণ্টা পরই আবার ভয়াবহ, তীব্র স্রোতবাহিনীর রূপ নিত সেগুলো। এই নদীগুলোর ওপর ব্রিজ তৈরি করা ছিল ম্যাকারভের কাজ।

একদিন কেজিবির এক জেনারেল ও অ্যাপোলান ডিফেন্স মিনিস্টার এলেন তার প্রজেক্ট পরিদর্শনে। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত এসে হাজির এক দক্ষিণ আফ্রিকান লং রেঞ্জ পেট্রল। একটা হেলিকপ্টার প্রথমে চিহ্নিত করে জায়গাটা, তারপর এসে হাজির হয় দুটো জেট ফাইটার। ভয়ে আফ্রিকান সৈন্যরা পালিয়ে গেলেও ম্যাকারভ ঘাবড়ায়নি, নিজের অধীনে নিয়োজিত এক কোম্পানি কিউবান সৈন্য নিয়ে রুখে দাঁড়ায়।

সেদিন তার কঠিন প্রতিরোধের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয় দক্ষিণ আফ্রিকান পেট্রল, একটা কপ্টার ধ্বংস হয় তাদের। অ্যাপোলান মন্ত্রী আহত হলেও প্রাণে বেচে যান। কেজিবির জেনারেল ধরা পড়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরেন ম্যাকারভকে। এর ক'দিন পরই প্রমোশন হয় তার, একইসাথে পদকও জোটে—অর্ডার অফ আলেক্সান্ডার নেভেভি।

শেষের এই ঘটনাই মূলত ম্যাকারভের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল কবীর চৌধুরীকে। লংইয়ারবিয়নের একমাত্র আবাসিক এলাকায় এসে পড়ল পাড়ির বহর। ছাড়া ছাড়া ঘরবাড়ি এখানে। হারবার অতিক্রম করতেই আকাবাঁকা পথ, জন্ম উঠে গেছে ছোটখাট এক পাহাড়ের চূড়ায়, ওখানেই গর্ভনর হাউস। দীর্ঘ, মজবুত কাঠের বিস্তিৎ। নীল ফিওর্ডের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় ওখান থেকে। এখন অবশ্য সৌন্দর্য বলে কিছু নেই ওখানে, পানি জমে শক্ত বরফ হয়ে আছে। নীল হয়ে গেছে সাদা।

ছাইভেঁপেতে শীতে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা স্থানীয়দের ছোটখাট একটা জটলা দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল কবীর চৌধুরী। লাখারজ্যাকেট আর পারকা পরে আছে মানুষগুলো, মাথায় ইয়ার ক্লাপওয়ালা ফারের টুপি। নীল ইউনিকর্ম পরা দুই নরওয়েজিয়ান সামাল দিচ্ছে তাদেরকে। বাকি দু'জন হাউসের বারান্দার দুই রাশিয়ান পুলিশের সাথে দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

সামাল দেয়ার জন্যে এই চারজন পুলিশই ছিল এতদিন। আজ আরও দশজন এসেছে দুই মস্তীর সাথে।

জটলা নীরব। লোকগুলোর চাউনি সন্দেহজনক মনে হলো কবীর চৌধুরীর। তার কারের মধ্যে উকিঝুঁকি মারছে। বিকোভ ধরনের কিছু আশঙ্কা করছিল সে, কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না।

আধ ঘণ্টার মধ্যে বড়সড় কনফারেন্স রুমে মিলিত হলো দু'পক্ষ। প্রথমদিনের তুলনায় গভর্নরকে আজ বেশ আত্মশীল মনে হলো তার। মানুষটা ছোটখাট। মুখটা একটু বাঁকা, প্রাচীন ভাইকিংদের মত। গালে চাপদাড়ি, মাথায় ঘন, প্রায় কু-কাট চুল। পরনে ফর্মাল পোশাক। যদিও আজকের আলোচনায় তার অংশ নেয়ার ভেমন সুযোগ নেই। কথাবার্তা হবে অসলোর বিচার মস্তীর সাথে। তিনিই সোয়ালবারের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

সৌজন্য প্রদর্শনে কার্পণ্য করলেন না গভর্নর প্রিভেনসেন সিসেলম্যান, কবীর চৌধুরী ও ম্যাকারভকে বসতে বললেন। কবীর চৌধুরী লোকটা যে-ই হোক, এ মুহূর্তে সে এখানে মস্কোর অফিশিয়াল প্রতিনিধি। খবরটা প্রায় সাতদিন আগে জানা হয়ে গেছে তার। যেদিন অ্যারোস্ট্রোটের প্লেনে চড়ে রুশ বর্ডার ট্রিপস এল, সেদিন এয়ারফিল্ডে গিয়ে খবরটা জেনে আসতে হয়েছে। লোকটার নামে ক্রেমলিনের অথরাইজ লেটারও ওই একই প্লেনে এসেছে। সেটা পড়তে দেয়া হয়েছিল তাঁকে। সেদিন থেকেই লোকটা আসল পরিচয় জানা গেছে—ত্রিপাঠী নয়, কবীর চৌধুরী।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এরকম ঘটনা একেবারেই অস্বাভাবিক, অপ্রত্যাশিত। রাজনীতিক তো নয়ই, এমনকি সোভিয়েত নাগরিকও নয় লোকটা। অদ্ভুত কাণ্ড। তবু বিষয়টা মেনে নেয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না সিসেলম্যানের। আজও নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পাশে বসা বিচারমস্তীর দিকে তাকালেন তিনি।

'আমরা এসেছি সোয়ালবারের ওপর নরওয়ের সার্বভৌমত্বের কথা নতুন করে ঘোষণা করতে,' আপোষহীন গলায় শুরু করলেন মস্তী, 'এবং আমাদের প্রতিপক্ষ বন্ধুদেরকে সে কথা মনে রেখে বিশ্ব শান্তির খাতিরে অবিলম্বে এখান থেকে নিজেদের সৈন্য-সামন্ত প্রত্যাহার করার দাবি জানাতে। তবে অ্যারোস্ট্রোটের যে পাঁচজন গ্রাউন্ড কন্ট্রোল টিম মেম্বর আছে, তারা থাকতে পারবে। এ ব্যাপারে নরওয়ের কোন আপত্তি নেই। বরং আমরা তাদের নিরাপত্তা বিধান করব।'

আগে থেকে তৈরি একটা স্টেটমেন্ট ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করল কবীর চৌধুরী। চেহারা দোষেই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছে সে। বিবৃতিতে নরওয়েজিয়ান মস্তীকে মনে করিয়ে দেয়া হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজিদের দখল থেকে সোয়ালবার আকিপেলাগো মুক্ত করতে রাশিয়ার আর্টগ্রিশ হাজার বীর সৈনিক আত্মত্যাগ দিয়েছিল, যুদ্ধের পর নরওয়েকে বিয়ায় আইল্যান্ড দিয়ে দিয়েছিল রাশিয়া, বিনিময়ে সোয়ালবারে নরওয়ে ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যৌথভাবে প্রশাসন পরিচালনা করবে বলে চুক্তি করেছিল নরওয়ে।

তারপরও এতবছর মস্কো সে চুক্তি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু সম্প্রতি উত্তর

আটলান্টিক ও ব্যারেন্ট সী-তে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকার অগ্রাসী তৎপরতায় সে উদ্ভিগ্ন। এই এলাকায় একাধিক কারিয়ার জাহাজ মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র, যার অন্তত একটায় ক্রুজ মিসাইলও আছে। এই পরিস্থিতি সোয়ালবারের নিরাপত্তার জন্যে মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে বলে মস্কো '৪৫ সালের চুক্তিকে কার্যকর করা জরুরী মনে করছে।

এ ছাড়া সেই চুক্তিতে আরও বলা ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নরওয়ে যৌথভাবে সোয়ালবারের অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করবে। যেহেতু নরওয়ে এতবছরেও সে ক্ষেত্রে কোন উন্নতি ঘটতে পারেনি, সেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন কাজটা এককভাবে করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

এর ফলে নরওয়ের সার্বভৌমত্ব কোনমতেই লঙ্ঘিত হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন যা করছে, ইন্টারন্যাশনাল ট্রীটির আর্টিকেল তিনের অধীনে করছে।

পাল্টা আক্রমণ সেরে মুখ তুলল কবীর চৌধুরী। মস্কোর দাবির পুরোটা সত্যি নয়, খুব ভাল করেই জানে সে। আরও সত্যি যে প্যাঁচটা সে-ই লাগিয়েছে ইস্যুটাকে দীর্ঘায়িত করে দর কষাকষির সুবিধের জন্যে। একই সাথে নরওয়েকে বিভ্রান্তও করবে ভাষার মারপ্যাঁচ। সেটা ঘুচাতে হলে অসলোকে হেগের ইন্টারন্যাশনাল কোর্টের আশ্রয় নিতে হবে, যদি সে চায়। জানা কথা, কম করেও পাঁচ বছর লাগবে সেখান থেকে রায় পেতে।

বিচার মস্তী চুক্তিটিকে অস্বীকার করতে চাইলেন তাঁদের পার্লামেন্ট স্টরটিং অনুমোদন করেনি বলে। 'আপনাদের স্টরটিংয়ের গাফিলতির জন্য মস্কো দায়ী নয়,' জবাব দিল সে। 'তার দৃষ্টিতে চুক্তি চুক্তিই। নরওয়ের রাজা হয়তো ভুলে গেছেন পর্যতাল্লিশে নাজিবাহিনী কি ভয়াবহ তাওব চালিয়েছিল সোয়ালবারে। কিন্তু রাশিয়া সে কথা ভোলেনি, কারণ এই মাটিতে তার আর্টগ্রিশ হাজার বীর সন্তানের রক্ত মিশে আছে। কাজেই, মার্কিন নৌ-বহর এই অঞ্চল থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত সোয়ালবার নিরাপদ, মস্কো তা মানতে রাজি নয়।

ভুরু কুঁচকে উঠল কর্নেল ম্যাকারভের, কবীর চৌধুরীর গলার স্বরে এবার কড়া ঝাল ছিল টের পেয়ে ঘুরে তাকাল। কেমন যেন বেমানান লাগল তার। মনে হচ্ছে আমেরিকার ওপর কোন কারণে খেপে আছে লোকটা। সত্যি, নাকি তার কল্পনা? কিন্তু মানুষটার চেহারা দেখে তা মনে হলো না ম্যাকারভের। রাগে তেতে আছে তার বড়সড় মুখটা, চাউনিও ঘোলাটে। ব্যাপারটা কি?

নিজেকে সামলাল সে। হোকগে যা খুশি, তাতে আমার কি? তাদের হয়ে গোটা বিশ্বকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে লোকটা, কাজেই...ভাবনার গাড়ি বাম্প করল ম্যাকারভের। এই কাজটা আমরাই করতে পারতাম, তাহলে...কবীর চৌধুরীর গলা শুনে নচকিত হলো সে।

'তবে আমরা এ কথাও জোর দিয়ে ঘোষণা করছি,' বলল সে। 'সোয়ালবারের ব্যাপারে মস্কো যে পদক্ষেপই নিক, নরওয়ের সাথে আলোচনা করেই নেবে। এবং নরওয়ের সরকারের যে সমস্ত বিধি নিষেধাজ্ঞা আছে এ অঞ্চলের ক্ষেত্রে, তার প্রতিটার ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল থাকবে।'

এই আরেকটা ডাহা মিথ্যে, ভাবল ম্যাকারভ। মনে মনে হাসল।

অসহায় দেখাল বিচার মন্ত্রীকে। কিন্তু মাত্র চোদ্দজন পুলিশ নিয়ে প্রায় দুশোর বিরুদ্ধে করার কিছু নেই। মীটিঙের শেষ পর্যায়ে যখন বলা হলো আশপাশের অনাসব নরওয়েজিয়ান স্টেলমেন্ট-নি অ্যালেনসান্ড, সন্ডিয়া এবং ইসকিওর্ডের মোহনার রেডিও স্টেশনের নিরাপত্তার জন্যেও রুশ পুলিশ মোতায়েন করা হবে, মৌখিক আপত্তিও জানালেন না মন্ত্রী।

চার ঘণ্টা পর অসলো ফিরে গেল ডেলিগেশন। আরেক দফা চোস্ত গার্ড অভ অনার জানানো হলো তাদেরকে। প্রেনের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে মুখ তুলে প্রাচীর বেরগেটের সমতল চূড়োর দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। গাঢ় আকাশের পটভূমিতে ধপধপে সাদা একটা রেখার মত দেখাচ্ছে ওটাকে। সেদিকে তাকিয়ে কিছু বলল সে, জেটের গর্জনে গুনতে পেলে না ম্যাকারড।

‘কিছু বলছেন, স্যার?’

‘সূর্য উঠতে এখনও অনেকদিন বাকি, পলকভনিক,’ বলল সে। ‘কিন্তু অতদিন দেরি করলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনি কালই প্রাচীর বেরগেটে উঠবেন। রাডারের জন্যে সাইট বাছাই করে রাখতে হবে। ‘আমি অবশ্য একবার উঠেছিলাম,’ শ্রাণ করল কবীর চৌধুরী। ‘কিন্তু আমি এঞ্জিনিয়ার নই। আপনাকে যেতে হবে।’

‘রাইট, স্যার।’

‘রাডার এক্সপার্টরা খুব শীঘ্র আসবে।’

সে রাতে নিজের হোটেল রুমে ফিরে কাগজ কলম নিয়ে বসল ম্যাকারড। লেনিনগ্রাদে থাকে তার সিভিল সার্ভেন্ট স্ত্রী, সুন্দরী সন্তেভলানা, তাকে চিঠি লিখতে হবে। তাদের একমাত্র সন্তান, এগারো বছরের আলেক্সেইকে নিয়ে এখানে বেড়াতে আসার সুযোগের অপেক্ষায় আছে সে।

সতর্কতার সাথে শব্দ বাছাই করে লিখতে শুরু করল ম্যাকারড। মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে শেখা কষ্টসাধ্য ভাষায় সোয়ালবার প্রসঙ্গে লিখল। এভাবে লেখার কারণ, সে খুব ভাল জানে প্রতিটা চিঠি তার দেশে সেন্সর হয়। কেজিবি’র একটা বিশেষ সেল আছে এ জন্যে, বর্তার পুলিশের অফিসার বলে তাকে রেহাই দেবে না ওরা।

বেশ বড় হলো চিঠিটা, কিন্তু তখনই ওটাকে খামবন্দী করল না সে। রেখে দিল সকালের জন্যে। যদি নতুন কিছু মনে পড়ে, শেষ অংশে জুড়ে দেবে কাজে যাওয়ার আগে।

প্র্যাকটিস।

১৯০৫ সালে আমেরিকান পর্যটক লংইয়ার যে উপত্যকায় তার কোল কনসেশন খুলেছিল, সেটা বড়জোর আড়াই মাইল দীর্ঘ। এখন সেখানে রুশ পুলিশ টহল দেয় চম্পিশ ঘণ্টা। সদাসত্যক।

দুই সারি পাহাড়ের মধ্যকার ইসকিওর্ডের কাছে পৌঁছে ঢালু হয়ে উঠে গেছে সেটা। মাইন শ্যাফটগুলো ওটার তলা দিয়ে আড়াআড়িভাবে এগিয়ে গেছে। শেষ হয়েছে আরেক পাহাড়ের চূড়োর কাছে। ওটার দু’দিকে দুটো গ্লোসিয়ার। গ্লোসিয়ার

থেকে নেমে আসা পানির ধারা দু’ভাগ করে ফেলেছে উপত্যকাটিকে। ধারার দু’দিকে দুটো রাস্তা-একটা এসেছে এয়ারফিল্ড ও কী (Quay) থেকে, অন্যটা অ্যাডভেন্টডালেন নামের আরেক বড় উপত্যকা থেকে। গভর্নরের অফিস ও চার্চ প্রথমটার দিকে। বাকি সব ঘরবাড়ি, মাইনারস অ্যাকোমোডেশন ব্লক অন্যটার দিকে।

অসলোর ডেলিগেশন চলে যাওয়ার দুদিন পরের ঘটনা। অ্যাডভেন্টডালেনের দিক থেকে আসা রাস্তার পাশের এক রুমের অ্যাপার্টমেন্টে নাস্তা করছে একত্রিশ বছরের মাইনিং সার্ভেয়র পল মিডল্যান্ড। কান খাড়া, অসলো রেডিওর সকালের খবর শুনছে। জানালা দিয়ে প্রাচীর বেরগেটের চূড়া দেখতে পাচ্ছে সে। নিচের আলোকলম্বে মাইনের মূল প্রবেশ পথও।

নজর সেদিকে থাকলেও কান ও মন, দুটোই খবরের দিকে রয়েছে মিডল্যান্ডের। বিশেষ একটা সঙ্কেতের অপেক্ষায় আছে সে। পেলেই কাজে লেগে পড়বে। একটু পরই পাওয়া গেল সঙ্কেত, খাওয়া থামিয়ে বসে থাকল সার্ভেয়র। একটা বাকা কৌশলে দু’বার পড়েছে পাঠক, অর্ধাং রিপট করেছে। এই রিপোর্টেশনের জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। সেটা এরকম: সোসেস ইন সোয়ালবার প্রোইং ডিসকন্টেন্ট ইন দ্য মাইনিং কমিউনিটি দেয়ার। দ্য জাস্টিস মিনিস্ট্রি অ্যাপিলস টু অল সিটিজেনস টু রিমেইন কাম। নাথিং শুড বি ডান টু প্রেজুডিস নেগোসিয়েশন। দ্য মিনিস্ট্রি আক্সস আস টু রিপট দিস অ্যাডভাইস। নাথিং শুড বি ডান টু প্রেজুডিস নেগোসিয়েশন।

স্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হলো মিডল্যান্ডের, রেডিও অফ করে সেরিয়ালের বাউল টেলে সরিয়ে দিল সে। রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। পূর্ব-পরিকল্পিত সঙ্কেতটা প্রচারিত হয়েছে নরওয়েজিয়ান আর্মির স্থানীয় তিনজনের আভারগ্রাউন্ড ইন্টেলিজেন্স সেলের উদ্দেশ্যে। তাদের অ্যাকশনের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। সেলের একজন সে নিজে, অন্য দু’জনের একজন মাইন ফোরম্যান, হাকুন। শেষেরজন মেয়ে, অ্যানি। স্থানীয় ব্যাঙ্কে চাকরি করে। সেলের রেডিও অপারেটর সে। এরা তিনজন কখনোই একত্রিত হয় না নিরাপত্তার স্বার্থে।

১৯৭৮ সালে শেষবার অ্যাকটিভেট করা হয়েছিল সেলটাকে, যখন ব্যারেন্টসবার্গে রুশ হেলিকপ্টার বেজ নির্মাণ করা নিয়ে দু’দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। আজ রাতে মিনিয়োচারাইজড এজেন্ট রেডিওর মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলীয় বোডো শহরের ডিফেন্স কমান্ড ফর নর্থ নরওয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে তাদেরকে। ওটার সাহায্যে সেকেন্ডেরও কম সময়ে কোডেড মেসেজ ট্রান্সমিট করতে পারে অ্যানি। একেবারে আনডিটেকটেবল নয় ওটা, খুব সফিস্টিকেটেড মনিটরিং সিস্টেম হলে পিক করে ফেলতে পারবে মেসেজ, সে যত সফিস্টিকটেড হোক। তবু পাঠাতে হবে, উপায় নেই।

ঘটনা জাহলে দ্রুত ঘটতে শুরু করেছে, মনে মনে বলল মিডল্যান্ড। সে জানে, এখানে রাশিয়ান আগ্রাসন প্রতিহত করতে কমান্ডো হামলার প্রায় প্রায় পাকা হয়ে গেছে, সেটা যাতে সফল হয়, সেজন্যে এখন কাজ করতে হবে তাদেরকে। এই মিশনের নেতৃত্ব দিতে হবে তাকে, নরওয়েজিয়ান আর্মির

স্পেশাল রিজার্ভ শাখা কিয়েগার-এর ক্যাপ্টেন পুল মিডল্যান্ডকে।

প্রত্যেকটা দেশেরই বিশেষ বাহিনী থাকে, বিশেষ সময়ে যার ডাক পড়ে। এর সদস্যরা ফিজিক্যাল ফিটনেস, সাহস, বুদ্ধি ইত্যাদিসহ সবদিক থেকে হয় সেরা। নরওয়েরও আছে-যার নাম কিয়েগার ও ফলশ্রিময়েগার-প্যারাওটিস্ট। এই বাহিনীর সদস্য সংখ্যা মাত্র ১২০, এর তিন ভাগের এক ভাগ রেগুলার আর্মিতে আছে। অন্যরা তার মত রিজার্ভিস্ট। ১৯৪০ পর্যন্ত নিরপেক্ষ দেশ ছিল নরওয়ে, ফলে অপ্রস্তুত অবস্থায় জার্মান আক্রমণের মুখে নাকাল হতে হয়েছে। সে অবস্থায় আর পড়তে চায় না তারা, তাই দেশের প্রতিটা সীমান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রিজার্ভিস্টরা।

চারদিন আগের কথা ভাবল পুল মিডল্যান্ড। কাছের নি অ্যালেসান্ডে যেতে হয়েছিল তাকে একটা খনি সার্ভে করতে। ওখান থেকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু গিয়ে বুঝতে পেরেছে অন্য কাজে ডাকা হয়েছে তাকে। পথের মাঝে আরেক বোট এসে ভিড়েছিল তার বোটের গায়ে, কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। অচেনা এক লোক এক কোডেড মেসেজ ধরিয়ে দেয় হাতে। ওঁতে তাকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল। আজকের রেডিও সঙ্কেতটা ছিল ফাইনাল নির্দেশ।

কোন সমস্যা নেই। এখানে সে একজন ক্রীম শেভড, হ্যান্ডসাম, ইয়াং ইগজেকিউটিভ। কাজের সময় কাজ আর অবসরে ক্রস-কান্ট্রি স্কি করে কাটায়ে। বাদামী চুল তার, চোখের রং ইসফিওর্ডের পানির মত নীল। এখানকার প্রত্যেক চেনে তাকে, উপযুক্ত সম্মানও করে।

নাস্তার বাসন-কোসন ধুয়ে জায়গামত সাজিয়ে রেখে পারকা গায়ে দিয়ে নিল মিডল্যান্ড। সন্ধ্যায় আন্নির সাথে দেখা হবে ভেবে খুশি। ওকে খুব ভাল লাগে তার। যদি নিরাপত্তার সমস্যা না থাকত, তাহলে মেয়েটার সাথে ডেটিং করত সে।

চারটার অফিস থেকে বের হয়ে ব্যাঙ্কের দিকে চলল। একটু দূরেই ওটা, একটা লালচে-দোতলা বিল্ডিংয়ের পর ছোট কিন্তু চমৎকার কাঠের ভবনে। গেটের ওপরে বড় এক সাইন: TROMS SPAR BANK.

ভেতরটা অন্ধকার, বন্ধ হয়ে গেছে ব্যাঙ্ক। মিডল্যান্ডও তাই আশা করছিল। ভবনটার পাশে ঝলমলে এক খুঁদে সুপার মার্কেটে ঢুকে পড়ল সে। ওখানেও নেই আন্নি। কাজেই ওর বাসার দিকে চলল সে। ব্যাঙ্কের অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে তারই মত এক কামরার অ্যাপার্টমেন্টে থাকে মেয়েটা। সুন্দর সাজানো-গোছানো।

'চমৎকার!' চারদিকে নজর বুলিয়ে প্রশংসা করল পুল মিডল্যান্ড। 'খুব সুন্দর করে সাজিয়েছ ঘরটা।'

'বন্যবাদ,' বলল আন্নি। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট এক। মিডল্যান্ডের মত তার চুলও বাদামী, চোখের রং নীল। ভরাট দেহ। মুখটা ডিম আকৃতির। ঝাড়া, একটু ছোট নাক। যে কোন পুরুষের বুকে কামনার আগুন ধরাতে পারে মেয়েটা। এক পীস কেক ও গরম কফি দিয়ে মিডল্যান্ডকে আপ্যায়ন করল সে। সরাসরি ব্যাঙ্কের কথা পাড়ল।

'সকালের ব্রডকাস্ট শুনেছি আমি। তোমার অপেক্ষার ছিলাম।'

ওয়ান-টাইম প্যাডে লিখে আনা কোডেড মেসেজটা তার হাতে তুলে দিল

সে। ওটার চোখ বুলিয়ে কাবার্ড থেকে একটা সুটকেস বের করল আন্নি। ওটা খুলে কাপড়-চোপড়ের ভেতর হাত গলিয়ে ছোট্ট একটা রেডিও বের করে আনল। ওটার হাতখানেক দীর্ঘ এরিয়েল তুলে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মেসেজ ট্রান্সমিট করল। একেবারে সহজ, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কাজটা করল আন্নি, যেন কোন বন্ধুকে টেলিফোন করছে।

সতর্ক, প্রস্তুত ছিল বোডার অপারেটর। দু'মিনিটের মধ্যে জবাব এল। ওটাকে ডিকোড করে নিরবে আন্নির হাতে তুলে দিল মিডল্যান্ড। পড়ল সে ওটা, মাথা ঝাঁকাল। 'আমি কথা বলব ফ্রেডারিক ফলভিকের সাথে। এয়ারফিল্ডের যাবতীয় খবর পাওয়া যাবে লোকটার কাছে। ওদের ওপর ভীষণ খেপে আছে সে, নিকটই সাহায্য করবে আমাদেরকে।'

মাথা দোলাল পুল মিডল্যান্ড। 'ঠিক আছে, কিন্তু সাবধানে।'

ছয়

নরকোক, ভার্জিনিয়া। রাহাত খান ফিরে যাওয়ার চারদিন পরের কথা।

SACLANT অ্যাডমিরাল হাওয়ার্ড কিঙের মুখোমুখি বসে আছে রানা ও সোহানা। ভাইস-অ্যাডমিরাল ফ্র্যাঙ্ক শিপলেকও আছেন।

লংইয়ারবিয়নে নরওয়েজিয়ান প্যারাওটিস্টদের তিন সদস্যের একটা স্ট্রীপার সেল আছে, রানার প্রশ্নের জবাবে বললেন অ্যাডমিরাল। 'ওটাকে অ্যাকটিভেট করা হয়েছে। আশা করছি কালকের মধ্যে ওখানকার যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য হাতে এসে যাবে। অবশ্য এর মধ্যে কিছু কিছু তথ্য পেয়েও গিয়েছি।'

সামনে রাখা একটা ফাইলে চোখ বোলালেন তিনি। 'আমাদের স্যাটেলাইটের পাঠানো নতুন কিছু ছবি আর তথ্য এসেছে। তাতে জানানো হয়েছে, এয়ারফিল্ডের কাছে এক পাহাড়ে রুশদের একটা সার্ভে টিমের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। ওটার নাম প্রুটা বেরগেট। বোঝা যাচ্ছে ওখানেই রাডার বসাতে যাচ্ছে ব্যাটারি। নরওয়ের প্রতিবাদ, কটনৈতিক তৎপরতা, কোনকিছুতেই কাজ হচ্ছে না।'

'গত পরও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সোয়ালবার ডিবেট থেকে উঠে চলে গেছে সোভিয়েত রুট্রদুত,' বললেন শিপলেক। 'বলে গেছে, এটা তাদের আর নরওয়ের সমস্যা, তারাই মিটিয়ে ফেলতে পারবে। জাতিসংঘের মোড়লীর দরকার নেই।'

মাথা দোলাল রানা। 'পত্রিকায় পড়েছি।'

'নরওয়ে?' সোহানা বলল। 'ওরা কোন কড়া স্টেপ...'

'সাহস পাচ্ছে না,' শিপলেক বললেন। 'বেশি চাপাচাপি করলে ওটা পুরোপুরি বেদখল হয়ে যাবে আশঙ্কা করছে অসলো। এখন আর কোন উপায় নেই, যা করার বাকি আঙুলেই করতে হবে, মেজর।'

'আমি একটা সম্ভাবনা নিয়ে ভাবছি,' বলল রানা। 'তার সাথে একটা আশঙ্কার কথাও।'

নড়েচড়ে বসলেন দুই বৃদ্ধ, চেহারায় কৌতূহল। 'বলুন, প্রীজ!' কিং বললেন। 'প্রথমে আশঙ্কার ব্যাপারে বলুন।'

'উরসুলার কথা নিশ্চই মনে আছে আপনাদের?'

মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত দেখাল তাদেরকে। 'উরসুলা?' কিং বললেন।

ব্রাসেলসের ন্যাটো হেড অফিসের ক্রাক,' গভীর হলো রানা। 'বিরশি সালে ওখানকার কিছু ইম্পোর্ট্যান্ট ডকুমেন্টস নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।'

'ও, হ্যাঁ। মনে আছে, তাই কি ভোলা যায়?' সমর্থনের আশায় শিপলেকের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু সে কথা কেন?'

'মিশনের নিরাপত্তার কথা ভেবে তুলতে হলো,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল রানা।

'আমাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করবে গোপনীয়তার ওপর। প্রাটা বেরগেটে গিয়ে আচমকা রাশিয়ান রিসেপশন কমিটির সামনে পড়তে চাই না আমি। কাজেই...'

'আমি বুঝতে পেরেছি আপনার কথা, মেজর,' বাধা দিয়ে বললেন কিং।

'সেরকম কিছু ঘটলে আমরাও কঠিন সমস্যায় পড়ব। এ ব্যাপারে ব্রাসেলস আর অসলোকে আগেও একবার সতর্ক করা হয়েছে। তবু আপনি যখন কথাটা তুললেনই, আজ আরেকবার সতর্ক করা হবে। বি শিওর অ্যাডভিউট দ্যাট।'

'থ্যান্ক ইউ, অ্যাডমিরাল। এবার অন্য প্রসঙ্গ।'

লংইয়ারবিয়েন। নিজের কন্ট্রোল টাওয়ার অফিসের জানালা দিয়ে প্রাটা বেরগেটের চূড়োর দিকে তাকাল কর্নেল ম্যাকারভ। দীর্ঘদিন পর তার ওপরের জমাট মেঘে ভাঙন ধরেছে। এখন আর নিরেট নেই মেঘ, জায়গায় জায়গায় ফটল ধরেছে আলগা হয়ে যাচ্ছে।

টেলিফোনের শব্দে সচকিত হলো সে। রিসিভার তুলল। 'দা?'

'আজকের দিনটা পাহাড়ে চড়ার উপযুক্ত মনে হচ্ছে,' কবীর চৌধুরীর গলা ভেসে এল। 'এখনই তৈরি হয়ে নিন। দুপুরের মধ্যে পৌছতে পারলে বিকেলে ফিরে আসতে পারবেন সার্ভে সেরে।'

'রাইট, স্যার।'

'আর হ্যাঁ, ফিরতে দেরি করবেন না। সন্দের আগে এখানে দরকার হবে আপনাকে।'

'রাইট, স্যার!' রিসিভার রেখে দিল ম্যাকারভ।

আধঘণ্টার মধ্যে এয়ার ভিকেন্দ্র কমান্ডের চারজনের এক সার্ভে টীম ও একদল ট্রাপারসহ দুটো এম আই-এইট কন্টারে চড়ে এয়ারফিল্ড ত্যাগ করল সে। খুব দ্রুত, কোনাকুলি উঠে যেতে শুরু করল ওখান।

অবাক বিস্ময়ে দ্রুত নেমে যেতে পারল আকাশছোঁয়া পাহাড়টার দিকে ডাকিয়ে থাকল ম্যাকারভ। অনেক উঁচুতে বাউল আকৃতির প্রকাণ্ড এক প্রাকৃতিক আক্সিপিয়ারটার দেখতে পেল পাহাড়ের ধায়ে, একটা মাইন আছে ওখানে। কিছু

পালাও, রানা

কিছুই। তার ওপরের বরফমোড়া পাথর একদম খাড়া হয়ে উঠে গেছে। কন্টার খানিকটা দক্ষিণে সরে আসতে বিশাল V আকৃতির এক উপত্যকা দেখতে পেল সে, একেবারে চূড়ায় গিয়ে ঠেকেছে।

কন্টার নাম ব্রমস্টারডালেন, ভাবল ম্যাকারভ। ফলভিক বলেছিল। গ্রীষ্মে ওখানেই ফোটে বুনো ফুল। ল্যান্ডস্কেপ দেখায় মন দিল, নিচের প্রশস্ত ফিওর্ড এয়ারফিল্ড ছাড়িয়ে বহুদূর চলে গেছে। এরকম এক জায়গায় রাডার কি সাংঘাতিক কাজে দেবে, তা বুঝতে এল্লপার্ট হওয়ার দরকার হয় না।

সমতল চূড়ায় ল্যান্ড করল কন্টার। ধারাল, প্রবল বাতাসের ঝাপটা সামলে নেমে পড়ল ম্যাকারভ, চারদিকে তাকাল। পুরোপুরি সমতল নয় জায়গাটা, তবে তাদের কাজের জন্যে যথেষ্টর চেয়েও বেশি সমতল। প্রায় টেবিল টপের মত। আড়াই মাইল দীর্ঘ ও আধমাইল প্রস্থ, মাঝখানটা উটের পিঠের মত উঁচু, নইলে প্রায় সমতলই বলা চলে। তীব্র বাতাসের কারণে বরফ বেশি পুরু হয়ে জমাতে পারে না এখানে, বেশিরভাগই উড়ে যায়।

অস্টিমিটারের ওপর চোখ বোলাল কর্নেল-পনেরোশো ফুট ওপরে রয়েছে তারা। প্রচণ্ড হিম বাতাসের কারণে নিচের তুলনায় তাপমাত্রা আরও পাঁচ ডিগ্রী কম এখানে-বিলো খাটি ওয়ান। শরীর গরম রাখার জন্যে লেফট-রাইট করতে লাগল কর্নেল। তার পিছনে, দক্ষিণে, বিশাল এক রিজ। প্রাটা বেরগেট থেকে আরও দেড় হাজার ফুট উঁচু।

'ওটার ওপর বসালে মনে হয় আরও ভাল হত,' রিজটা দেখাল সে। 'এটার চেয়ে অনেক উঁচু ওটা।'

'কোন প্রয়োজন নেই, কমরেড পলকভনিক,' বলল সার্ভে দলের নেতা ইয়াকুশকিন। 'ওটা আমাদের দক্ষিণের বাধা। সে জন্যে কোন সমস্যা হবে না আমাদের।' হাত তুলে উল্টোদিক দেখাল। 'আমেরিকার দিকটা খোলা থাকলেই চলবে। এখানে বসালে অন্তত চারশো মাইল দূরে থাকতে ওদের ক্রুজ মিজাইল বা লো-ফ্লাইং প্রেন আইডেন্টিফাই করতে পারবে আমাদের রাডার।'

ওপরের পরিস্থিতি ভাল করে বুঝে নিল ম্যাকারভ। আসল কাজ শুরু করার আগে অবশ্যই ক্যাম্প করতে হবে এখানে, নইলে আবহাওয়া বিগড়ে গেলে নির্মাণ শ্রমিকরা বিপদে পড়ে যাবে।

'কবে নাগাদ কন্ট্রাকশন শুরু করা যায়?'

'গ্রীষ্মে হলে সবচে' ভাল হয়, কমরেড পলকভনিক,' ইয়াকুশকিন বলল।

'বরফ গলে গেলে নিশ্চিন্তে কাজ করা যেত।'

'তা যেত, কিন্তু আমাদের হাতে অত সময় নেই,' পা ঠুকতে ঠুকতে বলল ম্যাকারভ। 'গ্রীষ্ম এসে যাতে এখানে রাডার দেখতে পায়, সেই ব্যবস্থাই করতে হবে।'

ফিরে এনে অফিসে তার খাবার পৌছে দেয়ার আর্ডার দিল সে, তদুপর রাডারের জন্যে কি বদনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেয়া যায়, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে বসল। প্রাটা বেরগেটের তিনদিকে রয়েছে দুর্গারোহ ক্রিফ। ম্যান্ডিন্টিয়ারদের জন্যে নয় অবশ্য, তারা চেপ্টা করলে উঠতে পারবে। কিন্তু তাতে তাদের কারও না

পালাও, রানা

কারণ চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে, কেন না ওই তিনদিক খোলা। কেবল দক্ষিণদিক, যদিকে উঁচু রিজটা রয়েছে, সেদিক থেকে সবার অলসে আসতে পারে শত্রু। ওটা থেকে রজারের দূরত্ব তিন কিলোমিটার। মাঝে সমতল ভূমি। অথবা বরফ আর তুষারমোড়া প্রান্তরও বলা যায়। ওই পথে যদি কেউ আসতে চায়, কঠিন হাসি ফুটল কর্নেলের মুখে, তাহলে ওই প্রান্তর হবে তার বা তাদের বধ্যভূমি।

নিজের অফিসে বসে আছে কবীর চৌধুরী। নজর বাইরে। এইমাত্র দুটো এমআই-এইট উড়ে যেতে দেখেছে সে, প্রাটা বেরগেট গেছে পলকভনিক ম্যাকারভ। আর কয়েকদিনের মধ্যে রুশ আলি ওয়ানিং রাডার বসে যাবে ওখানে, তারপর আমেরিকার মোডলগিরি চিরদিনের মত খতম হয়ে যাবে, তাবছে সে। শ্রোফ কাণ্ডজে বাঘে পরিণত হবে দেশটা।

পারমাণবিক বোমার বিশাল মজুত, মিসাইল, অত্যাধুনিক বিমান বহর, নৌ-বহর, সেনাবাহিনী, বেকার হয়ে যাবে সবকিছু। কিছুই করার থাকবে না আর ওদের। এমনকি দূর কক্ষাক্ষির সুযোগটাও না। সব তখন একচেটিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের হয়ে যাবে। সামরিক শক্তির ভারসাম্য রক্ষা নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বকে আর মাথা ঘামাতে হবে না, কারণ তখন 'ভারসাম্য' বলে কিছু থাকবে না। এতদিন নিজেকে পশ্চিমের হর্তাকর্তা-বিধাতা ভাবত আমেরিকা। দু'দিন পর-তুর হাসি ফুটল কবীর চৌধুরীর মুখে।

আঙন নিয়ে খেলা কত বিপজ্জনক, এবার টের পাবে বাহাদুরেরা। কবীর চৌধুরীর পথে বাববার বাধা হয়ে দাঁড়ানোর ফল কত ভয়াবহ, হাড়ে হাড়ে টের পাবে। এই জন্যেই রুশ আশ্রাসনের পর নিজের পরিচয় প্রকাশ পেতে দিয়েছে সে, লংইয়ারবিয়নের ঘটনার নায়ক কে, ওদেরকে তা ভালমত বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে শেষমেশ যা করার সনামে করছে। এখন নিশ্চয়ই হায় হায় করবে ওরা, ভাবল সে, নিজেদের মাথার চুল ছিঁড়বে। তাকে ঘাঁটিয়ে নিজেদের কতবড় সর্বনাশ করেছে বুঝতে পেরে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা ভাবতে গিয়ে বিতর্কিত ফুটল তার চেহারা। এই দেশটাকে কখনোই সহ্য করতে পারে না সে। মনে হয় বুঝি উল্টো গাধার পিঠে চড়ে চলাছে দেশটা, চালাচ্ছে হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীরা। সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে আমেরিকার সাথে পাল্লা দেয়া ছাড়া যেন ওদের আর কোন কাজ নেই।

মুখে মুখে সমাজতন্ত্রী আর তলে-তলে সুবিধাবাদী এই দেশটির সাথে গাটছড়া বাঁধার কোন ইচ্ছে ছিল না তার, ওই চিন্তা মাথায়ই আসেনি কখনও। শ্রোফ টাকার প্রয়োজনে কাজটা করেছে সে।

অবশ্য প্রথমে ওরা যে তাকে নিশ্চয়ভাবে সাহায্য করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মস্কোর সাহায্য না পেলে লংইয়ারবিয়নে টিকে থাকতে পারত না কবীর চৌধুরী। সেই সূত্রেই মন্ত্রী স্টোলিপিন ও অন্য কয়েকজন পলিট ব্যুরো সদস্যের সাথে পুরানো বন্ধুত্ব-কি বন্ধো? নবায়ন?...হ্যাঁ, নবায়ন করে নেয়ার

সুযোগ পেয়েছে সে।

প্রথম প্রথম কাজের পর সময় কাটতে চাইত না বলে পত্র-পত্রিকা পড়তে এখানকার পাবলিক লাইব্রেরিতে নিয়মিত যাওয়া-আসা করত কবীর চৌধুরী। লড়াওনা করে সময় কাটাত। ওখানে পুরানো ম্যাগাজিন-গেজেট ইত্যাদি ঘাঁটিতে গিয়ে সোয়ালবারের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক চুক্তির ফাঁকটা যখন প্রথম চোখে পড়ে, তখন খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি সে। দিয়েছে পরে। ফাঁকটা খুবই বড় এবং সেটা মস্কোকে পূরণ করার সহজ পথ বাতলে দিয়ে বেশ বড় অঙ্কের একটা দাঁও মারা সম্ভব, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে।

এরপর উঠেপড়ে লাগে কবীর চৌধুরী, লন্ডনের এক কাটিং এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করে ১৯৪৫ সালের পর থেকে সোয়ালবার সম্পর্কে পত্রিকায়-ম্যাগাজিনে যত খবর ছাপা হয়েছে, সবগুলোর কপি জোগাড় করে নতুন উদ্যমে কাজে লেগে পড়ে। তারপর ঘনঘন মস্কো যাওয়া-আসা শুরু করে। প্রতিবারই বন্ধুদের জন্যে দামী দামী উপহার নিয়ে গেছে।

তাদের সাথে সম্পর্ক ভালই ছিল কবীর চৌধুরীর, এর ফলে তা আরও বাড়ল। তারপর সময় বুঝে বিষয়টার সূত্রপাত ঘটাল সে। মস্কোর কাছে পেরেদেলকিনো নামের এক জায়গায় বিশাল এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠা সরকারী অবসর ঘাপন কেন্দ্র 'দাচা' কমপ্লেক্সে নিজের দাচায় ছুটি কাটাচ্ছে তখন সময় মন্ত্রী স্টোলিপিন, কবীর চৌধুরীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

এ ব্যাপারে তাকে একান্তে আভাস দিয়েছে সে ওর দাচায় গিয়ে। জানিয়েছে, যদি সে তাকে সাহায্য করে, তাহলে পঁচিশ মিলিয়ন ডলার কমিশন পাবে। অঙ্কটা শুনে সেই যে হাঁ হয়ে গেল মন্ত্রী, প্রায় এক ঘণ্টা লেগেছে সেটা বন্ধ হতে। এরপর নিজের দাবিটা বিশদভাবে জানিয়েছে কবীর চৌধুরী।

দেশকে একক পরাশক্তিতে পরিণত করতে মস্কোর কাছে চল্লিশ বিলিয়ন ডলার কোন ব্যাপারই নয়, কিন্তু তা কি আসলেই সম্ভব? খুবই সম্ভব। কি করে? সেটা শোনার আগে সোভিয়েত সরকারকে তার সাথে একটা চুক্তিতে আসতে হবে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে চুক্তিটা লোক মারফত লন্ডনে নিজের উকিলের কাছে পাঠিয়ে দেবে কবীর চৌধুরী। সাতদিন অথবা পনেরো দিনের নির্দিষ্ট একটা সময় থাকবে, এরমধ্যে যদি সে উকিলের সাথে যোগাযোগ না করে, তাহলে দলিল ফাঁস করে দেবে সে। শুধু তাই নয়, সেই সাথে দাবির অর্ধেক টাকা তার নাসাউ অ্যাকাউন্টে জমাও দিতে হবে। সে যখন নিশ্চিত হবে টাকা জমা হয়েছে এবং দলিল লন্ডনে পৌঁছেছে, তখন প্র্যান জানাবে। প্রয়োজনে তা কার্যকর করতে সহযোগিতাও করবে।

যদি প্র্যান পছন্দ না হয় সে প্রশ্নই আসে না। নরং শোনার সাথে সাথে সেটাকে কার্যকর করতে উঠেপড়ে লাগবে মস্কো। কাজ হয়ে গেলে বাকি টাকা দিতে হবে, তখন দলিল ফেরত দেবে সে। পুরো টাকাটা যাতে সে পায়, সে জন্যে স্টোলিপিনকে মধ্যস্থতা করতে হবে। মধ্যস্থতার বিনিময়ে পঁচিশ মিলিয়ন পাবে সে।

প্রস্তাবটা জায়গামতই রেখেছিল কবীর চৌধুরী। সময় মন্ত্রী হিসেবে যথেষ্ট

প্রভাবশালী ছিল লোকটা পলিট ব্যুরোর, তারওপর প্রেসিডেন্টের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহচর। সেই সাথে ব্যুরোর আরেক প্রভাবশালী সদস্য, কেজিবি প্রধান আলেক্সেই রতমিস্ত্রভের কুল জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

তাহাড়া সে সময় প্রেসিডেন্টের অতীতের কিছু ভাল পদক্ষেপের মাসুল গুনতে হচ্ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে, পলিট ব্যুরোর তার সমর্থক সদস্যের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমেতে শুরু করেছে। গোপন ভোটে দেবা গেছে এগারো সদস্যের ব্যুরোর পাঁচজনই তার বিপক্ষে চলে গেছে, অন্য পাঁচজন পক্ষে। সৌভাগ্য যে নিজের ভোট ছিল, সেটা প্রয়োগ করে ৬-৫ ভোটে কোনমতে সে যাত্রা রেহাই পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

এই সময় একদিন প্রেসিডেন্টের কাছে কবীর চৌধুরীর প্রস্তাবের কথা তুলল স্টোলিনিন। সেখানে তখন আরও একজন ছিল, সে কেজিবি প্রধান রতমিস্ত্রভ। প্রেসিডেন্টের তখন খড়কুটো পেলোও আঁকড়ে ধরে, এমন অবস্থা। দীর্ঘ আলোচনা হলো কবীর চৌধুরীর দাবির টাকা এবং চুক্তির দলিল-ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে।

সমর মন্ত্রীর মত কেজিবি প্রধানও প্রেসিডেন্টের গুডাকাজক্ষী। দুজনেই তাকে বোঝাল, কবীর চৌধুরী ফালতু কথাই মানুষ নয়। সুতরাং তাকে রাজি হয়ে যেতে অনুরোধ করল তারা। বলল, কাজটা যে যেমন দাবি করছে, যদি সত্যি তেমন হয়, তাহলে লেলিনের চেয়েও বড় নেতায় পরিণত হবেন তিনি রাতারাতি।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর রাজি হলেন প্রেসিডেন্ট। এতবড় অঙ্কের টাকা, পলিট ব্যুরোকে না জানিয়ে দেয়ার উপায় নেই। অতএব নৈটক ডাকা হলো, তোলা হলো খরচের প্রস্তাব। কিন্তু কিসের খরচ, তা বলা হলো না। বলা হলো 'মহান পিতৃভূমির' কল্যাণে খরচ হবে। এ নিয়ে ডিবেট হলো, সদস্যদের মতিগতি দেখে বোঝা গেল বেশিরভাগই সন্দেহে ভুগছে, প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবে কিনা, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

তাদেরকে মনস্থির করতে সাহায্য করল সমর মন্ত্রী ও কেজিবি প্রধান। ব্যক্তিগত ভাবে দেন-দরবার করে তাদেরকে বোঝাতে লাগল পক্ষে ভোট দিতে। তারপরও অল্প মার্জিনে পাস হলো প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব, ৭-৪ ভোটে। প্রেসকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হলো।

দলিল আর দশ বিলিয়ন ডলারের চেক তুলে দেয়া হলো কবীর চৌধুরীর হাতে, গুস্তলোর খাঁটিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে মুখ খুলল সে। তারপর-রাষ্ট্রীয় কমিশনারি থেকে আসা সেরা রুশ জোদকার বন্যায় ভেসে গেল পলিট ব্যুরোর সভাকক্ষের টেবিল-ফোর, পিঠ চাপড়ানির ঠেলায় পিঠ বাথা হয়ে গেল কবীর চৌধুরীর।

তাকে অনুরোধ করা হলো যেন রাডার ইন্সটল না হওয়া পর্যন্ত মস্কোর স্বার্থ দেখানো করে। ব্যক্তিগত টাকা কাজটা হয়ে গেলেই দেয়া হবে। আপত্তির কোন কারণ নেই, রাজি হয়ে গেল সে।

কয়েকটা কারণে রাশিয়ার কাছে সোয়ালবার আর্কিপেলাগোর গুরুত্ব অপরিহার্য। প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, তার খুব কাছেই কোলা

পেনিনসুলা, সোভিয়েত নর্দার্ন ফ্রীটের ঘাটি। শুধু সে দেশের নয়, বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাটি-বড় বড় যত যুদ্ধজাহাজ আছে তার প্রায় অর্ধেক, সবচেয়ে অ্যাডভান্সড ব্যালিস্টিক মিসাইলবাহী সাবমেরিনের চার ভাগের তিন ভাগ সবচেয়ে অ্যাডভান্সড এয়ারক্রাফট এয়ার ফোর্সের ফাইটার বোম্বার, লং রঞ্জ হুশো যুদ্ধ বিমান, ১৩তম ট্যাকটিক্যাল এয়ার ফোর্সের ফাইটার বোম্বার, লং রঞ্জ বোম্বার, নেভাল স্ট্রাইক এয়ারক্রাফট এবং দুটো মটরইজড রাইফেল ডিভিশন ও এক রেজিমেন্ট মেরিন মোতায়েন আছে ওখানে। সোয়ালবার হচ্ছে সেখান থেকে আটলান্টিকে পৌঁছার সহজ রুট।

আরেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ মারমানক। সোভিয়েত বাণিজ্যিক শিপিঙের জীবনরক্ষা গুটা, একমাত্র বরফ-মুক্ত হারবার। সেখান থেকেও আটলান্টিকে পৌঁছার সহজ রুট সোয়ালবার। এবং সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, লংইয়ারবিয়নে রুশরা রাডার বসাতে পারলে মার্কিন মিসাইল বা বিমান, কোনদিন রাশিয়ার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না। আরেকদিকে রাশিয়ার জন্যে তা হবে উল্টো, মিসাইল রেঞ্জের ক্ষেত্রে আমেরিকার দিকে আটগো মাইল এবং ইউরোপের দিকে ছ্যাশো মাইল এগিয়ে যাবে সে। রীতিমত অকল্পনীয় অগ্রগতি।

তাই এখানে দুটো সিস্টেম গড়ে তুলতে যাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। একটা লং রঞ্জ স্ট্রাটেজিক আর্লি ওয়ানিং, অন্যটা লোকাল সার্ভেইল্যান্স। প্রাচীর বেরগেটের রাডার হবে ছোট, লোকাল সার্ভেইল্যান্স রাডার। লং রঞ্জ স্ট্রাটেজিক আর্লি ওয়ানিং রাডার বসানো হবে ইসফিওর্ডে, রেডিও স্টেশনের কাছে। দুটো মিলে হবে চমৎকার এক কমিশন।

যদি এমন হয়, হাডসন স্ট্রাইটের পঞ্চাশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ছে কোন আমেরিকান বি-৫২ বা বি-১, সঙ্গে সঙ্গে ইসফিওর্ডের রাডারে তা ধরা পড়ে যাবে, লংইয়ারবিয়নে এয়ার ফিল্ডের রুশ কন্ট্রোল রুমের ভিডিওতে দশ সেকেন্ডে পাঠিয়ে দেবে সন্দেহে।

আর যদি কোন এয়ারক্রাফট মিসাইল ছোঁড়ে, প্রাচীর বেরগেটের ওপরের রাডার সেটাকে সনাক্ত করবে। যদি সাবসোনিক তুঞ্জ মিসাইল হয়, আঘাত হানার দেড় ঘণ্টা আগে সেটাকে সনাক্ত করা যাবে, ব্যালিস্টিক মিসাইলের ক্ষেত্রে সময় পাওয়া যাবে অল্প-মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড। তবে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে সময়টা যথেষ্ট।

আমেরিকার যদি কখনও রাশিয়াকে আক্রমণ করার দুর্ভাগ্য হয়, যদি ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুঁড়ে বসে, বা লো-ফ্লাইং বিমান পাঠায়, উত্তর আমেরিকার আকাশসীমা পেরিয়ে আসামাত্রই প্রথম রাডারে ধরা পড়ে যাবে সেগুলো।

তৎক্ষণাৎ গুটা সে তথ্য স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ট্রান্সমিট করে দেবে আরখানজেলস্কোই বা আর্চ অ্যাঞ্জেলের রুশ এয়ার ডিফেন্স কমান্ডের হানিওয়েল ২০০০ ডাটা প্রেসেসরে।

হানি ফুটল কবীর চৌধুরীর মুখে-বিদ্রোহ, করুণার হাসি। আমেরিকান মিসাইল বা প্রেন ট্রাক করতে সাহায্য করলে আমেরিকারই তেরি কম্পিউটার। বাহ! ভালই।

দুপুরের পর প্রাচীর বেরগেট থেকে ফিরে রিপোর্ট করল কনসেল ম্যাকারভ। ধ্যানমগ্নের মত তনে গেল সে। মনে মনে সন্তুষ্ট হলো কনসেল দক্ষিণের সন্তোষ।

হুমকিটা সনাক্ত করতে পেরেছে বলে।

'ওদিকটা সামাল দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে,' মন্তব্য করল সে। 'সমস্যা যদি কখনও আসে, ওদিক থেকেই আসবে।'

'ইয়েস, স্যার!' মাথা ঝাঁকাল কর্নেল।

ফোর্ট ব্র্যাগ, নর্থ কারোলিনা।

'জেন্টেলমেন, মীট ইং'র টীম লীডার হিয়ার, মেজর মাসুদ রানা অ্যান্ড হিজ অ্যাসোসিয়েট, মিস সোহানা চৌধুরী,' বলল ডেল্টা ফোর্সের প্রতিষ্ঠাতা, কর্নেল চার্লস বেকউইথ। ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা লোকটা, দানবীয় স্বাস্থ্য-বুকের ছাতি ছেচল্লিশ।

১৯৭৯ সালে তেহরান থেকে মার্কিন জিমি মুক্ত করতে যে কমান্ডো মিশন গিয়েছিল, সেটার পরিকল্পনা ছিল এই লোকের। কিন্তু প্রেসিডেন্ট কার্টার উনিশবার স্থগিত করেন মিশনের যাত্রা, তার কারণ ছিল বিধা-দ্বন্দ্ব আর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অসুবিধা। ফলে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয় 'চার্লিস অ্যাস্বেলস'। তখনই করেননি। 'ব্যর্থতা তার নয়,' মন্তব্য করেছিলেন কার্টার। 'আমাদের। দেরিতে যাত্রা করতে না হলে ও ব্যর্থ হত না।'

তারপর যতগুলো কমান্ডো মিশন চালিয়েছে ডেল্টা ফোর্স, প্রত্যেকটাই সফল। অনেক ভেবেচিন্তে এদের মধ্যে থেকেই কমান্ডো বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা। কয়েকশো ট্রুপার আছে ডেল্টা ফোর্সের, প্রত্যেকে ব্ল্যাক বেরেট। দৈহিক শক্তি, ক্ষমতা আর মানসিক সহায়তার ক্ষেত্রে এরা একেকজন অমানুষই বলা চলে। অফিসারদের সবাই হয় রেঞ্জারস, নয়তো এয়ারবোর্ন ট্রেনিং, কেউ কেউ দুটোই।

ফোর্ট ব্র্যাগ যদি ইংল্যান্ডে হত, তাহলে সেটার ট্রেনিং এরিয়া ও ব্যারাক অ্যান্ডারশাট থেকে লন্ডন পর্যন্ত বিস্তৃত হত—এতই বিশাল জায়গা। আর্মিদের ভাষায় ওটাকে বলা হয় 'রিয়েল এস্টেট'। দুটো ইউএস এয়ারবোর্ন ডিভিশন ও স্পেশাল ফোর্স বা গ্রীন বেরেটের ঘাঁটি ওটা। ডেল্টা পরেরটার অংশ।

একটু আগে ন্যাটোর সী কিং কন্টারে চড়ে এখানে পৌঁছেছে রানা-সোহানা ও অ্যাডমিরাল কিং। এখন ব্যারাকের নিচু ছাদওয়ালা হলরুমে একদল ব্ল্যাক বেরেটের মুখোমুখি বসে আছে।

'মেজর,' রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল বেকউইথ। একটা নামের তালিকা তুলে দিল হাতে। 'আপনার চাহিদা অনুযায়ী বাছাই করা হয়েছে এদের। যে যার ক্ষেত্রে সেরা এরা। এদের জুড়ি খুঁজে পাবেন না আপনি।'

ওটার নয়টা নাম আছে, সেগুলো পড়ল রানা: ক্রেইগ ক্রিফোর্ড, হাওয়ার্ড স্মিথ, ব্রেভিনস্কি, বাকহার্ড জনসন, মিলার, লেইফটেন্যান্ট ওয়েনসন ও পলসেন।

প্রথম এবং শেষের তিনজন বেকউইথের মতো সাধার বিশেষজ্ঞ। উত্তর আটলান্টিক তাদের নর্থদপ্তরে। এছাড়া নর্থওয়েস্টার্ন জাচার ওপার ভাল দখল আছে তাদের, ক্রিফোর্ড ছাড়া বাকি তিনজন নিজেদেরকে নর্থওয়েস্টার্ন দাবি

পালাও, রানা

করলে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। ক্রিফোর্ড কাজ চালাবার মত জানে তাষাটা।

অন্যদের মধ্যে স্মিথ (ক্যাপ্টেন) ও ব্রেভিনস্কি (কর্পো:) ডেমোলিশন এক্সপার্ট, মিলার (সার্জেন্ট) এ প্লাস শ্রেণীর সুইপার, বাকহার্ড (সার্জেন্ট) নেভিগেশন এক্সপার্ট, ঠেকা-বেঠেকায় মেডিকের দায়িত্বও পালন করতে পারবে, এবং জনসন (লেফটেন্যান্ট) ফাস্ট ক্লাস মেডিক-কাম-রেডিও অপারেটর। অবশ্য ওসব নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলল না রানা।

এদের প্রত্যেকের রেকর্ড নরফোকে বসেই জানা হয়ে গেছে। অ্যাডমিরাল কিং'র অনুরোধে ফোর্ড-ব্যাগ কর্তৃপক্ষ পাঠিয়ে দিয়েছিল। একে একে প্রত্যেকের সাথে হাত মেলাল রানা। দু'এক কথায় নৌজন্ম বিনিময় করল।

ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড স্মিথ বলল, 'মনে হচ্ছে মিশন খুব টাফ হবে!'

'আ ভেরি টাক ওয়ান,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'টাফার দ্য বেটার,' চোখের দুই কোণ কুঁচকে উঠল হাওয়ার্ডের। হাসছে।

তালিকার নামগুলো আরেকবার পড়ে নিয়ে একজন একজন করে কল করল রানা, স্মিথ'র পুতুলের মত সতান দাঁড়িয়ে গেল লোকগুলো, এগিয়ে এসে হাত মেলাল লীডারের সাথে।

ডেল্টা ফোর্সের কম্পাউন্ডের বাইরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার তো কথাই নেই, ভেতরের ব্যবস্থাও খুবই কড়া। ট্রুপারদের কেউ কাউকে নাম ধরে ডাকে না। ছবি তোলা কড়াভাবে নিষেধ। তাদের শেখানো হয়, গ্রীন বেরেটরা যে ধরনের পাবলিসিটি উপভোগ করে থাকে, তা কেবল অনাকাঙ্ক্ষিতই নয়, বিপজ্জনকও।

আজকের জন্যে আরও এক কাঠি বাড়তি সতর্কতার আয়োজন করেছে চার্লস বেকউইথ, সেটা হচ্ছে, ব্রীফিং রুমে ঢোকান আগে নতুন করে সদস্যদের আইডি চেক করা। নরফোক থেকে নিয়ে আসা ফটোগ্রাফ ও ভিউগ্রাফের সাহায্যে মিশন ব্যাখ্যা করতে শুরু করল রানা।

'এ মিশনের কোড নেম রাখা হয়েছে ভার্জিনিয়া রিজ,' ঘোষণা করল ও। 'বলার অপেক্ষা রাখে না যে নামটাও টপ সিক্রেট। অন্তত ত্রিশ বছরের আগে পাবলিকের কানে যাওয়া চলবে না এ-নাম। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর মিশন হবে এই "ভার্জিনিয়া রিজ", দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এরকম কোন কমান্ডো মিশনে অংশ নেয়নি আমেরিকা।'

এরপর অসংখ্য ইল্যামিনেশনের সাহায্যে সোয়ালবারের অবস্থান, গুরুত্ব এবং আর্কিপেলাগোর স্ট্র্যাটেজিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলল ও, সেই সাথে রাশিয়ানরা ওখানে কি করতে যাচ্ছে, তাও।

'যে সমস্ত ইন্টেলিজেন্স ইন্টারপ্রিটেশনস আমরা এই অঞ্চল থেকে পাচ্ছি,' রিমোট-কন্ট্রোল বাটন টিপে জ্বীনে নতুন একটা ছবি ফোটাল রানা, 'তাতে ওদের রাডার দেখতে এই ধরনের কিছু একটা হবে।'

ড্রইং বোর্ডে ছোটখাট একটা বিস্ফোরণ ভেসে উঠল, ওটার ছাদ কুঁড়ে বেরিয়ে আছে ইয়া মোটা স্টীলের পিলার, তার ওপর বসানো আছে বিশাল রাডার ক্যানার। হাতে আঁকা ছবি, প্রাচীর বেরগেটের অধিত্যকা, বরফ, সবই আছে ওতে।

পালাও, রানা

'আমাদের লক্ষ্য হবে এই বিল্ডিং,' বলল ও। 'এখনও অবশ্য নির্মাণ হয়নি ওটা, তবে হয়ে যাবে দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে। ততদিনে তুষারপাত বন্ধ হয়ে যাবে ওখানে, তাপমাত্রা একটু একটু বাড়তে শুরু করবে। তবে পুরো আধারে কাজ করার সুযোগ পাব না আমরা, আড়ালও খুব অল্পই পাব। কাজেই খুব সতর্কতার সাথে এগোতে হবে। রাডার ধ্বংস করে দেয়ার পর কন্টার গিয়ে তুলে আনবে আমাদেরকে।'

এক সময় ওর দীর্ঘ বক্তব্য শেষ হলো। এবার একের পর এক প্রশ্ন আসতে শুরু করল। কৌশলগত দিক, অস্ত্রশস্ত্র, রেডিও কমিউনিকেশনস ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাইল সদস্যরা, একজন একজন করে সবাইকে সন্তুষ্ট করল রানা।

'আসাইনমেন্টটা সিআইএ কে দেয়া হলো না কেন?' প্রশ্নটা করল সার্জেন্ট বাকহার্ড।

জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলেছিল ও, কিন্তু লেফটেন্যান্ট জনসন তার আগেই বলে উঠল, 'ওরা আসাইনমেন্ট লেজে-গোবরে করে ফেলবে, তাই।'

হেসে উঠল অন্যরা। রানা মাথা নাড়ল। 'তা নয়। আপনাদের মত মাইন্টেইন-ওয়রফেয়ার স্কিল ওদের নেই বলে দেয়া হয়নি।'

একজন বিদেশী হয়েও রানাকে কেন এই মিশনের লীডার করা হয়েছে, সে প্রশ্ন কেউ তুলল না। কারণ চার্লস বেকউইথ আগেই সে পথ মেরে রেখেছে।

'একটা ব্যাপারে সবাই খুব ভাল করে জেনে রাখুন,' সবার শেষে বলল ও। 'এটা টপ সিক্রেট মিশন। আপনাদের পরিবারের সদস্যদেরকেও এ ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। ইট'স আ ক্ল্যাভেস্টাইন, রিপট, ক্ল্যাভেস্টাইন আসাইনমেন্ট।

আরেকটা কথা, থিওরি অনুযায়ী আমাদের মৃত্যু হলে ঘটনা প্রকাশ্যে জানাজানি হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হবে না। কেননা আমেরিকা এবং রাশিয়া, কেউই এ ব্যাপারে মুখ খুলতে চাইবে না, মার যে-ই থাক, মুখ বুজে হুজুম করে যাবে। আর যদি আপনারা সফল হয়ে ফিরতে পারেন, তাহলেও কেউ বাহবা জানাতে আসবে না। আর্লিংটনে গান স্যালুটসহ দাফন, অথবা প্রেসিডেনশিয়াল রিসেপশন, কোনটাই জুটবে না আপনাদের ভাগ্যে।

'এখনও যদি কেউ দল থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিতে চান, করতে পারেন। সে জন্যে কাউকে দোষ দেয়া হবে না, ডিজঅনারও করা হবে না। নান হোয়াটসোএভার।'

এক এক করে নয়টা পাথর মুখের দিকে তাকাল রানা, সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করল। নয় জোড়া চোখের অপলক চাঁউনি ওর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল।

'খুব শিগগিরি আবার মিলিত হব আমরা,' বলল ও। 'তখন আরও ডিটেইলস আলোচনা হবে। থ্যাঙ্ক ইউ জেনারেলমেন। থ্যাঙ্ক ইউ কর্নেল।'

সাত

স্টার ফিওর্ড, নরওয়ে। আর্কটিক সার্কেলের ভেতরে জায়গাটা।

মাসদ রানা ও SACLANT-এর দ্বিতীয় সাক্ষাতের তিনদিন পরের কথা। নরওয়েজিয়ান আর্মির স্পেশাল শাখার এক মেজর, প্যাট ডিলনের সাথে তার ফিশিং ট্রলার নর্দার্ন লাইটের হুইল হাউসে বসে কথা বলছে অসলোর ন্যাটো নর্দার্ন ইওরোপিয়ান হেডকোয়ার্টার্সের অপারেশনস্ ডিরেক্টরের ভাইস-চেয়ারম্যান হ্যারি পিটারসন।

কলসাস থেকে বারডুকস কন্টারে এসেছে লোকটা, সেখান থেকে গাড়িতে স্টার ফিওর্ড। কাঠের এক জোটিতে বাধা রয়েছে নর্দার্ন লাইট, একটু একটু দুলছে টেউয়ে।

প্রকাণ্ডেহী মানুষ প্যাট ডিলন সাদা, ঢোলা সোয়েটারে পোলার ভলুকের মত লাগছে তাকে। সাইক্লিশ-আটক্রিশের মত বয়স। মুখটা বড়সড়, ফোলা। দাঁত দিয়ে পাইপ কামড়ে ধরে আছে সে। ভাইস-চেয়ারম্যানের প্রশ্নের জবাবে মাথা দোলাল। 'খুব সম্ভব। আমি অন্তত অসম্ভবের কিছু দেখছি না।'

তবু সন্দেহ যায় না পিটারসনের; একবার ডিলনকে দেখছে, আরেকবার নর্দার্ন লাইটের ওপর নজর বোলাচ্ছে। মাঝারি উচ্চতার মানুষ সে, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। গালে চাপদাড়ি, চোখে পাওয়ারওয়লা চশমা। 'আপনার বোট দেখে কিন্তু তেমন মনে হয় না।'

যেৎ করে উঠল মেজর। 'এটা স্ট্যান্ডার্ড ফিশিং ট্রলার, ম্যান! ছয়শো কিউবিক ফুট ক্যাপাসিটির হোল্ড। ভেতরে বাস আছে, মোলোজন মানুষ আর তাদের যাবতীয় জিনিসপত্র অনায়াসে ধরে যাবে, জানেন?'

আরেকবার বোটটাকে দেখল পিটারসন। ট্র্যাডিশনাল ফিশিং ট্রলারই নর্দার্ন লাইট। কাঠের তৈরি। বার্নিশ করা। বড়ির দু'দিকে বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত চার ইঞ্চি চওড়া সাদা ব্যান্ড। ওটার ভেহিকল নম্বর F 192 H। নাক থেকে লেজ পর্যন্ত মাত্র ফুট লম্বা। ছয় জানালাওয়ালা সাদা রং করা হুইল হাউস। তার পিছনে একটা কেবিন। হুইল হাউসের মাথায় একটা সার্চ লাইট এবং একটা বার আকৃতির রাডার ক্যানারও আছে।

'পিছনের হোল্ড ফায়ারপ্রুফ, অ্যামিউনিশন স্টোরেজ ওটা,' আবার বলল পোলার ডুক। 'ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা, হিটার, সব আছে। আসুন, নিজের চোখেই দেখে নিন।'

নীচবে তাকে অনুসরণ করল পিটারসন, দশ মিনিট ধরে ঘুরে ঘুরে দেখল ট্রলারটা। 'স্পীড কত? জানতে চাইল সে।'

'বেশ নয়, দশ নট। ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলে এরকম অন্তত দু'হাজার ট্রলার পাবেন আপনি।'

'হুম!' বলল পিটারসন।

'কতজনের পার্টি?' প্রশ্ন করল মেজর ডিলন।

'সেটা এখনও ঠিক হয়নি,' চিন্তিত চেহারা সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকল ডাইস-চেয়ারম্যান। 'আশা করছি খুব শিগগিরি জানতে পারব তা।' কি খেয়াল হতে বাট করে মেজরের দিকে ফিরল হঠাৎ। 'কিন্তু সাবধান! নরওয়েজিয়ান নেভিকেও কিছু টের পেতে দেয়া চলবে না। টের পেলে নিশ্চই বাধা দেবে ওরা।'

পাইপ হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত লোকটাকে দেখল ডিলন। এমনভাবে, যেন বন্ধুত্ববাদ একজনকে দেখছে। 'অফকোর্স!' মাথা ঝাঁকাল একটু পর। 'সবাইকে জানান দিয়ে গেলে সেটা ক্ল্যাস্ট্রাইন মিশন হয় কি করে?'

'তা বটে।'

হাসি ফুটল প্রকাণ্ডদেহী নরওয়েজিয়ানের মুখে। 'তুধু আমাদের নেভি কেন, রাশিয়ান নেভিকেও চেষ্টা করলে ফাঁকি দিতে পারব আমরা।'

উঠে পড়ল ডাইস-চেয়ারম্যান। 'এবার ফিরতে হয়। যে কোনদিন যাত্রা করার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন। সময় হলে আপনাদের কন্ট্রোলারের নির্দেশ পৌছে যাবে।'

ব্রাসেলস্।

সময় বত ছুটির দিকে গড়াচ্ছে, ততই ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছে সাজা। বারবার ঘড়ি দেখছে, ভয়ে ভয়ে তুলকাচ্ছে জেনারেলের রুমের বন্ধ দরজার দিকে। আজ অতিরিক্ত সময় অফিস করতে হলে সর্বনাশ। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এরিকের জন্যে ডিনার তৈরি করতে হবে তাকে।

'কি হয়েছে, সাজা?' ওর অস্থিরতা দেখে প্রশ্ন না করে পারল না জুলিয়া। 'বয়স্ক্রেণ্ড প্রবলেম? ওদের পিছনে সময় নষ্ট কোরো না, ডিয়ার। আমার পরামর্শ শোনো। বেশি পাত্তা দিয়ো না, সে যদি বেয়াড়া হয়, তাহলে তো...সরি।' অন্যোর সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে বেশি কথা বলে ফেলেছে বুঝতে পেরে লজ্জা পেয়ে গেল।

'কি হয়েছে, জুলি?' ওর কাঁধে হাত রেখে সহানুভূতির সুরে জানতে চাইল সাজা। 'আবার ঝগড়া করেছে ওর সাথে?'

'ও কিছু নয়। তুমি চিন্তা কোরো না, একট্রা টাইম কাজ করতে হলে আমি করব আজ। তুমি চলে য়েয়ো।'

'ধন্যবাদ, ডার্লিং।'

সেদিন সক্রেয় একদম ঘড়ির কাঁটা ধরে সময়মতই এল এরিক ব্রাউন। মেজাজ খারাপ, মূড অফ। এসেই হুইকি ঢেলে নিয়ে বসল, খুব দ্রুত প্রথম পেগ ভেতরে চালান করে দিল। সাজার দিকে নজর নেই। ও যে টুলের রং বদলে ফেলেছে, সেয়ালই করছে না। 'কি হয়েছে তোমার? ভয়ে ভয়ে বলল সে।

'আজ খবর পেলাম, ডের স্পিগেল সত্যি সত্যি ফিচার রাইটার খুঁজতে শুরু করেছে,' বলল এরিক। 'সত্যি সত্যি মাথা চেপে ধরল। 'গড ইন হেভেন। একটা অসম্ভব কুপ নিউজ টাই-ই আমার এই মুহূর্তে। অসম্ভব একটা, নইলে এত কষ্ট,

বিয়ের প্র্যান-প্রোগ্রাম, সব ভেঙে যাবে।'

'কিন্তু আমার অফিসে তো তেমন কিছু ঘটছে না, ডার্লিং।'

'কিছুই ঘটছে না?' সরাসরি ওর দিকে তাকাল জার্মান। 'কিছুই না? বাই গড! দুনিয়াটা কি ধেমো আছে?'

'না, ঠিক তা নয়,' আমতা আমতা করতে লাগল সাজা। 'একটা বিষয় অবশ্য ঘটছে...মানে ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় না সে খবর জেনে তোমার কোন লাভ হবে।'

সোফায় কাত হয়ে প্রায় গুয়ে ছিল যুবক, কথাটা শুনে তিড়িং করে সিধে হয়ে বসল। 'কি, কি! কি ঘটতে যাচ্ছে?'

বলব? ভাবল সাজা, বলি? আজ সে জেনারেল অ্যান্ডারসনকে টেলিফোনে নরফোকের অ্যাডমিরাল হাওয়ার্ড কিঙের সাথে কথা বলতে শুনেছে। তাঁর কথা শুনে মনে হয়েছে আমেরিকা ও নরওয়ে মিলে নরওয়েতে খুব শীঘ্রি যৌথ সামরিক মহড়া শুরু করতে যাচ্ছে, এবং ব্রাসেলস্ সে ব্যাপারে কয়েকদিনের মধ্যে স্টেটমেন্ট প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

কি হবে বললে? দু'দিন পর যে খবর সারা দুনিয়া জানবে, ন্যাটো নিজেই জানাবে, সে খবর দু'দিন আগে এরিক জানলে ক্ষতি কি?

খবরটা শোনামাত্র সতর্ক হয়ে উঠল যুবক। 'সত্যি নাকি? কিন্তু কিছুদিন আগেই না ওখানে ওদের একটা মহড়া হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ। এটা বোধহয় তার ফলো-আপ হবে।'

বাঁকা হাসি দেখা দিল এরিকের মুখে। 'কিন্তু এত সৈন্য, সাজ-সরঞ্জাম জড় করা, এত খরচ, এসব করে লাভ কি বুঝি না। গত মহড়ার ছবি দেখেছ? সৈন্যরা থাকছে, পান করছে, সান-বাথ করছে, এছাড়া আর কিছুর ছবি তো চোখে পড়েনি আমার,' শব্দ করে হাসল এবার। 'এই করে রাশিয়াকে ভয় দেখাতে চায় ওরা?'

হাসিটা পছন্দ হলো না সাজার। 'আমি ওসব জানি না। খবর একটা আসছে, তাই বললাম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মাই লাভ।'

বেশ নিচু দিবে উড়ে চলেছে একটা সী কিং হেলিকপ্টার। ওটার একজোড়া জেট এঞ্জিন আওয়াজ করছে চাপা মেঘগর্জনের মত। একটু নিচে ফুঁসছে ধূসর, ক্রুদ্ধ ব্যারেন্ট সাগর। ছোট একটা জানালা দিয়ে আবছাভাবে বাইরের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে ক্রু-চীফ। মাঝারি তুম্বারপাত হচ্ছে বাইরে। আকাশে ঘন মেঘ।

ওর মধ্যেও সূর্যের দুর্বল হলদেটে আভা দেখা দিচ্ছে মাঝেমধ্যে। আরও উত্তরে গেলে এই আলোটুকুও থাকবে না, সেখানে কেবলই অন্ধকারের রাজত্ব। বাডারের চোখে ধরা পড়ার হাত থেকে বাচতে পানির পরলশ ফুট ওগর দিয়ে ছুটছে সী কিং, মাঝরাতের অন্ধকারে সোয়ালবার পৌছবে। ভেতরের ক্যানভাস সীটে বসে আছে পাঁচ ক্রু, তাদের চীফ কেবল দুইইং হেলমেট পরে আছে। ওটার মাইক্রোফোনের সাহায্যে প্রয়োজনে পাইলটের সাথে কথা বলতে পারে সে।

সজাগ, সতর্ক লোকটা। নরওয়েজিয়ান ক্রিয়েগারের এক লেফটেন্যান্ট।

অন্যরাও স্কিয়েগার। সময় পার করার জন্যে বসে বসে বিমাচ্ছে তারা। এছাড়া করার কিছু নেইও, জেট এঞ্জিনের গর্জনে কথা বলার জো নেই, কিছু বোঝা যায় না। তাই সে চেস্তাও নেই কারও মধ্যে, আসন্ন অ্যাকশনের চিন্তায় মগ্ন তারা। ডিফেন্স কমান্ড হেডকোয়ার্টার্সের ব্রীফিং শেষ হয়েছে যেন কয়েক যুগ আগে; ক্রু-টীফ ভাবছে। মনে হচ্ছে নরওয়ে কয়েক হাজার মাইল পিছনে পড়ে গেছে এতক্ষণে।

পাঁচ ঘণ্টার ফ্লাইট। তিন ঘণ্টার মাধ্যম হ্যামারফেস্ট পৌঁছে রিফুরেলিং করিয়ে নিয়েছে সী কিং, আর অল্প পথ বাকি। গোপন এক মিশনে চলছে স্কিয়েগার বাহিনী। কন্টারের পিছনদিকে বেধে রাখা আছে রসদ-বিকোরক, খাবারের প্যাকেট, সাদা ক্যামোফ্লেজ নেটিং, টেন্ট শীট এবং অস্ত্র-গুলি।

একবারে বিনা নোটিসে কাত হয়ে গেল কন্টার, বিচ্ছিন্নি আওয়াজ করে উঠল রোটর। নিশ্চয়ই রাডারে কোন জাহাজ পিক করেছে পাইলট, ক্রু টীফ ভাবল। সামলে নিয়ে বাইরে তাকাল সে, দূরে অস্পষ্টভাবে ডেউয়ের আহুড়ে পড়া দেখতে পেল যেন। ঘড়ি দেখল। হ্যা, তাই। সামনে ওটা বেয়ার আইল্যান্ড। আধারের রাজত্ব বাড়ছে।

সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ল সে। নড়েচড়ে বসল মানুষগুলো, প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। অনেক সামনে উজ্জ্বল একটা আলো চোখে পড়ল পাইলটের, তিনবার ফ্ল্যাশ করে নিভে গেল। সেখানটায় পৌঁছে শুন্যে থেমে পড়ল সী কিং, ফ্লাইডিং ডোর টেনে খুলে ফেলল ক্রু টীফ। অসহ্য ঠাণ্ডা বাতাসের ধাক্কায় সঙ্গে সঙ্গে দম আটকে এল তার, মনে হলো ভুল করে কোন দৈত্যাকার আইস চেম্বারের দরজা খুলে ফেলেছে বুঝি।

ইন্টারকমের মাধ্যমে ইঞ্চি ইঞ্চি করে কন্টারের উচ্চতা কমাতে সাহায্য করল সে, ল্যান্ড করল ওটা। পাইলট অফ করে দিল এঞ্জিন।

ড্যান মিয়েনফিওর্ডের দুর্গম এলাকা এটা, মানুষজন থাকে না। লংইয়ারবিয়নের পাহাড় শ্রেণী থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। ম্যাগে দূরত্ব তাই দেখানো আছে, কিন্তু যে দু'জন মালপত্র বুঝে নিতে আসছে, তাদেরকে ঘুরপথে কি করে আসতে-যেতে প্রায় একশো কুড়ি কিলোমিটার দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হবে।

রোটর ব্রেড থেমে গেছে সী কিংয়ের, লেফটেন্যান্ট দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে, বাতাসের এলোমেলো গৌ-গৌ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। চার দিগন্তে আকাশছোয়া পর্বতশ্রেণীর ভৌতিক ছায়া। নিঃসঙ্গ একটা তারা টিপ টিপ করছে আকাশে, দুর্বল। দোয়ার মত নিঃশ্বাস ছাড়ছে ক্রু টীফ, পারকার ফারমোডা হুডের নিচে পুতনি এরইমধ্যে অসহ্য ঠাণ্ডায় জমে আসতে শুরু করেছে তার। দক্ষিণে একটু একটু করে আলো ফুটছে।

চারদিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট সতর্কতার সাথে, কোন অ্যামবুশের মধ্যে পড়েছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে। ভয় ভয় লাগছে। আসছে না কেন ওরা? একশো মিটার দূরে ঘুরটা দেখতে পেল সে-ট্র্যাপারস' হাট। শব্দপোক্ত মজবুত কাঠের ঘর। কিন্তু পল মিডল্যান্ড কোথায়? লোকটার দেখা নেই কেন? ভাবতে না

ভাবতেই হাটের দিক থেকে নিচু শিসের শব্দ ভেসে এল। গ্লাভস দিয়ে আড়াল করে তিনবার টর্চলাইট জ্বালল লেফটেন্যান্ট, জবাবে একজোড়া মানুষের কাঠামো আলাদা হলো হাটের পা থেকে, ফির সাহায্যে গ্লাইড করে এগিয়ে আসতে লাগল ওরা। তাদের একজন হ্যান্ডসাম মাইন সার্ভিসর, পল মিডল্যান্ড, অন্যজন ফোরম্যান হাকন সমারভিক। সঙ্গীর চেয়ে কম করেও চার ইঞ্চি দীর্ঘ ফোরম্যান, পাশেও তেমনি। গালে কুঠার আকৃতির চাপদাড়ি।

আধঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল কাজ। 'পুলক' নামের এক ধরনের সমতল স্লেজে করে সঙ্গে করে আনা মালপত্র ট্র্যাপারস' হাটে পৌঁছে দিল স্কিয়েগাররা। ভেতরে তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করে বড়সড় একটা গর্ত খুঁড়ে রেখেছে পল ও হাকন, সব তার মধ্যে রেখে বরফ দিয়ে আবার ঢেকে ফেলা হলো সেটা।

বন্ধ দরজার বাইরে প্রায় কোমর সমান উঁচু হয়ে ছিল তুষার, দরজা ঠেলে দিয়ে বেলচার সাহায্যে আবার সেইরকম করে সাজানো হলো। দূর থেকে দেখে যখন মনে হলো নিখুঁত হয়েছে কাজটা, তখন ক্ষান্ত দিল সবাই। পায়ের ছাপ মুছতে মুছতে কন্টারের কাছে চলে এল সবাই। মিনিট দুয়েক কথা হলো মেজর ও লেফটেন্যান্টের মধ্যে। বিদেয় নেয়ার আগে সিনিয়রকে স্যালুট করল জুনিয়র। 'বেস্ট অণ্ড লাক, স্যার।'

একটু পর উঠে পড়ল সী কিং, দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। চারদিকে নজর বুলিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেজর পল মিডল্যান্ড। অসলোর নির্দেশে এখানে এসেছিল তারা, জিনিসপত্র বুঝে নিতে। এসব কেন পাঠানো হয়েছে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু জানায়নি অসলো, জানাবার মত সুযোগও নেই। তবে বুঝতে কষ্ট হয় না-এর কারণ একটাই, রুশ রাডার স্ক্রিংস করতে কমান্ডো বাহিনী আসছে।

ওগুলো রিসিভ করার নির্দেশ পেয়ে গতকাল একটা হালকা প্লেন নিয়ে ড্যান মিয়েনফিওর্ডেরই এক মাইনিং সেটলমেন্ট সন্নিহিত স্থানে এসেছে সে ও হাকন, সার্ভে করতে যাচ্ছে বলে। সেখান থেকে স্কিডু চড়ে এখানে এসেছে সম্ভাব্য 'নতুন মাইনের' খোঁজে।

'চলো,' সঙ্গীর উদ্দেশ্যে বলল পল। 'দুনিয়ার ফিরে যাই।' স্কিডুতে চড়ে রওনা হলো দুজনে। মিডল্যান্ড ড্রাইভ করছে। ডিশন নিয়ে হলো সমস্যা। ফিওর্ডের উপকূল ধরে যতক্ষণ চলছিল, ভালই দেখা যাচ্ছিল, তারপরই সমস্যায় পড়ল সে। রেইনডালেন নামে এক উপত্যকায় এসে পড়ল ডু। ওটা পেরোতেই তেরোশো ফুট উঁচু এক পাস। সূর্যের অদৃশ্য আলোর সামনের কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। কোথায় খাড়া ঢাল, কোথায় কি, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ভিজিবিলিটি পর্যাশ গজ থেকে কম করে পনেরোয় নেমে এসেছে দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠল মিডল্যান্ড।

ডু খামাল, প্যাকেট সোকে আন্টিমিটার বের করে দেখল। সী লেভেলের একত্রিশ মিটার ওপরে আছে তারা।

'কেমন বৃদ্ধছেন?' প্রশ্ন করল হাকন।

'বুঝেই নেই। এই অবস্থায় আর এগোনো ঠিক হবে না। নামো, তার আর শাবল বের করো।'

তাঁবুর দড়ি টান করে বাঁধার সময় হঠাৎ করে হাত থেমে গেল সার্জেন্ট হাকুনের। বিপদ! কিছু দেখিনি, আন্দাজ করেছে কেবল। 'শুনছেন!' ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল। 'কে যেন...!'

শক্ত হয়ে গেল মিডল্যান্ড, পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল। খুব কাছেই ভোঁশ ভোঁশ করে নিঃশ্বাস ফেলছে কেউ, অথচ কিছু দেখা যাচ্ছে না। এগিয়ে আসছে শব্দটা।

'ভুক!' হাকুন বলল নিচু কণ্ঠে। এবারও স্বেচ্ছা আন্দাজে বলল সে।

হোঁচট খেতে খেতে ডুর কাছে পৌঁছল মিডল্যান্ড, রাইফেল দুটো এক কটকায় তুলে নিয়ে একটা সঙ্গীর হাতে দিল। ব্যস্ত হাতে ব্রীচে কার্ট্রিজ ভরে প্রস্তুত হয়ে নিল দু'জনে। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে।

'বা দিকে!'

বট করে ঘুরল মিডল্যান্ড। কুয়াশার মধ্যে থেকে কালো নাকওয়ালার একটা গোল, প্রকাণ্ড মাথা বের হতে দেখল প্রথমে, ডানে-বাঁয়ে দুলাচ্ছে। পিছনে বিশাল দেহ। কয়েক পা এসে থেমে পড়ল ওটা, নাক উঁচু করে বাতাস ঝুঁকতে লাগল।

'গুলি কোরো না,' মিডল্যান্ড বলল। 'আক্রমণ না-ও করতে পারে।' কাছে রাইফেলের বাঁট ঠেকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে বিস্ফারিত চোখে। প্রকাণ্ড এক দানব ওটা। ওজন কম করেও আধটন হবে, অনুমান করল সে। খেপে গেলে মুহূর্তে ওদেরকে খতম করে দিতে পারে জম্বটা, চুরমার করে দিতে পারে কিডু। ধারেকাছে যদি ওটার সঙ্গী থাকে, তাহলে তো সাড়ে-সর্বনাশ।

ওটার কৃতকৃততে দুই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে আর হাকুন। তাদেরকেই দেখছে ওটা, নাক ঘন ঘন কুঞ্চিত হচ্ছে। আশা জাগল হয়তো চলেই যাবে, কিছু বলবে না। কিন্তু ভুল, হঠাৎ করে গরুর ডাক ছেড়ে বুলডোজারের মত ছুটে এল মাথা নিচু করে। কাঁধ লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল মিডল্যান্ড, মুহূর্তের জন্যে গতি ব্যাহত হলো ওটার, ভয়াবহ এক হুঙ্কার ছেড়ে আবার লাফ দিল। ভয়ে হাত-পা পেটের ভেতর সঁধিয়ে যেতে চাইল মিডল্যান্ডের, অনেক কষ্টে নিজেকে খাড়া রেখে আবার গুলি করল। একইসঙ্গে গুলি করল হাকুনও।

ফের বাধা পেল বুলডোজার, এবার এক হাঁটুতে তর করে বসে গুলি করল মিডল্যান্ড, হাকুন করল দুটো। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল জম্বটা, কাত হয়ে পড়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল মিডল্যান্ড। বুঝল মরে গেছে ওটা। হাকুনের শেষ গুলিটা লেগেছে ওটার মেরুদণ্ডে, ঘাড়ের একটু নিচে। সেটাই শুরু করে দিয়েছে দানবটাকে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক।

অনেক কষ্টে ওটার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তিন ঘণ্টা পর অ্যাডভেন্টডালেনের দিকে যাত্রা করল তারা। ততক্ষণে ভিজিবিলাটি বেড়িয়ে আবার, মোটামুটি চল্লিশ মিটার পর্যন্ত দেখা যায়। জায়গামত পৌঁছতে তা আরও বাড়ল। অ্যাডভেন্টডালেনের গেজি থেকে যে রাষ্ট্র লংহায়ারবিয়নের দিকে চলে গেছে, সেখানে পৌঁছে বিনকিউয়ারে চোখ রেখে সামনে তাকাল মিডল্যান্ড। হাসল মৃদু। 'বেশ, বেশ। দুসে রুশ ভলুক দেখতে পাচ্ছি ওখানে। দেখা যাক, নরওয়েজিয়ান ভলুকের ব্যাপারে ওদের কি মত।'

লোক দুটোর কাছে এশে কিডু থেকে নামল সে। মুকাভিনয়ের সাহায্যে তাদের বোঝাল, সার্ভের কাজে সন্ধ্যা গিয়েছিল তারা দু'জন, আসার পথে এই ব্যাটা আক্রমণ করেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের কাগজ পত্র চেক করে সম্বুট হলো গার্ড দু'জন, ছেড়ে দিল।

কিন্তু ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষকে জানাতে ভুলল না তারা। সেখান থেকে খবর চলে গেল এয়ারফিল্ডের রুশ কন্ট্রোল রুমে। খবরটাকে সহজভাবে নিল না কবীর চৌধুরী।

একদিন পর। লংহায়ারবিয়নে।

নিজের কন্ট্রোল টাওয়ার অফিসে মস্কো থেকে আসা এয়ার ডিফেন্স কমান্ডের রাডার বিশেষজ্ঞ ইগর ইভানোভিচের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত কর্নেল ম্যাকারভ। তার সামনে হাতে আঁকা একগাদা স্কেচ, একটা একটা করে সেগুলোয় চোখ বোলাচ্ছে। একটা-দুটো কথা বিনিময় হচ্ছে দু'জনের মধ্যে।

'ঘর তৈরির কাজ প্রায় শেষ,' হঠাৎ মুখ তুলল কর্নেল। 'কাজটা হয়ে গেলেই শুরু করে দিতে হবে, কমরেড ইগর।'

শ্রাণ করল বিশেষজ্ঞ। খুবই ছোটখাট মানুষ, মাঝবয়সী। চোখে পুরু চশমা। 'আমার কোনও আপত্তি নেই, কমরেড পলকভনিক,' বলল সে। 'কিন্তু এত বাতাসে ওগুলো ওপরে তোলা গেলেও আসল কাজ সারা যাবে কিনা সন্দেহ আছে আমার।'

'আমি জানি না মনে করেছেন? জানি। মস্কোকে সে কথা জানিয়েওছিলাম। কিন্তু আমাদের কমরেড কন্ট্রোলার বললেন, ওরা আর সময় দিতে রাজি নয়।'

আবার শ্রাণ করল বিশেষজ্ঞ। 'তাহলে কি আর করা। ওরা যদি...'

দরজায় সজোরে নকের আওয়াজ হতে থেমে গেল সে। 'কাম ইন,' দরজার দিকে তাকিয়ে বলল কর্নেল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ল তার সহকারী, ক্যাপ্টেন পাপুকিন। হাতে এক টুকরো কাগজ। চেহারা উত্তেজিত।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল ম্যাকারভ।

'কমরেড পলকভনিক, ভ্যান মিয়েনফিওর্ডে একটা পরিত্যক্ত ট্র্যাপারস' হাট খুঁজে পাওয়া গেছে! মিলিটারি অ্যাকাউন্টিং চিহ্ন পাওয়া গেছে সেখানে।'

সটান উঠে দাঁড়াল ম্যাকারভ, ব্যস্ত পায়ে দেয়ালে ঝোলানো বড় এক ম্যাপের সামনে এসে দাঁড়াল। 'জায়গাটার রেকর্ডের?'

কাগজের টুকরোটা তার হাতে তুলে দিল ক্যাপ্টেন, দাঁড়িয়ে থাকল অ্যাটেনশন হয়ে। বুক ঘনঘন ওঠানামা করছে।

'ইম!' কাগজে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল কর্নেল। 'চারজন লোক পাঠাও ওখানে। এখনই।'

ক্যাপ্টেনকে বিদেয় করে চেয়ারে এসে বসল সে। হেঁদ পড়া আলোচনা শুরু করতে চাইল, কিন্তু হলো না। মন আর চোখ, দুটোই ঘুরেকিরে ম্যাপের দিকে চলে যাচ্ছে বারবার। কারা গিয়েছিল ওখানে? ভাবছে সে। নাকি এসেছিল? কারা? কেন?

'নিশ্চই!' ভাবনাচিন্তা না করেই বলে বসল ফেডারিক ফলভিক, 'নিশ্চই করব! দেশের জন্যে মরতে একটুও ভয় পাব না আমি।'

'আরও ভেবে বলুন,' বলল পল মিডল্যান্ড। 'নরওয়েতে ক্রমাডেস্টাইন রেডিও মেসেজ পাঠাতে গিয়ে ধরা পড়ে যেতে পারেন আপনি, ওরা আপনাকে গুলি করে...'

সার্ভেয়ারের গরের কথাগুলো কানেই গেল না তার। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে। মেসেজ ট্রান্সমিট করতে গিয়ে ধরা পড়েছে সে, স্পাইডের অভিযোগে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে তার। মা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাদছে একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে, খ্রিস্ট দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছে, তুলোর মত নরম তুষার পড়ছে তাদের গায়ে-মাথায়। লোকটার অধৈর্য কণ্ঠের প্রশ্নে স্বপ্নভঙ্গ হলো তার।

'কি ভাবছেন?'

'কিছু না। আমি...' গলা খাঁকারি দিল সে। 'আমি রাজি।' একটু পর বলল, 'ওরা সবকিছু মিলিটারাইজ করে নিলে আমাদের চাকরি নিশ্চই থাকবে না?'

'সে তো পরের কথা,' মিডল্যান্ড বলল। 'কিন্তু আপনি ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। যদি আপনি এ কাজ করতে না চান, কেউ দোষ দেবে না।'

'ভেবেছি। আমি রাজি। কিন্তু রেডিওটা কোথায় রাখা যায় বলুন তো? আমার...'

'ওটা আপাতত অ্যানির কাছেই থাকবে।'

'জিনিসটা কি ভাবে কাজ করে জানা দরকার আমার,' ফলভিক বলল। 'ওর কিছু ঘটে যেতে পারে।'

'সময় হলে সে ব্যরস্থা করা হবে,' মিডল্যান্ড বলল। 'এখন না। আপনি এয়ারফিল্ডে যা যা ঘটে, বিশেষ করে রাডার ইন্সটলেশনের অগ্রগতির খবর অ্যানিকে জানাতে থাকুন। মেসেজ লিখে আগে থেকে ঠিক করা কোন জায়গায় রেখে আসতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়।'

মাথা নাড়ল ফলভিক। 'সেটা ঠিক হবে না। আমি তো এমনিতেই অ্যানির বাসায় যাওয়া-আসা করি, সবাই জানে। খবর কিছু থাকলে গিয়ে জানিয়ে আসব।'

পরদিন দুপুরে ডিউটিতে এল ফলভিক। কাগজপত্রে চোখ বুলিয়ে তার নরওয়েজিয়ান সহকারীর দিকে তাকাল। 'নতুন কোন খবর?'

'দুটো সোভিয়েত কন্টার উড়েছে,' বলল সে। 'কোথায় গেছে জানানো হয়নি আমাকে।'

ম্যাকারভের সহকারী ক্যাপ্টেন পাগুভিন কাছেই ছিল, কথাটা শুনে পেয়ে চুরে দাঁড়াল। 'আমাদের কন্টার কোথায় গেল না গেল, তা নিয়ে ভাবতে হবে না, আপনাদের কাজ কেবল কমার্শিয়াল ট্রাফিকের খবর রাখা।'

'সমস্ত ফ্লাইট সম্পর্কেই জানা থাকা দরকার আমাদের,' প্রতিবাদের পুরে বলল ফলভিক।

'বলেছি তো, আমাদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না,' ঘোষণা করল ক্যাপ্টেন। 'নিজেদের চরকার তেল দিন।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ট্রাফিক কন্ট্রোল অফিসার, কিন্তু সহকারীকে দ্রুত চোখ টিপতে দেখে থেমে গেল। বুঝতে পেরেছে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। দায়িত্ব গ্রহণের কাজ সেরে কফি বানাল সে, এক কাপ রুশ ক্যাপ্টেনকে দিতে ভুলল না। ভেবেছিল এতে হয়তো কতজ্ঞ হবে বাটা, মেজাজ ঠাণ্ডা হবে। কিন্তু হলো না। কফি খেয়ে ধন্যবাদ একটা জানাল বটে, তবে ফলভিকের মনে হলো ওর চেয়ে কুকুরের খ্যাকানিও অনেক মিষ্টি।

বিকেলের দিকে একটা এমআই-সিবি হেলিকপ্টার আচমকা মেঘ ফুড়ে নেমে এল। এয়ার ফিল্ডে ল্যান্ড করতে বিশজন সশস্ত্র পুলিশ বের হলো ওটা থেকে। প্রথমে ব্যাপারটা ধরতে পারল না ফলভিক। ম্যাকারভের সহকারী টাওয়ারের লম্বা জানালায় কাছে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকল। মুখে মৃদু হাসি।

কন্টার থেকে নেমে আসা এক পুলিশ অফিসারের ওপর চোখ পড়ল ট্রাফিক কন্ট্রোল অফিসারের। সাদা ক্যামোফ্লেজ সুট পরে আছে লোকটা, কাঁধে বুলছে সাব-মেশিনগান। মুখ তুলে হাসল লোকটা, হাত নাড়ল ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে। তারপর বুড়ো আঙুল তুলে 'ওকে' বোঝাল।

ব্যাপার টের পেতে বেশ সময় লাগল ফলভিকের। যখন পেল, রীতিমত চমকেই উঠল-সাদা ড্রেস পরে ছিল কেন ব্যাটার? ভাবল সে, ওটা তো সোভিয়েত বর্ডার পুলিশের ইউনিফর্ম নয়! তারা পরে ল্যাপেলে ট্যাগওয়াল লম্বা শ্রেটকোট, মাথায় দেয় পীকড হ্যাট। তাহলে এরা কারা? সাদা ক্যামোফ্লেজ ড্রেস...স্নো ফাইটিং কিট...

বিদ্যুৎ চমকের মত বুঝে ফেলল সে ব্যাপারটা। ওরা পাহাড়ে গিয়েছিল টহল দিতে। কেন? হঠাৎ পাহাড়ে টহল দিতে যাওয়া কেন? কিছু সন্দেহ করেছে? কি? অফিসারটা 'ওকে' দেখিয়েছিল ম্যাকারভের সহকারীকে, তার মানে কি কাজ হয়ে গেছে? কি কাজ?

বাকি সময়টুকু অনেক কষ্টে পার করল ফলভিক, অফিস থেকে বেরিয়ে প্রায় জোর করে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল। ঘন্টা খানেক কি করে যে কটিল, নিজেও জানে না। ডিনারের খানিক আগে অ্যানির অ্যাপার্টমেন্টে এল সে।

'এরা দু'জন স্পাই,' কবীর চৌধুরী বলল। 'সরাসরি সভিয়া থেকে আসেনি। সার্ভে করতে যাওয়ার কথাটা মিথ্যা। ওরা, আপনি, সবাই মিথ্যা বলছেন,' কনফারেন্স টেবিলে দুম করে কিল মেরে বসল।

টেবিলের ওপাশে স্থির হয়ে বসে আছেন গভর্নর প্রিভেনসন। বাইরের প্যাসেঞ্জে মিডল্যান্ড ও হকুন হাতকড়া পরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সুরজন রুশ পুলিশ রয়েছে তাদের পাহারায়। পাহাড়ের ওপর ট্র্যাপারস' হাট খুঁজে পাওয়ার পরপরই গ্রেফতার করা হয়েছে তাদেরকে।

'আমি আপনার এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন গভর্নর। 'এ বক্তব্য কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত।' একদৃষ্টে কবীর

চৌধুরীকে দেখছেন তিনি, মেজাজ সামলে রাখতে কষ্ট হলেও বুঝতে দিচ্ছেন না। অসলোর নির্দেশ আছে, যে কোন মূল্যে উভয়জনা পরিহার করতে হবে। 'ওরা দু'জন আমার দেশের নাগরিক, আমি এখানকার গভর্নর। আমি বলছি, ওরা নির্দোষ। আপনি কোন নির্দোষ নাগরিককে গ্রেফতার করতে পারেন না।'

চুপ করে থাকল কবীর চৌধুরী। বুঝে কেলেছে ধমক-ধামকে কাজ হবে না, তাতে বরং পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠবে। তাই পরামর্শ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'কাল আপনাদের মাইন শ্রমিক নিয়ে প্লেন আসছে, ওটায় করে লোক দুটোকে পাঠিয়ে দিতে পারেন সোয়ালবারের বাইরে। অবশ্য স্পাইদের গুলি করে মেরে ফেলাই রীতি।'

'আমার দেশে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকেই নির্দোষ,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন গভর্নর। 'পল মিডল্যান্ড, আর হাকুনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। ওরা ভাল মানুষ, নিরীহ। আপনার মুখের কথায় আমি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারি না।' মিথো বলেননি প্রিবেনসেন, ওদের দু'জনের ডবল রোলের কথা ভালই জানেন তিনি।

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল কবীর চৌধুরী। ছোটখাট মানুষটা এতখানি মানসিক বল কোথেকে পেল ভেবে পাচ্ছে না। 'এটাকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আপনার ইচ্ছেকৃত উসকানি বলে ধরে নিচ্ছি আমি।'

শ্রাণ করলেন প্রিবেনসেন। 'আমার সরকারের ওপর আপনার যখন কোন আস্থা নেই, তখন যা ইচ্ছে ধরে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমি এই বৈঠক চালিয়ে যাওয়ার কোন যুক্তি দেখি না।'

মানুষটা ওঠার উদ্যোগ নিচ্ছে দেখে নরম হলো কবীর চৌধুরী। তাড়াতাড়ি বলল, 'আপনি তাহলে বলছেন ওদেরকে ছেড়ে দিতে?'

'অবশ্যই!'

অনেক চিন্তাভাবনা করে পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিল সে। ঠিক করল, এর শোধ অন্যভাবে নেবে, সময় হোক।

কিন্তু প্রথম পরাজয়ের স্বাদ বড় তিস্ত লাগল তার।

হাই সিয়েরা।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে উড়ে যাচ্ছে মেঘ, মাঝেমধ্যে তার ফাঁক দিয়ে অনেক দূরের অন্যসব পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়। নিচের দিকের ঢাল ছেয়ে আছে ফার গাছে, বরফে ওগুলোর দীর্ঘ ছায়া।

মার্চের শেষ আর এপ্রিলের শুরু সময়টা হচ্ছে হাই সিয়েরার স্কিইং সীজনের অফিশিয়াল সমাপ্তির সময়। এ সময়ে স্থানীয় রিফটগুলোর বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য মাসুদ রানার 'অফিসিয়াল রিজ' টিম এখানকার যে অংশে প্র্যাকটিস করছে, তার ধারেকাছে কোন রিফট নেই। ক্যান্সিফোর্নিয়া ও নেভাডার বর্ডারে জায়গাটা।

গত তিনদিন থেকে দৈনিক ষোলো কন্ট করে প্র্যাকটিস চলাচ্ছে। নয় হাজার ফুট উঁচু এক রিজ এবং তার নিচের মালভূমি মিলিয়ে বিশাল এক ক্রস-কান্ট্রি রুট

স্কি-এ চড়ে চষে বেড়াচ্ছে দলটা। অনুসন্ধিসু নজর এড়িয়ে চলা যাবে বলে জায়গাটা বেছে নিয়েছে রানা। এখন প্রকৃতির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে ওদের দলটা। অবশ্য লাইট অ্যামিউনিশন ব্যবহার করছে না ওরা।

এই রিজ আর মালভূমি লংইয়ারবিয়নের প্রাচীর বেরগেটের মত নয়, তবে একটা ব্যাপারে দুই জায়গার মিল আছে—দুটোতেই আছে বরফের খোলামেলা মাঠ এবং আড়ালের অভাব। তাছাড়া রুশদের প্রাচীর বেরগেট রাডার ইন্সটলেশনের মত একটা ঘর এখানেও দাঁড় করানো হয়েছে, একদম খোলামেলা জায়গায়। অলক্ষে এগোবার উপায় নেই।

রানা রয়েছে ঘরের ভেতরে, সোহানা ও পাঁচ কমান্ডো বাইরে। নতুন আক্রমণের পায়তারা করছে। স্কিফোর্ড, নেইলসন, ওয়েস্টন আর পলসেন নেই দলে। তাদেরকে রহস্যজনক কারণে মহড়ার বাইরে রাখা হয়েছে।

এক সময় শেষ হলো অ্যাসল্ট, কিন্তু বার্ষতার মধ্যে দিয়ে। প্রায় সবাই আর্গেভাগে ধরা পড়ে গেছে রানার চোখে।

'চুরি করতে এসে এতবার ধরা পড়লে অগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়, স্যার,' লেফটেন্যান্ট জনসন বলল। পাঁচ ফুট আটের মত দীর্ঘ সে, বয়স চব্বিশ। মুখটা গোল, শিশুসুলভ চেহারা। 'আর কোন উপায় খুঁজে বের করা গেলে ভাল হবে মনে হয়।'

মিথো নয় কথাটা, রানা ভাবল, এই সমস্যার সুরাহা করা যাচ্ছে না। প্রতিবারই ধরা পড়ে যাচ্ছে কমান্ডোরা।

'লিফটিংয়ের সময় কন্টার ব্যবহার করা গেলে ড্রপিংও হয়তো সম্ভব,' বলল যুবক।

'প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম,' রানা বলল। 'কিন্তু পরে বাতিল করে দিয়েছি আইডিয়াটা। ওদের পুরো নর্দার্ন ফ্লীট এখন অটলান্টিকে, ধরা পড়ে যাবে অ্যাপ্রোচ।'

'সরচেয়ে ভাল হয় যদি সময়মত ওয়েদার খারাপ থাকে ওখানকার,' সোহানা বলল। পারকা আর ওভারহোল্টাইট আর্কটিক ক্লোডিঙে দ্বিগুণ মোটা দেখাচ্ছে ওকে। তার ওপর রয়েছে কটন ক্যামোফ্লেজ সুট। দলের সবাই তাই পরে আছে।

'ঠিক,' রানা মাথা নাড়ল। 'কিন্তু তা না-ও হতে পারে, তাই অন্য এক আইডিয়া নাড়াচাড়া করছি আমি।'

'কি?' হাওয়ার্ড স্মিথ প্রশ্ন করল।

'মিসাইল।'

বিশ্বয় ফুটল সবার চেহায়ায়। 'মিসাইল?' বলল সোহানা।

'হ্যাঁ। যেমন আশঙ্কা করা হচ্ছে; ওখানকার রাডার ইন্সটলেশন যদি তত বড় হয়, তাহলে ডেমোলিশন চার্জ বসাতে হবে তোমাকে। এবং সে জন্য আগে প্রয়োজন হবে "ভেতরে পৌঁছানো," ক্লিয়ার? গত তিনদিনের প্র্যাকটিসে যা বোঝা গেল, তাতে মনে হচ্ছে সেটা হওয়ার নয়। প্রথম মারটা মিসাইল দিয়ে হলেই ভাল হবে। তারপর...'

'ওভ আইডিয়া, স্যার!' প্রায় লাফিয়ে উঠল কপোরাল ব্রেভিনস্কি। লোকটা

পোলিশ, ডেমোলিশন এক্সপার্ট। 'কি মিসাইলের কথা ভেবেছেন?'
'সবে ভাবতে শুরু করেছি,' বলল ও। 'এখনও ঠিক করিনি।'

'টিওডরিউট হলে কেমন হয়, বস?' ক্যাপ্টেন শ্মিথ বলল। 'ওয়ার গাইডেড
অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল, রেঞ্জ তিন হাজার মিটার। এর আরেকটা প্রাস-পয়েন্ট হচ্ছে
গাইডেড সিস্টেম, ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে মিসাইলকে, মিস হওয়ার কোন চান্স
নেই।'

ওদের মিশনের জন্যে খুবই উপযুক্ত টিওডরিউট, রানা জানে। নেয়া গেলে
ডাল হত, কিন্তু ওজনের কারণে তা সম্ভব নয়। লঞ্চারের পাট বাই পাট খুলে
একেকজন একেকটা বয়ে নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু তারপরও মিসাইল রাউন্ডের
সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। ওগুলো ছাড়া এমনিতেও সদস্যদের প্রত্যেককে কম
করেও সস্তর-আশি পাউন্ড ওজনের জিনিসপত্র বহন করতে হবে। ব্যক্তিগত অস্ত্র,
চারদিনের রেশন, একটা করে টেন্ট শীট, স্টোভের জন্যে জ্বালানি তেলের বোতল,
মোমবাতি, ব্যাটারি, পনেরো মিটার দীর্ঘ লাইন, আশি রাউন্ড করে গুলি, স্নো শূ,
ওয়াশিং কিট, বাড়তি মোজা, বাড়তি স্পেশাল মেশ আভারওয়ার। এর কোনটাই
বাদ দেয়া যাবে না। আবার এতকিছুর ওপর বাড়তি ওজন নেয়াও সমস্যা।

রানার চেহারা দেখে ক্যাপ্টেন বুঝল প্রথমটা চলবে না। 'ড্রাগন কেমন হয়?'
নতুন প্রশ্নাব দিল।

'মাত্র এক হাজার মিটার রেঞ্জ, স্যার!' ব্রেভিনস্কি আপত্তি জানাল।

'তবু রাইফেল রেঞ্জের বাইরে থেকে ছোড়া যাবে,' বলল সে। 'আর ওগুলোও
অনেক হালকা।'

মাথা দোলাল রানা। 'এ নিয়ে পরে কথা হবে। এখন থাক।'

দিনের শেষ অ্যাসস্ট মহড়াও স্বার্থতার মধ্যে দিয়ে শেষ হলো। সে সময়ই
প্রত্যেককে ক্রান্ত দেখেছে রানা, খুব ধীর ছিল ওরা। এখন আরও ক্রান্ত লাগছে।
স্কি স্টিকের ওপর ভর দিয়ে বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, উপায়
থাকলে বোধহয় উয়েই পড়ত। মনে মনে মিসাইল ব্যবহারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে
ফেলল রানা। এভাবে হবে না বুঝে ফেলেছে। শুধু শুধু কষ্ট দেয়া হচ্ছে
মানুষগুলোকে, কাজের কাজ হচ্ছে না কিছু। খোলামেলা জায়গায় আছে রশ
রাডার, রানা যেমন এখানে নকল রাডারের পাহারায় ছিল, তেমনি ওখানেও
অবশ্যই গার্ড থাকবে। আরও বেশি সতর্ক থাকবে তারা। কাজেই এই পণ্ড্রমের
কোন মানে হয় না।

'এভাবে হবে না,' ঘোষণা করল ও। 'কাল থেকে মিসাইল নিয়ে মহড়া
হবে।'

'কি মিসাইল, স্যার?' প্রশ্ন করল বাকহার্ড।

'আমাদের জন্যে ড্রাগনই উপযুক্ত হবে।'

শ্মিথ মাথা দোলাল। 'আমারও তাই মনে হয়।'

সবার ওপর চোখ বোলাল রানা। দল ছোট হতে পারে, কিন্তু যে ক'জন
আছে, তারা দুনিয়ার নেত্রী কমান্ডোদের পর্যায়ে পড়ে। কোন কমান্ডেনশনাল
ইনফ্যান্ট্রি অথবা মেরিন অফিসার তাঁদের ক্রমক্রমে খুবই ছোট হয়ে গেছে দলটা,

কেননা ওসব দলে মানুষ থাকে কম করেও চলি।

কিন্তু সে জন্যে সমস্যাও হয় বেশি। শব্দ হয় বেশি, ট্রেইল চাপা দেয়া কঠিন
হয়ে পড়ে, আবর্জনা সৃষ্টি হয়, সদস্য সবাই আছে কিনা বার বার চেক করতে হয়,
মোট কথা সমস্যার অন্ত থাকে না। কিন্তু এই ক'জন নিয়ে গেলে তেমন কিছু
হওয়ার জো নেই। এসব ভেবেই দল ছোট রেখেছে রানা। যদি একবার
জায়গামত পৌঁছানো যায়, তাহলে সাফল্য নিশ্চয়ই আসবে। সীমিত নির্দেশ এবং
সম্পূর্ণ গোপনীয়তার মধ্যে সর্বোচ্চ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারবে এরা।

তারওপর এদের প্রত্যেকে দুটো করে স্কিলের অধিকারী। যেমন
জনসন-একদিকে রেডিও অপারেটর, অন্যদিকে মেডিক।

দলের সবার পরনে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড আর্কটিক পোশাক। তার ওপর আছে
কটন ক্যামোফ্লেজ সুট। 'ওভারহোয়াইট' বলা হয় একে, কিন্তু তিনদিনের মহড়ায়
ওগুলো এখন আর দর্শনযোগ্য নেই। নোংরা হয়ে গেছে, কারও কারও ড্রেস
ছিঁড়েও গেছে। লুকিয়ে রাখা ব্যাকপ্যাক আর ইকুইপমেন্ট বেরিয়ে পড়েছে।

ওয়েবিং ওয়ার বেস্তের গায়ে সাদা টেপের মাস্ক রয়েছে জায়গায় জায়গায়।
তবে কিছু কিছু জিনিসের রং গাঢ়, যেমন এন-ট্রেসিং টুলস্। প্রত্যেকের কিটের
সাথে রয়েছে থার্মোস ক্লাস্ক, পানি বহনের জন্যে। সাধারণ অ্যাপ্লুমিনিয়ামের পাশে
পানি নিলে তা ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যাবে বলে এই ব্যবস্থা। ওয়েব গিয়ারের সাথে
টেপ দিয়ে জোড়া আছে ক্লাস্ক।

হেলমেট নেই কারও মাথায়। এ মিশনে তার দরকারও হবে না, কারণ
বরফের রাজ্যে উড়ন্ত শ্রাপনলের ভয় খুব কম থাকে। তার বদলে পারকার
লাইনড হুডের নিচে উলের নিটেড ক্যাপ পরে আছে সবাই। গলায় উলের
ব্যান্ডানা। এদের অস্ত্র স্ট্যান্ডার্ড নয়, যেমন ব্রেভিনস্কি ব্যবহার করছে
টেলিস্কোপিক সাইটওয়লা উন্নত সংস্করণের এম-সিঙ্কটিন রাইফেল। যে যার
পছন্দমত রাইফেল বেছে নিয়েছে। কাজের সময় যাতে সবাই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে,
সেজন্যে এ বিষয়ে বাধ্যতামূলক কিছু করেনি মাসুদ রানা।

হাওয়ার্ড শ্মিথ আর প্রেসিডেন্ট কেনেডির মধ্যে চেহারার কোন অমিল খুঁজে
পায়নি ও। কেনেডির ডুপ্লিকেট সে, বয়স ত্রিশ। ইস্ট কোস্টের এ্যাজুয়েট। ভাল
ফুটবল খেলে। প্রতিদিন দু'বার করে শেভ করার অভ্যেস তাঁর। বয়সে সবার ছোট
বাকহার্ড। উইসকনসিনের এক কৃষকের ছেলে সে। রেডিওয়ান। হালকা-পাতলা।
একশ কি বাইশ হবে বয়স।

ব্রেভিনস্কি খুবই হ্যান্ডসাম, লেডিকিলার মার্কা চেহারা। কুচকুচে কালো চুল
তার। বয়স ত্রিশ। মিলার গোবেচারী টাইপের। নিরীহ। উচ্চতা মাঝারি,
গাট্টাগাট্টা।

'আগামী কয়েকদিন আমি আমাদের সাথে থাকছি না,' বলল রানা। 'আমার
অনুপস্থিতিতে ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড শ্মিথ কিন্তু গ্র্যান্ডটিন পরিচালনা করবে।'

বিশ্ময় ফুটল সবার চেহারায়। 'আপনি থাকছেন না?' বলল শ্মিথ। 'কোথায়
যাবেন জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'পারো,' তৎক্ষণাৎ বলল রানা। 'তবে জবাব পাবে না।'

হো-হো করে হেসে উঠল বাকহার্ড, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মুখে ছিপি জাঁটল রানাকে ভুরু কোঁচকাতে দেখে। 'সরি।'

নরওয়ে যাচ্ছে রানা-ক্রিফোর্ড, নেঙ্গসন, ওয়েস্টন আর পলসেনকে নিয়ে। তাদের কাজ ওখান থেকে শুরু হবে, তা বুঝিয়ে দিয়ে আসতে যাবে। কিন্তু গোপনীয়তার স্বার্থে সে ব্যাপারে মুখ খুলতে চায় না। যাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে ও, তারা নিজেরাও জানে না সে কিছু।

'বাকহার্ড,' বলল রানা। 'কল দ্য 'কন্সটার!'

দল ভেঙে যেতে ওর সামনে এসে দাঁড়াল সোহানা। 'তুমি একাই যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ,' মাথা বাকাল ও।

'তুমি চাইলে আমিও...'

'দুঃখিত, সোহানা,' দৃঢ়কণ্ঠে বাধা দিল রানা। 'একদিনও কিন্তু প্র্যাকটিস মিস করা চলবে না।'

আট

'নর্থ আটলান্টিক কাউন্সিল আজ ব্রাসেলসে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হয়েছে। মন্ত্রীরা সংস্থার ওপর নিজ নিজ দেশের আস্থা পুনর্ব্যক্ত করে আশা প্রকাশ করেছেন যে জাতিসংঘের একানু নম্বর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বশান্তি ও... বিবৃতি থেকে চোখ তুলে হাসল এরিক ব্রাউন।

শেষ প্যারায় নজর দিল। 'সোয়ালবারে রুশ নগ্ন হস্তক্ষেপের ফলে সে অঞ্চলে যে মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি হয়েছে, তা মোকাবিলায় জনো উত্তর আটলান্টিকে মোভায়েন ন্যাটোর নৌ-বহর সদাসতর্ক থাকবে...'

আবার চোখ তুলল সে। এ মুহূর্তে ন্যাটো সদর দফতরের প্রেস সেন্টার কনফার্সে দাঁড়িয়ে আছে সে, হাতে ন্যাটোর সর্বশেষ যুক্ত বিবৃতি। বা দিকের শেষ প্রান্তে একটা ক্যান্টিন আছে, বাকিটা ওখানে বসে পড়বে বলে পা বাড়িয়েছিল, এমন সময় মুখোমুখি হয়ে গেল সান্দ্রার সহকর্মী জুলিয়ার সাথে।

'হ্যালো!' উজ্জ্বল হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলল মেয়েটা। 'আবার তাহলে দেখা হলো আমাদের!' সরাসরি এরিকের চোখে চোখ রেখে বলল, মুখে উসকানির হাসি।

'হাই!' পাল্টা হাসল যুবক। আগে একবারই এর সাথে দেখা হয়েছে তার, সান্দ্রা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটাকে খুব দনী লোকের বখে যাওয়া মেয়ে মনে হয় তার। মাঝারি উচ্চতা, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা, ঘন সোনালী চুল। টাইট মিনিস্ক্রাট পরে আছে এ মুহূর্তে, পায়ে নীল সিল্কের ব্রাউজ, ব্রা নেই।

'এখানে?' ভুরু নাচাল জুলিয়া।

'এক ম্যাপাভিনে আছি আমি,' হাতের বিবৃতি সোলাল এরিক। 'সংগ্রহ করতে এসেছিলাম।'

'সে তো জানিই,' মাথা দোলাল মেয়েটা। 'বলছিলাম, আজ তো সান্দ্রার বেরুতে অনেক রাত হবে,' আবার সেই উসকানির হাসি ফুটল তার মুখে। মনে মনে ভাবে, দারুণ এক মাল গেঁথেছে তো সান্দ্রা। 'তা ড্রিঙ্কের জন্যে ইনভাইট করবে, নাকি পথ দেখবে?'

ওর চাছাছোলা কথায় অপ্রস্তুত হলো যুবক। 'না, না, এসো। দ্যাট উইল বি আ প্রেজার।', তাকে বিস্মিত করে দিয়ে এক হাত বাড়িয়ে দিল জুলিয়া, ওটা ধরল সে। পা বাড়াল ক্যান্টিনের দিকে। ভেতরে এক টেবিলে ওকে বসিয়ে দিয়ে বাজের দিকে চলল এরিক। পিছন থেকে তাকিয়ে থাকল জুলিয়া।

'আগের থেকে অনেক হ্যান্ডসাম লাগছে আজ ছোকরাকে,' নিজেকে বলল সে। 'সান্দ্রার ভাগটা ভাল। ভীষণ সেক্সি ব্যাটা।'

কিন্তু ওর মধ্যে এমন কি পেয়েছে ছেলেটা? ভাবতে লাগল। দেখে তো মনে হয় বয়সে ছোট না হলেও সান্দ্রার সমবয়সী হবে এরিক। ওকে মজিয়ে রাখার মত এমন কি আছে তার? যুবককে ওর জন্যে জিন আর টনিক নিয়ে ফিরে আসতে দেখে বুকের ভেতরে অন্যরকম কাপুনি অনুভব করল ও। আজ সান্দ্রার ছাড়া পেতে সত্যিই রাত হবে। ও একবার চাল নেয়ার চেষ্টা করে দেখবে নাকি? বেশ কিছুদিন হলো ব্যাক্রেন্ডের সাথে যোগাযোগ নেই, এমন সময়... তাছাড়া এরকম হ্যান্ডসাম... ফিরে এসে জুলিয়ার মুখোমুখি বসল এরিক ব্রাউন। 'ওহু,' জিনে চুমুক দিয়ে বলল সে। 'ঠিক এই জিনিসই মনে মনে আশা করছিলাম আমি। তারপর, কেমন চলছে কাজ? সোয়ালবার নিয়ে লেগে আছ নিশ্চই?'

'আর কি?' শ্রাগ করল এরিক।

সেদিন রাত দুটোর জুলিয়ার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হলো সে। ভীষণ ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়ে। আশা ছিল এই মেয়েটার কাছ থেকে কিছু তথ্য বের করার চেষ্টা করবে, কিন্তু হয়নি তা। এ সান্দ্রার মত নয়, গভীর পানির মাছ।

স্টার ফিওর্ড, নরওয়ে।

নর্দান লাইটের ছইল হাউসের পিছনের কেবিনে বসে আছে মাসুদ রানা। ওর সামনের ছোট্ট এক টেবিলে অনেকগুলো ছবি-প্রাচীর বেরগেটের রুশ আর্টি ওয়ানিং রাডারের।

ন্যাটোর নর্দান ইওরোপিয়ান হেড কোয়ার্টার্স থেকে একটু আগে পৌঁছেছে ওগুলো। নরওয়েজিয়ান মেজর ডিলন এবং মেজর ক্রিফোর্ড, ওয়েস্টন, নেইলসন ও পলসেন যাকে পাড়ে দেখছে ওগুলো।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল রাডারটা বিশেষ ধরনের ওয়েদারপ্রফ, ডিমের মত গোল শেডের নিচে থাকবে, কিন্তু এই ছবিগুলো বলছে অন্য কথা। একেবারে খোলামেলা জায়গায় একটা ভ্যান মাউন্টেড রাডার ওটা। চারদিন হলো ওটা স্থাপন করা হয়েছে, কাজ শুরু করে দিয়েছে। খোলা জায়গা থেকে মিসাইল মেরে ওটাকে উড়িয়ে দেয়া খুবই সহজ, যদি ধারেকাছে পৌঁছানো যায়।

ওটার সামান্য দূরে একটা হাট। নিশ্চয়ই পার্ড হাউস ওটা, রানা ভাবল, এবং অ্যামিউনিশন স্টোর। কেল আর ডিভাইডিং ক্লবের সাহায্যে ম্যাপের গায়ে

জায়গাটা পিন পয়েন্ট করল মাসুদ রানা। তারপর অন্যদিকে মন দিল। ইসফিওয়ে নরওয়েজিয়ান রেডিও স্টেশনের কাছে নতুন কিছুর নির্মাণ কাজ চলাছে। দ্বিতীয় রাডার স্টেশন। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে পরেরটা বিশাল কিছু হবে। একটা ধ্বংস করা গেলে কি অন্যটার নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেবে মস্কো?

শ্রাগ করল ও। জেফলিনের প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে জেনারেলদের মনস্তত্ত্ব আর রাজনীতিকদের বিচারের ওপর।

কিন্তু যেখানে আপাতত প্রয়োজন নেই, সেখানে যেতে রাজি নয় রানা। অহেতুক ঝুঁকি নেয়ার কোন যুক্তি নেই।

ডাক ডি আরেনবার্গ। ব্রাসেলস।

দামী ডিনারের মধ্যে সান্ড্রা কারমেনকে বিয়ের প্রস্তাব দিল এরিক ব্রাউন। মেয়েটার দু'হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিয়ে খুব সতর্কতার সাথে কাজটা সারল সে। 'সান্ড্রা, ডার্লিং, আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না। তুমি জানো আমি তোমাকে কত ভালবাসি। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

আনন্দে দিশেহারা অবস্থা হলো মেয়েটার, অতিসুখে পানি এসে গেল চোখে। 'ওহ, এরিক! অফকোর্স, আমিও তোমাকে খুব ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া নিজেকে কল্পনাই করতে পারি না আমি। তুমি...' কান্নায় আর অসহ্য আবেগে গলা বুজে গেল তার।

লে বাবা! এরিক ভাবল, এ যে দেখছি সত্যি সত্যি মরেছে। 'ডার্লিং, আর কিছুদিনের মধ্যে নতুন চাকরি হবে আমার। তখন তোমাকে বার্লিনে নিয়ে যাব, ওয়ানসীতে থাকব আমরা। ওয়ানসীর হাজারো পদের ফুল দেখলে পাগল হয়ে যাবে তুমি। বার্লিন কত সুন্দর শহর, না দেখলে তুমি বিশ্বাসই করবে না।'

'বার্লিন?' চোখ তুলল সান্ড্রা। 'কেন, মিউনিখ...?'

এই সেরেছে! থুককু। 'দুঃখিত, ডার্লিং! সারাক্ষণ মাথায় চিন্তা গিজগিজ করে, কি বলতে কী বলে ফেলেছি। আমি আসলে মিউনিখের কথাই বলতে চেয়েছিলাম, তুলে বার্লিন বলে ফেলেছি।'

'ও-ও!'

'আমি ঠিক করেছি এই ক্রিসমাসেই বিয়ে করব আমরা। তুমি কি বলো?' এরিক প্রশ্ন করল।

'কিন্তু তার আগে আমার মার সাথে দেখা করতে হবে তোমাকে, ডার্লিং,' আদুরে গলায় বলল সান্ড্রা। 'বপু দেখতে শুরু করে দিয়েছে, বিয়ের ড্রেস, ব্রাইডসমেইড, চার্চ, ফটোগ্রাফ...'

'কিন্তু...তোমার মা কিছু মনে করবে না তো?'

'না, না! কেন আপত্তি করবে?'

'যাক,' চেহারায় স্বস্তি ফুটিয়ে তুলল এরিক।

পরদিন সান্ড্রার আপার্টমেন্টে পকেট থেকে সেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এমনভাবে একটা টেলিগ্রাম মেসেজ বের করল সে। 'এই দেখো, এটা আজই পেলাম।'

'কি?'

'পড়ো না!'

এক হাতে বুকের কাছে শ্রীপিং গাউনটা ধরে বিছানায় উঠে বসল সান্ড্রা। মেসেজটা নিয়ে পড়তে লাগল: 'রিকোয়ার্ডার ফুল ইন্টারপ্রিটেশন ডি ব্যাকগ্রাউন্ড অফ সোয়ালবার কনফ্রন্টেশন। ইওর লাস্ট ইনঅ্যাডিকোয়েট ইন মেনি রেসপেক্টস, নোটাবলি ন্যাটো। ডিয়েট্রিচ।'

মুহূর্তে এরিকের মতলব বুকে ফেলল সান্ড্রা। চোখের সামনের সমস্ত স্বপ্ন বিবর্ণ হয়ে উঠতে লাগল তার।

'তুমিই বলো, এরকম সময় এসব কার ভাল লাগে?' ঘরের মধ্যে পায়েচারি করে বেড়াতে লাগল এরিক। পরনে শর্টস ছাড়া কিছু নেই। 'আমাকে সাহায্য করতেই হবে তোমার, ডার্লিং। আমার সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এখন এর ওপর।'

'এরিক, ডার্লিং, এ ব্যাপারে কিছু বলার উপায় নেই আমার,' করুণ স্বরে বলল সান্ড্রা। 'এমনকি স্ত্রীদেরও ভেতরের কথা স্বামীদের জানানোর নিয়ম নেই।'

'কি হবে বললে?' মধুর হাসি ফুটল এরিকের মুখে। 'আমি গোপন কথা ফাঁস করে দেব? পাগল হয়েছ? পড়োনি, ওরা লিখেছে 'ইন্টারপ্রিটেশন'? তার মানে ওরা কেবল অ্যানালিসিস চেয়েছে, তবে অবশ্যই ফ্যাক্টসের ওপর। অনুমানের ওপর নয়।' তার কপালে চুমু খেল যুবক। 'বিশ্বাস করো, এ নিয়ে কাউকে কিছু বলব না আমি। প্রমিজ।'

এরিককে 'না' বলতে সাহস হলো না সান্ড্রার, আবার ও যা জানতে চান, তা-ও বলতে মন চাইছে না। 'আচ্ছা,' একটু ভেবে নিয়ে বলল। 'দেখি কি করতে পারি। তবে সত্যি বলছি, আসুরা শুধু মিলিটারি প্ল্যান নিয়ে জীল করি, রাজনীতি নয়।'

'সে তো বটেই। কিন্তু সেসবও তো একটা পলিসির ওপর নির্ভর করে নির্ধারণ করা হয়।'

'হয়তো,' দীর্ঘশ্বাস মোচন করল সান্ড্রা। 'কিন্তু এখন ওসব থাক। আমি খুব ক্লান্ত। এসো।'

আলো নিভিয়ে বিছানায় উঠল এরিক। অল্প সময়ের মধ্যে জাগিয়ে তুলল তাকে, সান্ড্রাও সাগ্রহে সাড়া দিল। কিন্তু ওকে হতভম্ব করে দিয়ে একেবারে চরম মুহূর্তে ছিটকে বিছানা থেকে নেমে পড়ল যুবক। 'না!' চিৎকার করে উঠল সে। 'এ অসহ্য!'

আবছা আলোর এরিককে শার্ট-প্যান্ট তুলে নিতে দেখে বুক কেঁপে উঠল সান্ড্রার। 'কি হলো, ডার্লিং?' প্রায় কেঁদেই ফেলল সে।

'আমি চলে যাচ্ছি। যে আমাকে বিশ্বাস করে না...'

উঠে বসল সান্ড্রা, হাত বাড়িয়ে এরিকের হাত ধরতে গেল, ঝট করে সরে গেল সে। 'যেতে দাও আমাকে। আমার ওপর যার বিশ্বাস নেই, তাকে বিয়ে করে জীবন নষ্ট করতে চাই না আমি।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, এরিক!' প্রায় হাহাকার করে উঠল সান্ড্রা।

'সত্যি বলছি, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। যেয়ো না, প্রীজ! সত্যিই আমি...'
কান্নায় ভেঙে পড়ল। চোখের লবণ পানির ধারায় সমস্ত স্বপ্ন ধুয়েমুছে যেতে লাগল
তার।

'সাহায্য করবে কথা দিচ্ছ তাহলে?' এগিয়ে এল এরিক ব্রাউন।
কথা বলতে পারল না সান্দ্ভা, মাথা দোলাল কেবল।

চাপা ধক্ ধক্ আওয়াজ করছে নর্দার্ন লাইটের ডিজেল এঞ্জিন, ফ্যাকাসে জোছনার
আলোয় উত্তরে ছুটছে ওটা, সোয়ালবারের দিকে। সাতদিন ধরে একনাগাড়ে
চলছে, এবং প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত পল মিডল্যান্ডের মনে হচ্ছে, এ সত্যি নয়। হতে
পারে না। স্বপ্ন দেখছে সে, অনেক লম্বা স্বপ্ন।

একসময় না একসময় স্বপ্ন ভাঙবে, তখন... প্যাট ডিলনের উচ্চকণ্ঠের হাসি
কানে যেতে সচকিত হলো সে। ঘুরে তাকাল। হুইল হাউসে রয়েছে লোকটা,
আমেরিকান মেজর ক্রিফোর্ডের সাথে কি নিয়ে যেন রসিকতা করছে। ক্রিফোর্ডের
সুগঠিত দাঁত দেখতে পেল সে কেবল, নিঃশব্দে হাসছে। চোখাচোখি হতে পালের
উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল লোকটা। সে-ও পাশ্চাত্য হাত নাড়ল।

লংইয়ারবিয়নে ক্রশ পুলিশের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পরের দু'সপ্তাহ
ভীষণ দুশ্চিন্তায় কেটেছে তার। এরমধ্যে অ্যানির সাথে দেখা করার সাহস হয়নি।
কোথাও যেতে সাহস হয়নি, স্নেফ বাসা-অফিস, অফিস-বাসা করেছে। একদিন
ফলভিক জানিয়ে গেল তাকে যেতে হবে। কোথায়? বোডো। নর্থ নরওয়ে ডিফেন্স
কমান্ড ডেকেছে। দেশের বাড়ি যাওয়ার কথা বলে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে
একদিন পরই ট্রমসো আসে পল মিডল্যান্ড, নির্দেশ অনুযায়ী দেখা করে বিদেশী
এক মেজরের সাথে। তার নাম মাসুদ রানা।

ট্রমসোর এক হোটেলে লোকটার সাথে দেখা হয় তার। ধরা পড়ার আগে
লংইয়ারবিয়নে থেকে নিজের পাঠানো মেসেজের কপি সেই মেজরের হাতে
দেখেছে পল। দু'একটা সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলেই কাজের কথা তুলল
মেজর।

'আপনার দেশকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এক কঠিন সমস্যায় ফেলে দেয়া
হয়েছে, নিরুত্তাপ, প্রায় নির্বিকার কণ্ঠে কথাগুলো বলল সে। 'সোয়ালবারের ওপর
আপনার দেশের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। রাজনৈতিক উপায়ে সে
সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না হওয়ায় মার্কিন সরকার সামরিক উপায়ে
সোয়ালবারকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে সেখানে কমান্ডো মিশন পাঠাতে যাচ্ছে।
আপনি সে দলের সঙ্গে যোগ দিতে চান?'

শুনতে শুনতে দম আটকে আসছিল মিডল্যান্ডের। কোনমতে মাথা ঝাঁকাল।
'অবশ্যই চাই। যোগ দেয়ার সুযোগ পালে আমি কৃতজ্ঞ হব।'

বাস, এ প্রসঙ্গে তার কিছু জানতে চায়নি মেজর। তবে কবীর চৌধুরী
সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেছে। লোকটা সম্পর্কে সে যা যা জানে, তার সবই বের
করে নিয়েছে পেট থেকে। এখানে কোথায় লোকটার বাসা, কোথায় অফিস, সব
জেনে নিয়েছে। ট্রমসো নেভাল বেসে মেজরের অপেক্ষায় ছিল একটা সী কিং, তার

সাথে সেটায় চড়ে বোডো চলে আসে পল। সেখানে অপেক্ষায় ছিল নর্দার্ন লাইট।
মেজর ক্রিফোর্ডের নেতৃত্বে। পলকে তার হাতে সঁপে দিয়ে চলে গেছে মাসুদ
রানা। সেই থেকে সাতদিন হলো, একটানা চলার ওপর রয়েছে ঘাট ফুটী এই
কিশিং ট্রলার। এই ব্যাপারটাই বিশ্বাস হতে চাইছে না। মেনে নিতে পারছে যে
সত্যিই আবার সোয়ালবার ফিরে যাচ্ছে সে।

কেন না, আসলে কোন কাজ এভাবে হয় না। জীবন নাটক নয়। অথচ এখন
যা ঘটছে, সবকিছুকেই নাটক মনে হচ্ছে তার।

একটু পর হুইল হাউসে এসে বসল সে। গাঢ় সবুজ রাডার স্ক্রীনের দিকে
তাকিয়ে থাকল অপলক। ভেতরে একটা বাহু ঘুরছে, ওটার প্রতিটা চক্রর শেষ
হতে পর্দায় কিছু ফোঁটামত দেখা দিচ্ছে। ওর মধ্যে তিনটে নরওয়েজিয়ান পেট্রল
ক্র্যাফট। নর্দার্ন লাইটের দিকে শত্রুর এগোবার পথ সীল করে রেখেছে ওগুলো,
সমান তালে তাদের সাথে সাথে চলছে। খুব শীঘ্রি পর্দার কোনায় উদয় হবে নতুন
এক ফোঁটা।

ওটা হবে একটা মার্কিন ডেস্ট্রয়ার, সাউথ উইন্ড। ওটার অপেক্ষায় আছে
নর্দার্ন লাইটের কমান্ডো গ্রুপ।

হঠাৎ করে ফ্রেডারিক ফলভিকের কথা খেয়াল হলো তার। গোলগাল
মুখওয়লা ছোটখাট এক মানুষ। এলোমেলো চুল। কেমন আছে সে? স্পাইন্ডের
অভিযোগে তাকে অ্যারেস্ট করেনি তো রাশিয়ানরা? ফায়ারিং স্কোয়াডে...! অ্যানি?
ও কেমন আছে?

'সোয়ালবারের চারদিকে টোটাল সী ব্লকের ঘোষণা দিতে যাচ্ছে ন্যাটো,' নিচু কণ্ঠে
বলল সান্দ্ভা।

এক চামচ ব্রুকোলাই মুখে তুলতে যাচ্ছিল এরিক ব্রাউন, খবরটা শুনে
এমনভাবে চমকে উঠল যে হাত থেকে চামচ পড়েই যেত আরেকটু হলে। 'কি
বললে! সী ব্লকেড? সোয়ালবারের চারদিকে?'

'হ্যাঁ। তারপর এয়ার ব্লকেডও ঘোষণা করা হবে,' একই গলায় বলল
মেয়েটা।

যাওয়া মাথায় উঠল যুবকের। 'কিছু কেন?' সান্দ্ভাকে নয়, ভাব দেখে মনে
হলো প্রশ্নটা নিজেকেই করছে সে। কথাটার ওজন যাচাই করছে মনে মনে।

'তা জানি না।'
'হুম!' অন্যদিকে তাকিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সে। 'এতদিনে মনে
হচ্ছে ন্যাটো কাজও কিছু কিছু করে, শুধু বিবৃতিই প্রকাশ করে না।'

মন্তব্যটা পছন্দ হলো না সান্দ্ভার, চুপ করে চামচ নাড়াচাড়া করতে লাগল।
'কিছু কেন তা করবে? এর কোন কারণ তো থাকতে হবে।'

'জানি না,' এবার একটু দৃঢ় শোনাল মেয়েটার গলা। 'কিন্তু মেজরনোই হোক,
তুমি আমাকে কোট করবে না বলে কথা দিয়েছ, মনে রেখো।'

'শিওর!' মনে মনে বলল, না করে উপায় আছে? অস্ত্রত স্ট্যান্ডার্ড রেকর্ডের
জন্যে তো করতেই হবে। 'মনে আছে। প্রমিজ ইজ প্রমিজ। বলেছি যখন, এ

পালাও, রানা

ব্যাপারে একটা শব্দও ছাপা হবে না আমার ম্যাগাজিনে।

একটু বিরতি। 'ব্যাপারটা কি নিয়ে হতে পারে, কিছু অনুমান করতে পারো?' আবার বলল এরিক।

'নাহ! পারলে বলতাম।'

'কবে নাগাদ ব্লকেড ঘোষণা করা হবে?'

'এক সপ্তাহ মধ্যে।'

জুলিয়ার কথা ভাবল এরিক, ওর সাথে দেখা করে আরও ডিটেইলস কিছু বের করা যায় কি না চেষ্টা করে দেখবে নাকি একবার? না, সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা ব্যতিল করে দিল। বিপদ ঘটে যেতে পারে। ও আর যা-ই হোক, এরমত হাঁদা নয়।

মেয়েটার সাথে একবার রাত কাটিয়ে এমনিতেই অনেক বড় ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে এরিক, আর নয়। রাতটা প্রায় নিরুদ্দম কাটল তার, সকালে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল সান্ডার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। একটা কল বস্তু খুঁজে বের করে বিশেষ এক নম্বর ঘোরাতে লাগল।

এমন খবর জানাতে দেরি করলে রুশ প্রভুরা কাঁচা খেয়ে ফেলবে।

সোমবার দুপুরের দিকে বেয়ার আইল্যান্ড অতিক্রম করল নর্দার্ন লাইট। দূর থেকে ওটার ধীরে ধীরে সাগর থেকে জেগে ওঠা ও আকৃতি নেয়া দেখল পল মিডল্যান্ড। দ্বীপটা প্রায় গোল। একটা দীর্ঘ রেডিও মাস্ট ও কয়েকটা বিল্ডিং ছাড়া কিছু নেই। কমিউনিকেশনস এঞ্জিনিয়াররা ছাড়া কেউ থাকে না। কী লিসনিং পোস্ট ওটা, এ ছাড়া আর কোন গুরুত্ব নেই।

'এটাকে এখনও ফেলে রেখেছে কেন ব্যাটার?' ওয়েসটন বলল। মেজর সে। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি দীর্ঘ, যাড়ের মত স্বাস্থ্য। 'দখল করে নেয় না কেন?'

'এবার হয়তো নেবে,' খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকে মিল পল। লংইয়ারবিয়ন ছাড়ার পর দাড়ি কামায়নি, প্রথমে ক'দিন অস্বস্তি লাগলেও এখন সয়ে গেছে। উপকারও হয়েছে, গালে ঠাণ্ডা কম লাগে। 'এখানে কোন রাশিয়ান থাকে না বলে হয়তো আশ্রয় দেখায়নি। রাশিয়া দাবি করছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের প্রতিরক্ষা চুক্তিতে নাকি বেয়ার আইল্যান্ডও অন্তর্ভুক্ত।'

রেডিওর মাইক্রোফোনের দিকে হাত বাড়াল সে। 'ওদের সাথে কথা বলা যাক।'

নরওয়েজিয়ান ভাষায় কিছুক্ষণ কথা বলল সে বেয়ার আইল্যান্ডের সাথে। তারপর মাইক্রোফোন রেখে ওয়েসটনের দিকে ঘুরল। একই মুহূর্তে মেজর জেইগ ক্রিসফোর্ডও ঢুকল হুইল হাউসে।

'রেডিওতে কথা বলতে ওনে এলাম,' বলল সে। 'কি বলে ওয়া?' ইঙ্গিতে পিছিয়ে পড়তে থাকা দ্বীপটা দেখাল। বাতাস হয় ফুট দীর্ঘ লোকটা, হ্যাংলা। আদমের আপেল বেরিয়ে আছে, কণ্ঠের ভালে ভালে নাচে। ঘন, জোড়া ভুক।

'বলছে, উত্তরে সোভিয়েত নেভাল অ্যাকাডিমি খুব বেশি। সমস্ত মার্চেন্ট লাইনারকে এই এলাকা থেকে সরে থাকতে পরামর্শ দিচ্ছে ওরা।'

'ওয়েদার?'

'উইন্ড ফোর্স থ্রী, সী স্টেট টু। ভিজিবিলিটি গুড।'

মাথা ঝাঁকাল মেজর। সীটে বসে মেজর ওয়েসটনের সাথে সোয়ালবারে ল্যান্ডিং নিয়ে আলোচনা শুরু করল। সাধারণ, বাণিজ্যিক কাজে নির্মিত এক ইনফ্রাট্রেন্ডেবল রাবার বোটে চড়ে তীরে যাবে রেইডিং পাটি। অবশ্য সে জন্যে মেঘলা আবহাওয়া বা কুয়াশার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। মিলার ও পলসেন তীরে যাবে, ওয়েসটন বোটেই থাকবে।

'কোন সমস্যা হবে না,' ওয়েসটন মন্তব্য করল। 'ভিজিবিলিটি যদি এরকম থাকে, আর ধারেকাছে রাসকি পেট্রল না থাকে, তাহলে খুব সহজেই কাজ সেরে ফেলাতে পারবে ওরা।'

'কপ্টার!' হঠাৎ পল বলে উঠল। 'পুবদিকে!'

ঝট করে ঘুরে তাকাল দুই মেজর। সত্যিই তাই। খুব নিচু দিয়ে উড়ে আসছে ওটা, বেশ দূরে আছে এখনও।

'নিচে যাও, জেইগ,' ওয়েসটন বলল। 'কুইক!'

'শিওর!' উল্টোদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। কপ্টার কাছে এসে পড়তে হুইল হাউস থেকে বেরিয়ে এল ওয়েসটন। একদম নির্বিকার সে। নরওয়েজিয়ান ফিশিং তুর নীল জ্যাকেট আর ট্রাউজার পরে আছে, কাজেই চিন্তার কিছু নেই।

কাছে আসতে ফড়িংটার গতি বোঝা গেল। রীতিমত বাড়ের গতিতে আসছে। এতক্ষণ দূর থেকে সোজাসুজি আসছিল বলে বোঝা যায়নি। হুড়মুড় করে ট্রলারের মাথার ওপর এসে পড়ল ওটা, সোভিয়েত নেভাল এভিয়েশনের কামভ। কিছুক্ষণ ওপরে ঝুলে থাকল, ওটার ডার্টনওয়াশের তোড়ে চার্ট ক্রমের ম্যাপ-কাগজপত্র ফড়ফড় শব্দে উড়ে বেড়াতে লাগল। কিছু বেরিয়ে এল খোলা দরজা দিয়ে। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল ওয়েসটন, দু'হাত তুলে সরে যেতে বলল ওটাকে দাঁতমুখ বিচিয়ে।

সরল বটে কামভ, তবে যাওয়ার আগে ওয়েসটনকে নিজ দাঁতের গড়নও দেখাল পাইলট। ঘুরে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে চলে গেল দ্রুতগতিতে।

'সাহস কত!' গজ গজ করে উঠল মেজর। হুইল হাউসে ঢুকে পলকে বলল, 'তৈরি হয়ে নেয়া দরকার, মনে হয় ভিজিটর আসছে। কপ্টারটা খুব সম্ভব কোন ক্রুজার থেকে এসেছে। মস্কতা হতে পারে, কপ্টার ক্রুজার।'

এক ঘণ্টা পর রাডারে দ্রুত ধাবমান ত্রিপ ধরা পড়তে সতর্ক হয়ে উঠল সুবাই-আসছে! বিনকিউলারে ওটাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করল ওয়েসটন। একটা ডেস্কটয়ার। 'ক্রেসটা ক্লাস,' বলল সে। 'কম করেও বিশ নট গতিতে আসছে।'

'আমাদেরকে প্রয়োজন হলে হুইসল বাজিয়ে,' বলল মেজর ক্রিসফোর্ড। 'তৈরি থাকব আমরা।'

'দরকার হবে না,' আশ্বাস সাথে বলল ওয়েসটন।

এসে পড়ল ওটা। ওয়েসটন 'প্রো অ্যাহেড' দিয়ে প্রস্তুত হলো হুইল হাউস থেকে বের হওয়ার জন্যে, ডেস্কটয়ার তখন পঞ্চাশ গজ দূরে। দোল খেতে খেতে

এনিয়ে আসছে। বিজে এক অফিসারকে দেখতে পেল সে, তার পাশে দাঁড়িয়ে বংচঙে একটা ফ্যাগ নাড়ছে এক সীম্যান। ফ্যাগটা কিসের, বুকে ওঠারও সময় পেল না ওয়েসটন, তার আগেই আকাশ ঢেকে ফেলল রুশ ডেস্ট্রয়ার, পাশ দিয়ে দড়াম করে মেরে বসল নর্দার্ন লাইটকে।

কাঠ ভাঙাচোরার ভয়াবহ মড়মড় আওয়াজ উঠল, কাত হয়ে প্রায় শুয়ে পড়ার জোগাড় হলো খুদে ট্রলারের। অবশ্য সামলেও নিল, সোজা হয়ে ডেস্ট্রয়ারের গায়ে খসড় খসড় শব্দে ঘষা খেতে লাগল।

বিজ থেকে মেগাফোন হাতে অন্য এক অফিসার বেরিয়ে এল। দ্রোটকোট গায়ে তার, মাথায় হাই পীকড ক্যাপ। 'এখানে কি করছ তোমরা?' পাশের সীম্যানের হাতে ধরা ফ্যাগ দেখাল। 'ইন্টারন্যাশনাল সিগন্যাল বোঝো না? তোমাদেরকে থামতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

'এভাবে আমাদেরকে থামানোর কোন অধিকার নেই তোমাদের,' টেঁচিয়ে বলল পল মিডল্যান্ড। 'আরেকটু হলে...'

পাত্তা দিল না অফিসার। 'এখানে কি করছ তোমরা? এত ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছ কোথায়?'

'মাছ ধরতে যাচ্ছি,' ওয়েসটন বলল নরওয়েজিয়ানে। 'এটা একটা ফিশিং ট্রলার, ড্যাম ইউ!'

এবারও পাত্তা দিল না সে। আরেক লোক ক্যামেরা হাতে উদয় হলো তার পাশে, টপটিপ কিছু ছবি তুলে নিল নর্দার্ন লাইটের।

'চাইলে তোমাদের দু'তাবাসের মাধ্যমে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারো,' বলল অফিসার। 'আর এদিকের পানিতে আরও সাবধানে চলাচল করা উচিত তোমাদের।'

গায়েব হয়ে গেল অফিসার। গুড়গুড় করে উঠল ডেস্ট্রয়ারের শক্তিশালী এঞ্জিন। ঘুরে চলে গেল ওটা। নিচের হোল্ডের অবস্থা দেখতে এসে বোকা হয়ে গেল ওয়েসটন ও পল। বিশী অবস্থা, সমস্ত জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। মেজর ক্রিফোর্ড কাঁতরাচ্ছে। ডেস্ট্রয়ারের ধাক্কায় বাস থেকে পড়ে গেছে সে, ডান পায়ের গোড়ালির হাড় ভেঙে গেছে।

সেদিকে নজর দেয়ার আগে ট্রলারের অবস্থা পরীক্ষা করে দেখল ওয়েসটন ও পল। না, ভাঙেনি কোথাও। ফটিল ধরেছে কয়েক জায়গায়, তবে সেগুলো ওয়াটার লেভেলের ওপরে। ভয়ের কিছু নেই।

'কি ঘটেছে ওপরে?' ক্রিফোর্ড বলল দাঁতে দাঁত চেপে। পলসেন ব্যাভেজ করে দিচ্ছে তার পা।

'ধাক্কা মেরেছে হারামজাদারা,' পল বলল। 'ইচ্ছে করে।'

'আমরা বোধহয় বেশি ভয়ভয়ানক করে ফেলছি' ভিলন বলল। 'এবার কিছুক্ষণের মধ্যে সত্যি সত্যি মাছ ধরা উচিত। নইলে সমস্যা হয়ে যেতে পারে। ওরা নিশ্চয়ই নিজস্ব স্যাটেলিটের মাধ্যমে চোখ রাখছে আমাদের ওপরে।'

'ঠিক বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল ওয়েসটন।

নয়

সোমবার। ব্রাসেলস।

সান্দ্রার অনামিকায় শ্যাফারার এবং হিরে বসানো চমৎকার আংটিটা দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল জুলিয়া। 'দারুণ হয়েছে তো আংটিটা!' বলল সে। 'সত্যি, সুন্দর মানিয়েছে তোমার হাতে।'

ব্রাশ করল সান্দ্রা। 'এরিক দিয়েছে।'

'তাই নাকি? তুমি খুব লাকি বলতে হবে, অন্তত আমার চেয়ে অনেক লাকি। কংক্রিটেশনস, ডার্লিং।'

'দন্যবাদ, জুলি।'

'তা কবে হচ্ছে শুভ কাজটা?' বুকে বসল জুলিয়া।

'ও বলেছে,' আবার ব্রাশ করল সে, 'এবারের ক্রিসমাসে।'

'কিন্তু এনগেজমেন্টের আংটি ডান হাতে কেন পরেছ তুমি? বাঁ হাতে পরোনি কেন?'

'ব্যাপারটা এখনই জানাজানি করতে চাইছি না আমরা...মানে, এরিক আর কি! আংটিটার দিকে তাকিয়ে থাকল সান্দ্রা। ভাবছে, ওটা যদি তার কিছু কিছু সন্দেহের জবাব দিতে পারত।

জুলিয়া তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। বত্রিশ পেরিয়ে গেছে, কোন বয়স্কেন্ড ছিল না সান্দ্রার। জেনারেল অ্যান্ডারসন ওদের দু'জনকেই মেয়ের মত ভালবাসেন, সান্দ্রার একাকীত্বের দুঃখ ঘুচাবার অনেক চেষ্টা করেছেন জুদলোক। বেশ ক'জন ব্যাচেলর জুনিয়র অফিসারকে ভিড়িয়ে দিয়েছিলেন ওর সাথে, কিন্তু ওর মধ্যে কোন 'সেক্স অ্যাপিল' নেই বলে একবার কি বড়জোর দু'বার ডেট করে কেটে পড়েছে সবাই।

সে নিজে একজন মেয়ে। সে-ও বোঝে সত্যিই সান্দ্রার মধ্যে পুরুষদের আকর্ষণ করার মত কিছু নেই। কিছুই নেই। অথচ সেই মেয়েকে এরিকের মত এক লেডিকিলার ছেলে দেখেই ভালবেসে ফেলল, তাকে বিয়েও করতে যাচ্ছে, কেন যেন বিশ্বাস হতে চায় না তার। বিশেষ করে ক'দিন আগে ছেলেটার সাথে রাত কাটিয়ে সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে জুলিয়ার। তার মত একজনকে পোষ মানাতে হলে চেহারায কিছু আবেদন থাকতেই হবে, অথচ সেই জিনিসই নেই এ মেয়ের। তাহলে কি দেখে, কেন...?

দুপুরে ক্যাফিনে লাক করতে এসে এরিকের প্রসন্ন তুলল জুলিয়া, তার এবং তার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাইল। কিছু সন্দেহ করে নয়, শ্রেফ মেয়েলী কৌতূহলবশে। কিন্তু যখন দেখা গেল তার সম্পর্কে প্রায় কিছুই সান্দ্রা জানে না, তখন বেশ অস্বস্তিতেই পড়ে গেল। বার্লিনে তার বাড়ি, অথচ কোন বার্লিন, পূর্ব না পশ্চিম জানে না বোকা মেয়েটা।

কেন যেন হঠাৎ করে উরসুলার কথা মনে পড়ে গেল তার। সে-ও তাদেরই মত মহাসচিবের পি.এ ছিল। সান্ড্রা-জুলিয়া যে রুমে বসে, সেই রুমেই বসত। তখন অবশ্য সে ছিল না, সান্ড্রা ছিল। পশ্চিম জার্মানির মেয়ে ছিল সে। '৮২ সালে হঠাৎ একদিন... চিন্তার মোড় ঘুরে গেল জুলিয়ার। ভাবছে, এরিক তার প্রেমিকাকে এত আঁধারে রেখেছে কেন?

সময় থাকতে জেনারেলকে ব্যাপারটা সম্পর্কে জানাবে নাকি সে? নাহ, সেটা ঠিক হবে না। বরং... দুপুরের পর গোপনে লন্ডনে ফোন করল সে, সেখানকার ন্যাটোর এক মাঝারি গোছের সিকিউরিটি অফিসারের সাথে কথা বলল। তার নাম ফিলপট, প্রায়ই আসা-যাওয়া করে এখানে।

'কি ম্যাগাজিনে চাকরি করে বললে?' প্রশ্ন করল লোকটা।

'আকুতুয়েলে নাখরিখতেন,' জুলিয়া বলল।

'ক্রাউট, কেমন?' হাসল ফিলপট। 'আকুতুয়েলে নাখরিখতেন?...ওকে, সিলি গার্ল, আমি খোঁজ নিচ্ছি।'

দুশো মাইল দূরে, লন্ডনে নিজের অফিসে এরিক ব্রাউন সম্পর্কে তখনই খোঁজ-খবর নিতে শুরু করল ফিলপট।

ফরনিবু এয়ারপোর্ট, অসলো। বুধবার।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এয়ার সার্ভিসের এক ডিসি-৯ দাঁড়িয়ে আছে মেইন টার্মিনাল ভবনের একটু দূরে। আগামীকাল রাতে ভবনের কাছে আসবে ওটা, একদল নরওয়েজিয়ান খনি শ্রমিক নিয়ে সোয়ালবার যাবে নিয়মিত সাপ্তাহিক ফ্লাইটে। একদল শ্রমিক ছুটি শেষে কাজে ফিরে যাবে, আরেক দল ছুটি নিয়ে দেশে আসবে। কিন্তু সময়মত কোন শ্রমিক থাকবে না প্লেনে। কেবল কমান্ডো বাহিনী থাকবে।

দুপুরের একটু পর এমএএসের ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম ও পীকড ক্যাপ পরা দুই পাইলট বের হয়ে এল টার্মিনাল ভবন থেকে। তাদের মধ্যে একজন মাসুদ রানা। পাইলটের ব্যাজ চক্চক্ করছে ওর বুকে। দৃঢ় পায়ে গ্যাঙুয়ে বেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল দু'জনে।

ফুরা কেউ নেই ভেতরে, গ্রাউন্ড ফুরা আছে অবশ্য, ছইনের সার্ভিসিঙের কাজে ব্যস্ত। গত কয়েকদিন ধরেই চলাছে ওটার 'সার্ভিসিং'। নোজ ছইলে 'সমস্যা'।

ভেতরে ঢুকে ব্যস্ত পায়ে পিছনদিকে চলল রানা। লেজের কাছে ল্যাভেটরির কাছে এসে থামল। ওকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে গেল ক্যাপ্টেন, সরু একটা দরজা আছে ওখানে, ভেতরদিকে খোলে। হাত বাড়িয়ে ওটা খুলে ফেলল সে। একটা মোচাকতির ফাঁকা অংশ বেরিয়ে পড়ল। এখানে ভেতরদিকে একটা জিটকিনি আছে দেয়ালের গায়ে, সেটা খুলে ভেতরের একটা লিটার টেনে দিল সে। মৃদু গুঞ্জনের সাথে ফ্র্যাগের একটা অংশ সরে গেল, দেড় ফুট বাই দেড় ফুট একটা গর্ত বেরিয়ে পড়ল।

'সী?' হাসল লোকটা। 'ওড বাই বলে সোজা হেঁটে নেমে যাবেন।'

মাথা নাড়ল মাসুদ রানা। চিন্তিত।

'বেলসান্ড রেডিও স্টেশন থেকে কত কিলোমিটার দূরে জাম্প করতে চান, স্যার?'

'আট কিলোমিটারের মধ্যে,' বলল ও।

'পাহাড় ও সাগরের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায়,' বলতে বলতে পকেট থেকে একটা ক্যালকুলেটর বের করল লোকটা। হিসেব করতে লেগে পড়ল। 'আমাদের গতি থাকবে তখন একশো দশ নটস। বেলসান্ড অতিক্রম করার দু'মিনিট বিশ সেকেন্ড পর জাম্প করতে হবে আপনাদেরকে। পাঁচ হাজার ফুট ওপর থেকে।'

একটু ভাবল রানা। গ্রাফ পেপারের একটা ফোল্ডার নীচে চোখ বোলাল। ওই এলাকার পাহাড়ের উচ্চতা, দূরত্ব ইত্যাদি মার্ক করা আছে ওটায়। হিসেব সেরে মুখ তুলল। 'বেলসান্ডের দু'মাইলের মধ্যে নামতে পারলে আরও ভাল, কাজ তাতাতাড়ি হবে। ক্রশ রাডার আছে লংইয়ারবিয়নে, দেড় হাজার ফুট উচ্চতায়। ওটা নিশ্চই ট্র্যাক করবে আমাদের। বেলসান্ডে ওর চেয়ে অনেক উঁচু পাহাড় আছে, ওগুলোর মধ্যে জাম্প করা গেলে আড়াল পাব আমরা, রাডার টের পাবে না। পাহাড় পর্দার কাজ করবে।'

'হুঁ কল করলেও ধরতে পারবে?'

'যদি অতিরিক্ত সতর্ক থাকে, নিশ্চয়ই পারবে। মেঘ থাকলে স্যাটেলাইট ক্যামেরা টের পাবে না অবশ্য।'

একটু ভাবল ক্যাপ্টেন। 'যদি মাটি দেখা না যায়?'

শ্রাণ করল রানা। 'ঝুকিটা নিতেই হবে।'

'...উত্তেজনা আর অনিশ্চয়তা তত বাড়ছে। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, ব্যারেন্ট নীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক ফ্লীট এবং ক্রশ নৌ-বাহিনী এমুহুর্তে প্রায় মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে। গতকাল মার্কিন প্রেসিডেন্ট সোয়ালবারে ক্রশ আর্লি ওয়ানিং রাডার সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত বলে মন্তব্য করার পর নতুন এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

'পার্ববেশকদের ধারণা, ওই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এত ব্যাপক সংখ্যক যুদ্ধ জাহাজ মোতায়ন ফুল-ফেল নেভাল ব্রকেডের ইঙ্গিতই বহন করে। বিবিসি লন্ডন থেকে...'

রিমোট কন্ট্রলের বাটন টিপে টিভি অফ করে দিল রানা। উঠে বেডরুমের দিকে পা বাড়াল। অসলোর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের লাঙ্গারি স্যুইট এটা। গত চারদিন থেকে এখানে আছে ও আর সোহানা। অন্যরাও আছে। আজই শেষ রাত, কাল যাত্রা শুরু হবে। চূড়ান্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

কাল রাতে খান আর অ্যাডমিরাল কিং আসছেন ওদের দলকে বিদায় জানাতে। আজ দুপুরে স্বরটা পেয়েছে ওরা, তখন থেকে মনটা খুশি-খুশি লাগছে। এমন ঘটনা খুব বিরল। বেডরুম অঙ্ককার দেখে চোখ কঁচকে উঠল ওর, যুনিয়ে পড়েছে নাকি সোহানা? না দিক থেকে ঘরে চাঁদের আলো আসছে দেখে ভাকাল, দেখল জানালার পর্দা সরিয়ে মুখ তুলে বাইরে তাকিয়ে আছে ও। করলো

মুখটা ঝলমল করছে চাঁদের আলোয়। নিঃশব্দে ওর কাছে এসে দাঁড়াল রানা, পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল। 'কি করছ?'

'চাঁদ দেখছি,' বলল ও। 'কিন্তু ভাল লাগছে না।'

'কেন?'

'বাংলাদেশের মত অত সুন্দর চাঁদ আর কোথাও গুঠে না।'

নীরবে মাথা দোলাল ও, ঠিকই বলেছে সোহানা।

ব্রাসেলস।

'কি যেন নাম তোমার বয়ফ্রেন্ডের?' বলল ফিলপট। 'এরিক ব্রাউন, না?'

'হ্যাঁ,' একটু বিস্মিত হলো সাদ্রা। এই লোকটা এরিকের নাম জানল কি করে

ভাবছে। তাছাড়া, কথা নেই বার্তা নেই, ইংল্যান্ড থেকে এসেই এমন প্রশ্ন, কেন?

'কি করে সে?'

'এক জার্মান ম্যাগাজিনের...'

'ও, হ্যাঁ,' বাধা দিল ফিলপট। 'আকুতুয়েলে নাখরিখতেন, তাই তো?'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'আমি জানলাম কি করে?' মেয়েটাকে তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল

লোকটা। পঞ্চাশ-পঞ্চাত্তর মত বয়স তার, খাটো। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, চাউনি অত

ভেদী। 'জুলিয়া বলেছে।'

'জুলি! বুঝলাম না, ও কেন...'

'আমি যা প্রশ্ন করি,' বাধা দিল ফিলপট, 'তুমি কেবল তার জবাব দেবে।'

কেন, কি, এসব প্রশ্নের উত্তর পরে দেয়া হবে। ওকে?'

চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল সাদ্রা। বুক কাঁপছে। কি হচ্ছে এসব?'

মাথা ঝাঁকাল।

'ওড! ওই পত্রিকার হয়ে ন্যাটো কাতার করছে এরিক, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'মাবেমধ্যে তোমার কাছে এখানকার ভেতরের খবরও জানতে চায়?'

'না,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'আমাকে তো কখনও কিছু জিজ্ঞেস করে

না।'

বুকে বসল ফিলপট, পারিবারিক ডাঙারের মত সতর্কতার সাথে রোগীকে

পরীক্ষা করছে। যেন কঠিন অসুখ করেছে তার, কথাটা কি করে বলবে ভাবছে।

'সাদ্রা, এবার উত্তর দেয়ার আগে ভাল করে ভেবে দাও, প্রীজ। লোকটা কখনও

আমাদের মিলিটারি প্র্যানিং সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে?'

'হ্যাঁ,' বেশ কিছুক্ষণ পর বলল সে। 'একবার জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু আমি

জবাব দিইনি।'

'ইদানীং সোয়ালবার প্রশ্ন নিজেই ও বেশি অগ্রহী, তাই না?'

লোকটার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ভাল ঠেকছে না সাদ্রার। ভেতরটা কুকড়ে উঠতে

ওর করেছে। আজকের শয়, বেশ কয়েক বছরের পরিচিত তার ফিলপট। ন্যাটোর

পদস্থ অফিসার, প্রায়ই লন্ডন থেকে আসা-যাওয়া করে। তার ও জুলিয়ার সাথে

খুবই আন্তরিক, প্রায় বন্ধুর মত আচরণ করে এসেছে এতদিন। আজ কি হলো

সেই লোকের? এমন গল্পীর কেন? এরিকের ব্যাপারে এত কৌতূহল কেন তার?'

মাথা নাড়ল ও, মুখ খুলতে সাহস হলো না।

'আবার বলো, আমাদের সোয়ালবার প্র্যানিং সম্পর্কে ওকে কিছু বলেছ, বা

আভাস দিয়েছ?'

ভয়ে, অজানা আশঙ্কায় কেঁদে ফেলল মেয়েটা। 'না, কেন বলব? কেন

বারবার একই প্রশ্ন করছেন?'

'সরি, ডিয়ার,' কোটের ব্রেস্ট পকেট থেকে ভাঁজ করা সাদা একটা রুমাল

বের করে এগিয়ে দিল ফিলপট। 'নাও। চোখের পানি মোছো। আমার কথা

এখনও শেষ হয়নি।'

ওকে সামলে নেয়ার সময় দিয়ে আবার মুখ খুলল লোকটা, নিচু গলায় এরিক

ব্রাউন সম্পর্কে নিজের আহরণ করা তথ্য বলতে শুরু করল। অবিশ্বাসে চোয়াল

ঝুলে পড়ল সাদ্রার, বুক-গলা শুকিয়ে উঠল।

'আমি বিশ্বাস করি না!' ফিলপট থামতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ও। 'অসম্ভব!

অসম্ভব! ও স্পাই হতে পারে না! এতবড় প্রতারণা করতে পারে না ও আমার

সাথে!'

'তাই? ঠাণ্ডা গলায় বলল সিকিউরিটি অফিসার। 'তাহলে পরেরবার যখন

তার সাথে দেখা হবে, জিজ্ঞেস করো তো গত সোমবার রাতে কোথায় ছিল

সে।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল সাদ্রা। 'গত সোমবার?'

'হ্যাঁ, যেদিন ডিফেন্স প্র্যানিং কমিটির মীটিং হয়েছিল।'

'কোথায় ছিল!' অক্ষুটে বলল ও।

'জুলিয়ার সাথে, বিছানায়।'

বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটা।

আধারের বুক চিরে সোয়ালবারের দিকে ছুটে চলেছে এসএএসের ডিসি-৯।

এখানে রাত বটে, কিন্তু উত্তরে তা নয়। ঘড়ির হিসেবে রাত হলেও ওদিকে প্রায়

দিনের মতই আলো, কেবল একটু ফ্যাকাসে, এই যা।

পেনে যাত্রী থাকার কথা একশো তেইশজন, সোয়ালবারের খনি শ্রমিক। কিন্তু

আসলে একজনও নেই তাদের, আছে কেবল মাসুদ রানা ও সোহানাসহ ভার্সিনিয়া

রিজ এ গ্রুপের সাত সদস্য। দলটা বেলসান্ডের কাছে ফ্রী ফল করলে ফিরে

আসবে ডিসি-৯, লংইয়ারবিয়ন এয়ারফিল্ড কন্ট্রোলকে অজুহাত হিসেবে জানাবে

ল্যান্ডিং গিয়ার আটকে গেছে, নামছে না। এটা টেকনিকাল সমস্যা, যখন-তখন

মটতেই পারে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে পাঁচ কমান্ডো-হাওয়ার্ড শিখ, মিলার, জনসন,

ট্রেভিনকি ও বাকহার্ড। হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। রানা-সোহানা বসেছে

পাশাপাশি। সোহানা চোখ বুজে থাকলেও সজাগ, রানা জানে। ওর নিজেরও ঘুম

আসছে না। মাথায় নানান চিন্তা। মূল চিন্তা সবার চোখ ফাকি দিয়ে জায়গামত

৬-পালাও, রানা

নামতে পারবে কি না। না কি ফ্রী ফলের সুবিধে মাঠে মারা যাবে।

প্যারাগুট জাম্প করলে মানুষের চোখ এড়ানো সম্ভব হয় না, কিন্তু ফ্রী ফলের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। খুবই সাধারণ ব্যাপার। প্যারাগুট পরেই জাম্প করতে হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে ওটা না খুলে, মাটির যত কাছে সম্ভব নেমে এসে খুলতে হয়। এতে চোখে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রায় থাকেই না।

এ যাত্রা তাই করতে যাচ্ছে রানা। তাতে সমস্যা নেই, ফোর্ট ব্র্যাগে বহুবার ফ্রী ফল প্র্যাকটিস করেছে সবাই। ওর চিন্তা জায়গামত নামতে পারবে কি না, অথবা অজায়গায় গিয়ে পড়তে হবে কি না। সোহানা উসখুস করছে দেখে ওর হাত মুঠোয় তুলে নিল রানা। 'ভয় করছে?'

'না, রানার কাছে মাথা রাখল ও। 'তোমার?'

'আমার করছে,' নিশ্চিন্দায় স্বীকার করল রানা।

'কেন?' সোহানা মুখ তুলল, ডিম লাইটের মৃদু আলোয় ভাল করে ওকে দেখার চেষ্টা করল।

'প্রথম ভয় তুমি, দ্বিতীয় ভয়, সাগরে পড়ি না পাহাড়ে!' রানা বলল।

'দ্বিতীয়টা বুঝি, যুক্তি আছে। কিন্তু প্রথমটা কেন?'

'জানি না, শ্রাগ করল ও। 'তবে ভয় করছে,' স্বস্তি পাচ্ছি না।'

আবার কিছুক্ষণ ওকে দেখল সোহানা। মৃদু গলায় ডাকল, 'রানা!'

'উম!'

'খুব ভালবাস আমাকে?'

ঘুরে তাকাল ও। 'এ কেমন প্রশ্ন হলো?'

'আহা, বলোই না!'

'তোমার কি মনে হয়?'

একটু সরে বসল সোহানা। চোখ কুঁচকে তাকাল। 'ফের ত্যাগী কথা? সোজা কথা সোজা করে বললে কি হয়? বলো!'

'কি বলব?'

'আমি যা জানতে চাইছি তার উত্তর।'

'তোমাকে ভালবাসি কি না?' ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল ও। 'নাহ, নিজেকে ভালবাসি।'

রাগল না সোহানা, বরং হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা। 'আমি জানতাম এই কথাই বলবে তুমি।'

'জানোই যদি, জিজ্ঞেস করো কেন?' রানাও হাসল। 'তোমাকে আমি নিজের থেকে আলাদা ভাবতে পারি না। কোনদিন পারব বলেও মনে হয় না।'

রানার কাছে মাথা রাখল সোহানা। 'ধন্যবাদ, রানা!' বলল কাঁপা গলায়।

রানা চেয়ে দেখল, মুখে হাসি, কিন্তু চোখ দিয়ে পানি ঝরছে সোহানার।

ত্রিশোয়ার রিফ্লেক্সিং সেরে আবার আকাশে উঠল বোটটি, সপত্রনে উড়ে চলল গন্তব্যের দিকে। এখনও প্রায় তিন ঘণ্টার পথ, তাই বানিকটা ঘুমিয়ে নেয়ার আয়োজন করল ওরা। দেহ মন্ডির হিসেবে এখন মাঝরাত, তাই কিছুনি আসতে সময় লাগল না। সোয়ালবার পৌঁছতে পনেরো মিনিট বাকি থাকতে উঠে পড়ল

সবাই, ঝটপট প্যারাগুট বেঁধে নিল পিঠে। ওগুলোর সাথে ব্যারোমেট্রিক গুপেনিং ডিভাইস সেট করা। কেউ সময়মত ক্যানোপি রিলিজ না করলে দু'হাজার ফুট উচ্চতায় পৌঁছে এমনিতেই খুলে যাবে ওগুলো।

ওয়ার বেল্টের সাথে খুলছে পিস্তল ও ছুরি। একটা করে স্টোব লাইটও আছে সবার সঙ্গে। ফ্লোরে রাখা আছে সাতটা লম্বা, দুসর রং করা অ্যালুমিনিয়ামের টিউব। ওর মধ্যে ফোল্ডিং কি সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই আছে। এছাড়া একটা করে মিনি রেডিও আছে সবার সঙ্গে, অল্প দূরত্বে কথা বলার জন্যে।

প্রত্যেকের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা, ঠিকই আছে। চোখের সামনে সোয়ালবার এলাকার টপোগ্রাফি ভেসে উঠল-ওখানকার মূল দ্বীপ, স্পিটসবার্গের গঠন দাঁতের মত, প্রান্ত দক্ষিণে মুখ করা। তার পশ্চিম উপকূলে বেশ কয়েকটা ফিওর্ড আছে, সবচেয়ে বড় দুটো হচ্ছে বেলসান্ড ও ইসফিওর্ড। দুটোর মাঝখানে পঁচিশ মাইল প্রশস্ত পাহাড়ী ভূমি। লংইয়ারবিয়েন আর রুশ সেটেলমেন্ট ব্যারেন্টসবার্গ, দুটোই তার উত্তরে। বেলসান্ড ও ইসফিওর্ডে ছিল দুটো নরওয়েজিয়ান রেডিও স্টেশন। তবে এখন আর নরওয়েজিয়ান নেই, রুশদের মজিমত চলে।

সময় ঘনিয়ে আসতে ককপিট থেকে ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে এল ওদের ডিসপ্যাচার। লোকটা সার্জেন্ট, ফিয়েগার।

'লংইয়ারবিয়েন জানাচ্ছে, দুশো ফুট ওপরে মেঘ আছে। ক্যান্টেন জানতে চাইছে ওকে কি না,' বলল লোকটা।

'ওকে,' মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। সার্জেন্ট ককপিটে ফিরে যেতেই উচ্চতা কমতে লাগল প্লেনের, একই সাথে গতিও। এখন অন্যরকম আওয়াজ করছে এঞ্জিন। সার্জেন্ট ফিরে এল, মাথায় হেডফোন পরে, পিছনের মোচাকৃতির দরজাটা খুলে দিল। ফাঁক হয়ে গেল ফ্লোর, সঙ্গে সঙ্গে ঝড় শুরু হয়ে গেল ভেতরে। প্রচণ্ড বাতাসে ফড়ফড় করে উড়ে বেড়াতে লাগল খবরের কাগজ ইত্যাদি।

ইয়ারপীস কানের সাথে লেগেই আছে, তবু গুটাকে এক হাতে ঠেসে ধরে রেখেছে সার্জেন্ট, ক্যান্টেনের নির্দেশের জন্যে প্রস্তুত। একটু পর এক হাত তুলল সে কোণ মারার ভঙ্গিতে। 'অ্যাকশন স্টেশনস!'

গায়ে গায়ে লেগে ফাঁকটার দিকে মুখ করে দাঁড়াল দলটা। পায়ের সাথে বাঁধা টিউব বা হাতে বুকের সাথে ধরে রেখেছে। বেরিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবে। স্মিথ রয়েছে সবার আগে, তারপর ত্রেভিনস্কি, জনসন, বাকহার্ড, মিলার, সোহানা এবং সবার পিছনে রানা। প্লেনের ভেতরটা ভরে গেছে ঘন মেঘে, একজন অন্যজনের দেখতে পাচ্ছে না ঠিকমত।

উঁচুতে দু'আঙুল তুলে ধরল সার্জেন্ট, উত্তেজনায় টানটান। মধ্যমা ভাঁজ করল নে, এক মুহূর্ত পর তর্জনী, সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচাল। 'গো!'

দশ সেকেন্ডের মধ্যে প্লেন থেকে শ্রেক হেঁটে বেরিয়ে গেল দলটা, স্পিথ স্ট্রিমের হ্যাচকা টানে দিক হারিয়ে ফেলল মাসুদ রানা, মেঘ ফুটো করে নেমে যেতে থাকল হু-হু করে। কয়েকশো ফুট নেমে এসে নিজেকে ফিরে গেল, টিউবটা ছেড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ নিজের ভঙ্গি ঠিক করে নিল-দু'পা বাইরের দিকে ছড়ানো,

হাত সামান্য ভাঁজ করা, যেন তালুর ওপর দেহের ভর রাখতে যাচ্ছে। বাতাসের তোড় বাড়ছে।

খানিকটা নিচে, ডানদিকে দুটো কালো ফোঁটা মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল ও, সমান গতিতে নামছে। তারপর নেই হয়ে গেল। বুকে বাঁধা রিজার্ভ প্যারাসুটের সাথে সেট করা অস্টিমিটার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও: ৩২০০...৩৩০০...২৮০০। অল্পক্ষণের মধ্যে মিনিটে দশ হাজার ফুট করে নামা শুরু হবে।

নিচে কয়েকটা ক্যানোপি দেখতে পেল ও। শুনে দেখার চেষ্টা করল, হলো না, থেকে থেকে ঘন কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। চার সেকেন্ড পর ক্রোম হ্যান্ডেল ধরে টান দিল, কাঁধের হার্নেসে বাঁকি লাগল, ওপরে ফুডাং শব্দে খুলে গেল ক্যানোপি। ঠিক ক্যানোপি নয়, ইনফ্লটেড উইং। অস্টিমিটারে ১৯০০ উঠল। এখন প্রতি সেকেন্ডে মাত্র দোলো ফুট করে নামছে রানা। ওপরে কোথাও গর্জন করছে ডিসি-৯।

হঠাৎ করে পায়ের বাঁধা কন্টেইনারটার কথা খেয়াল হতে ভয় ধরে গেল মনে। যদি বাইচাপ পানিতে গিয়ে পড়ে ও, তাহলে মুহূর্তে তলিয়ে যাবে ওটার টানে। অথচ কিছু করার নেই এখন ভাগ্য আর পাইলটের হিসেবের ওপর নির্ভর করা ছাড়া। গুটীটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু তাতে ফল উল্টোও হতে পারে। হয়তো দেখা যাবে ও নিজেই নিজেকে ঠেলে নিয়ে গেছে পানির দিকে।

আম্বার নাম স্মরণ করে নিচে তাকাল। নাকেমুখে লেগে থাকা কুয়াশা জমাট বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। আড়াইশো ফুটে নেমে নিচে ঝকঝকে বরফের মাঠ চোখে পড়তে জানে পানি এল ওর। ল্যান্ডিং হলো নিখুঁত। বাতাসের দিকে ক্যানোপি ঘুরিয়ে দিয়ে ঝুপ করে নেমে পড়ল।

শুট সামলে দ্রুত চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল ও, হাতে ওয়ালথার তৈরি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সঙ্গীদের প্রত্যেককে দু'পায়ে খাড়া দেখতে পেয়ে আনন্দে দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওর। কম্পাস বের করে বেয়ারিং নিল।

পুবদিকে চলে গেছে ভূষারের একটা ঢাল, উঁচু হতে হতে সম্ভবত মাইল দুয়েক দূরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে মেঘের মধ্যে। পশ্চিমে ওদের আরতি, ওটাও দু'মাইল দূরেই। ওদের কাছে 'বীচ ইয়েলো' নামে পরিচিত জায়গাটা।

পল মিডল্যান্ড ওখানে এ গ্রুপের অপেক্ষায় থাকবে জনসনের রেডিও সেট নিয়ে।

গ্রুপ বি নিশ্চয়ই প্লেনের আওয়াজ শুনেছে, ভাবল রানা। 'এভরিবডি ওকে?' 'ইয়েস, স্যার!' বলল শ্মিথ। 'অল ইন শুড হেলথ অ্যান্ড শুড শেপ।'

নীরবে কাজে হাত লাগাল সবাই। কন্টেইনার খুলে কিট প্রস্তুত করল, তারপর টিউব ও প্যারাসুট সতর্কতার সাথে পুঁতে ফেলল তিন ফুট ভূষারের নিচে। কাজ শেষ হতে সবাইকে দেখে নিল রানা। 'রেডিও'

নীরবে মাথা দোলাল সবাই। 'লেট'স মুভ!'

এক সারিতে সতর্কতার সাথে এগোল গ্রুপ এ। পিঠের সাদা রঙের প্যাকের ভারে একটু কুঁজো হয়ে আছে প্রত্যেকে, কাঁধে সাদা রং করা রাইফেল। বিনা

বাধায় জায়গামত পৌঁছল দল, বীচ ইয়েলোর কিছুটা দূরে, গাছের আড়ালে থেমে চোখে বিনকিউলার লাগাল রানা।

কেউ নেই। উপকূল ফাঁকা। চিকচিক করছে বে, পানিতে ভাসছে সমতল বরফের ছোটবড় টুকরো। পুরো ব্যান্ডস্কেপে চোখ বোলাল রানা, নেই কেউ। ভীরে সব অনড়, কিছু নড়ছে না। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর, এরকম তো হওয়ার কথা নয়! ঘুরে সঙ্গীদের দেখল ও, গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। নিঃশ্বাস ছাড়ছে ধোয়ার মত।

'এক ঘণ্টা অপেক্ষা করব আমরা,' ঘোষণা করল ও। 'এর মধ্যে প্লেনের দেখা না পেলে রেডিও সাইলেন্স ব্রেক করতে হবে।'

তার যেন দরকার না হয়, মনে মনে বলল। রুশ লিসনিং পোস্ট ধরে ফেলতে পারে। খুব বড় ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। কিন্তু সময় ফুরিয়ে আসছে দেখে আর কোন উপায় রইল না। প্যাক থেকে ছোট একটা পিআরসি-৭৭ রেডিও বের করল রানা। এরিয়েল তুলে ফ্রিকোয়েন্সি টিউন করল, কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনল কিছুক্ষণ, তারপর সেকেন্ডের জন্যে টিপে দিল ট্রান্সমিশন সুইচ। একটা 'ক্লিক' আওয়াজ উঠল। একটু চিন্তা করে সংক্ষিপ্ততম মেসেজটা মনে মনে সাজাল রানা, লম্বা দম নিল। আরেকবার সুইচ টিপে পাঠিয়ে দিল সেটা।

'ইন্ডিয়া চাইকি চার্লি। দিস ইজ ডিস্ক সিক্স। ইন্টারোগেটিভ ইয়েলো আউট।' জবাবটা এল বেশ কিছুসময় পর। ক্লিফোর্ডের গলা ভেসে এল। 'সিক্স নেগেটিভ রেড আউট।'

স্বস্তি ফুটল সবার চেহারায়। এরিয়েল গুটিয়ে সেট জায়গামত রেখে দিল রানা। ক্লিফোর্ডের জবাবের অর্থ, এগিয়ে যেতে হবে ওদেরকে। পাহাড়ের দিকে। আবার যাত্রা করল দল, এবার স্কিতে চড়ে। থেমে থেমে, ম্যাপ ও কম্পাসের সাহায্য নিয়ে এগোল রানা। সোহানা প্রায় ওর পাশাপাশি রয়েছে। কয়েকশো মিটার যেতে সামনেই কিছু একটা দেখতে পেয়ে হাত তুলে 'ডাউন!' সঙ্কেত দিল রানা, ঝুপ করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। দেখাদেখি অন্যরাও। অনড় হয়ে পড়ে আছে।

বিনকিউলার চোখে লাগাল রানা। হাতের কাছেই রয়েছে এম-সিক্সটিন রাইফেল। সত্যিই কিছু রয়েছে সামনে, অনেকগুলো গাঢ় আকৃতি, চলাছে। কুয়াশায় বোরা যাচ্ছে না ওগুলো কি। শত্রু? কিন্তু তা হয় কি করে?

বেশ কয়েক মিনিট পেরিয়ে যেতে হঠাৎ কাঠামোগুলো চিনতে পারল ওরা। শত্রু নয়, বন্ধু ওরা। রেইনডিয়ার-কয়েক হাজার। গ্রুপ এ-র যাত্রাপথের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি উত্তরে যাচ্ছে। উপকূলের বরফ-ঝুজু ঘাসজমির খোঁজে সম্ভবত। বেশি বড় নয়, কেননা পা খাটো হয় রেইনডিয়ারের। দেহও ছোটখাট। গায়ের রং ধূসর সাদা, শাখা-প্রশাখাওয়ালো শিং, চোখের চারদিকে প্রায় কালো পশামের চমৎকার একটা বৃত্ত থাকে।

সোয়ালবারে দশ হাজারেরও বেশি বলগা হরিণ আছে, শুধাটো জানে মাসুদ রানা। একটা কথা খেয়াল হতে হাসি পেল। মানুষের আর বলগা হরিণে ওজনের দিক থেকে তেমন পার্থক্য নেই, সেই সাথে এ মুহূর্তে ঘন পশুমে ঢাকা পুরু

চামড়ার নিচে জন্তুগুলোর দেহের তাপমাত্রা আর আর্কটিক ক্রোদিঙের নিচে ওদের দেহের তাপমাত্রা, দুটোই প্রায় এক। আকাশে যদি এ মুহূর্তে কোন রাশান ফটোগ্রাফিক ইন্টারফ্লিটার থাকে, মেঘের আড়াল থেকে তার ইনফ্রারেড ফটোগ্রাফ রেকর্ডিং সিস্টেম যদি নিচে কি আছে অ্যানালাইজ করে দেখার চেষ্টা করে, তাহলে হাজার হাজার খুঁদে ডট ধরা পড়বে তার চোখে। বডিহীট এক হওয়ায় ওগুলোকে রেইনডিমারই ভাববে সেটা। ওদেরকে সনাক্ত করতে পারবে না।

ধীরগতির পালটা ওদেরকে অতিক্রম করতে প্রায় দশ মিনিট সময় নিল। তারপর আবার এগোল ওরা।

'আজ সকালে বেলসান্ডের কাছে দুটো রেডিও ট্রান্সমিশন পিক করেছে আমাদের ইলেকট্রনিক ইন্টেলিজেন্স,' বলল কর্নেল ম্যাকারভ। 'দুটোই খুব সংক্ষিপ্ত ছিল। জায়গাটা উপকূলের কাছাকাছি, সাতাত্তর ডিগ্রী ছেচল্লিশ মিনিট নর্থ, বারো ডিগ্রী উনত্রিশ মিনিট ইস্ট।'

চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে ছিল কবীর চৌধুরী। সে ধামতে অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে বসল। 'তারপর?' বলল দেয়ালের ম্যাপে চোখ রেখে।

'ওই এলাকায় কোন ন্যাটো শিপ নেই,' বলে চলল কর্নেল। 'অথচ ট্রান্সমিশন দুটো ছিল শর্ট-রেঞ্জ ডিএইচএফ ফ্রিকোয়েন্সির। এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয় বলে আমি তাৎক্ষণিকভাবে ইনফ্রা-রেড ফটোগ্রাফিক কভারেজের নির্দেশ দিয়েছি।'

'ওড! ঠিকই করেছেন।'

'দুটো মেসেজের একটায় "ইয়েলো", অন্যটায় "রেড" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, স্যার। আমার ধারণা আমেরিকা কোন ক্র্যাভেন্স্টাইন কমান্ডো মিশন পাঠিয়েছে। ওটা হয় এরইমধ্যে ল্যান্ড করেছে, নয়তো করতে যাচ্ছে।'

উন্মাদ আমেরিকানরা যদি সত্যিই রেইড করার পরিকল্পনা করে থাকে, তাহলে বেলসান্ডই তাদের ল্যান্ড করার উপযুক্ত জায়গা। সবার অলঙ্কে ওখানে অবতরণ করতে পারে তারা। কণ্টারে চড়ে দুই রাডার সাইটের যে কোনটার কাছে এসে নামতে পারে। হঠাৎ সেই ট্র্যাপারস হাটের কথা মনে পড়ল তার। ঠিক করল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে একটা অ্যামবুশের ব্যবস্থা করতে হবে।

কবীর চৌধুরী নিজের চিন্তায় মগ্ন। ভাবছে, তার বাকি দশ বিলিয়ন আদৌ আর পাওয়া যাবে কি না। মস্কো তাকে প্রথমেই অনুরোধ করেছিল রাডার স্থাপনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে থেকে সে যেন মস্কোর প্রতিনিধিত্ব করে। কাজটা শেষ হলেই বাকি টাকা দিয়ে দেয়া হবে। মনে মনে তিক্ত হাসি হাসল সে।

তখন যেমন ভেবেছিল, এখন দেখা যাচ্ছে তেমনভাবে ঘটছে না। আমেরিকা একটা কিছু হাসামার সৃষ্টি না করে ছাড়বে না। কমান্ডো মিশন যে আসছে, সে বরফ স্টাসির মাধ্যমে আগের পেয়েছে মস্কো। তাকে সতর্ক করে দিয়েছে। সত্যিই যদি তারা এসে পড়ে থাকে—

'ইসফিওর্ড রেডিও সাইটে কড়া গাভের ব্যবস্থা করুন, পলকভনিক,' বলল সে। 'ওটাই বেশি জরুরী।'

'গতরাতে মারমানস্ক থেকে ওখানকার মেইন রাডার মাস্ট নিয়ে যাত্রা করেছে জাহাজ। আমার সন্দেহ আমেরিকান স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফিতে ওটার লোডিং ধরা পড়ে গেছে। সাইটটা যদি ধ্বংস হয়, তাহলে বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে।'

ম্যাপের দিকে তাকাল কর্নেল। উত্তর উপকূলের কাছের পাহাড়ী রেঞ্জ বেখানটার তীরের খুব কাছাকাছি, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বিচ্ছিন্ন ইসফিওর্ড রেডিও স্টেশন। জায়গাটা প্রায় সমতল। কোন রেইডিং পার্টি যদি ওটার কাছে যেতে চায়, তাহলে সাগর আর পাহাড়ের মধ্যকার সরু ফানেলের মত এক চিলতে জায়গা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে।

'ওখানে ব্যাটাদের ইঁদুরের মত তাড়া করে মারব আমরা,' বলল সে। ওদের দক্ষিণে রিট্রিট করার পথ বন্ধ করে দিয়ে—

'ওই কাজটি করা চলবে না,' বাধা দিয়ে বলল কবীর চৌধুরী। 'ওদেরকে জ্যান্ত ধরতে হবে।'

অবাক হলো ম্যাকারভ, কিন্তু মনের ভাব চেপে রেখে বলল, 'উইথ রেসপেক্ট, স্যার। ধরা পড়ার আশঙ্কা থাকলে ওখানে পা রাখার ঝুঁকি ওরা নিত বলে মনে হয় না আমার।'

'সে সব আমি জানি না, পলকভনিক। এ কাজ এক হিরোর। আমি জানি আপনাই সেই হিরো। কে জানে, হয়তো আরেকটা মেডেল...' কথা শেষ করল না সে।

বেরিয়ে এল কর্নেল, তার জন্যে অপেক্ষমাণ কণ্টারে চড়ে ব্যারেন্টসবার্গের দিকে চলল। সেখানে পৌঁছে ড্যান মিয়েনফিওর্ডের উদ্দেশে ছোট এক পেট্রল বাহিনী পাঠিয়ে দিল।

এক ঘণ্টা হাঁটার পর বেলসান্ডের কাছে পৌঁছল গ্রুপ এ। এত দীর্ঘ সময় প্রায় নব্বই পাউন্ড পিঠে করে বয়ে আনার ফলে দু'কাঁধ টনটন করছে মাসুদ রানার। অন্যদের অবস্থাও একইরকম, কিন্তু কারও মুখ দেখে তা বোঝার উপায় নেই। থেমে দাঁড়িয়ে দিক বুঝে নিল রানা।

মাথার ওপর মেঘ নিরেট ছাদের মত ঝুলে আছে। কুয়াশা এ মুহূর্তে নেই, ফলে দিগন্তরেখার মত দূরের উপকূল দেখা যাচ্ছে। চোখে বিনকিউলার লাগাল রানা, খুব সতর্কতার সাথে চোখ বোলাল দিগন্তে।

তারপর আবার এগোল। কিন্তু পঞ্চাশ গজ যেতে না যেতে উঁচু এক তুষারের টিপির আড়াল থেকে একটা সাদা কাঠামো উঠে দাঁড়াল, হাতে সাব-মেশিনগান রেডি। 'নর্দার্ন,' বলল সে।

'স্টার,' হস্তির সাথে পাসওয়ার্ড আওড়াল রানা।

টিপি ঘুরে এগিয়ে এল কাঠামোটা—পল মিডল্যান্ড। 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, স্যার। কান খাড়া করে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করছে সোহানা। একটু পর আওয়াজটা চিনতে পেরে একটু অস্থির হয়ে উঠল। 'রানা, কণ্টার!'

মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল সবাই। আওয়াজ আসছে, কিন্তু মেঘের জন্যে দেখা যাচ্ছে না ওটাকে। 'টহল দিচ্ছে মনে হয়,' বিভ্রিভ করে

মস্তব্য করল ও। পলের দিকে ফিরল। 'কোন সমস্যা হয়নি তো?'

'নো প্রবলেম।'

'আর সবাইকে দেখছি না কেন?'

'এই খোলা জায়গায় বসে থাকতে গিয়ে নিজেদেরকে ইগলু ছাড়া ব্লাডি এক্সিমো মনে হচ্ছিল বলে পাহাড়ের দিকে গেছে অন্যরা।'

'ঠিক আছে। পথ দেখাও।'

বেশ খানিকটা পথ ঢাল বেয়ে উঠে স্কি দাঁড় করাল মিলার। তার দেবদেবি অন্যরাও দাঁড়িয়ে পড়ল। রানার আলটিমিটারের কাঁটা দুশো মিটারের কাছে তিরতির করে কাপছে। বাকি কয়েক গজ হেঁটে এগোল দল। সামনে টেন্ট শীটের ছাদওয়ালা কয়েকটা লো শেল্টার দেখা গেল। তার একটা থেকে বেরিয়ে এল স্মিথ হাওয়ার্ড। পারকা-র হুডের ভেতরে দাঁত দেখা গেল তার।

'বাকহার্ডকে বোডার সাথে কথা বলার নির্দেশ দিল রানা। দু'দল মিলিত হতে পেরেছে, খবরটা শুনেদেরকে জানাবার কথা আছে। বিশ মিনিট একনাগাড়ে চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিল বাকহার্ড। হতাশ ভঙ্গিতে শ্রাণ করল।

'পারছি না, স্যার। লাইনে ভীষণ ইন্টারফিয়ারেন্স চলছে। আবার চেষ্টা করে দেখব?'

'না, থাকুক, মাথা নাড়ল রানা। 'পরে দেখা যাবে। নেব্রট চেকপয়েন্টে। উঠে পড়ো সবাই।'

এবার পথ দেখানোর দায়িত্ব পড়ল পল মিডল্যান্ডের ওপর। ছয় কিলোমিটার দূরের ভ্যান মিয়েনফিওর্ডের দিকে রওনা হলো দল। বিশাল এক গ্রেশিয়াল অ্যালি অতিভ্রম করে ট্র্যাপারস' হাটের কাছে পৌঁছতে তিন ঘন্টা লাগল। সেই মুহূর্তে আবার কন্টারের আওয়াজ শোনা গেল কাছেই কোথাও। এবার ঘন কুয়াশার জন্যে দেখা গেল না ওটাকে।

'হাট কতদূরে?' জানতে চাইল রানা।

'এই তো, পাঁচ-ছয়শো গজ?' পল মিডল্যান্ড বলল। 'এখন খুব সতর্ক হয়ে এগোতে হবে। রুশ গার্ডরা এখনও ওটার পাহারায় থাকতে পারে।'

বহুগুণ সতর্কতার সাথে এগোল এবার দলটা। কুয়াশা খুব ঘন এখানটায়, পঞ্চাশ গজের ওপাশে কিছু দেখার উপায় নেই। হাটের একশো গজের মধ্যে এসে থামল রানা, মুকামিনয়ের মাধ্যমে সঙ্গীদের অপেক্ষা করতে বলে একা চলল পলের সাথে। কিছুদূর যেতে দুষ্টিসীমা বেড়ে আশি গজে দাঁড়াল, তারপর একশো।

ঘরটা হঠাৎ করেই চোখে পড়ল রানার। ধপধপে সাদার রাজ্যে গাঢ় বাদামী রঙের কাঠামো। উল্টো ভি-এর মত ছাদে পুরু বরফের স্তর। গজ পঞ্চাশেক নিচের এক ভ্যালিতে ওটা। বুকে হেঁটে সন্তর্পণে এগোল এবার ওরা। একটা পাথরের আড়ালে পৌঁছে কচ্ছপের মত থলা বাড়িয়ে উঁকি দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল।

ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে এক রাশিয়ান সৈন্য, হাতে এক জোড়া স্কি। ওগুলো পরে নিল সে কটপটি, উল্টোদিকে রওনা হয়ে গেল। রানা ও পল, যে যার বিনকিউলারের সাহায্যে তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে। এক সময় ছোট

হতে হতে প্রায় বিন্দুতে পরিণত হলো লোকটা, উঁচু এক বরফের টিপিরা কাছে থামল। আরও দুই বিন্দু ওটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, কাছাকাছি হলো। খুব সন্দেহ আলোচনা করছে কিছু নিরে।

দশ

মারমানস্ক থেকে অ্যানালাইজড হয়ে আসা এরিয়েল রিকনাইসল রিপোর্ট বুধবার শেষ বিকেলে ম্যাকারভের হাতে এল। সে তখন ব্যারেন্টসবার্গে নিজেদের হেলিকপ্টার বেজে। জায়গাটা স্পিটসবার্গেন থেকে একটু দূরে হিরোডেন নামের এক পাহাড়ে।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে লংইয়ারবিয়ন এয়ারফিল্ড ও প্রাটা বেরগেটের রাডার, দুটোই দেখা যায় বিনকিউলারে। ইসফিওর্ড রেডিও স্টেশনও কাছে, মাত্র পনেরো কিলোমিটার দূরে। ব্যারেন্টসবার্গও নরওয়ের, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দু'দেশের সম্পর্ক যখন বন্ধনুপূর্ণ ছিল, তখন এখানে ছোট এক কন্টার বেজ চালু করে মস্কো। '৭৮ সালে নরওয়ের অনুমতির তোয়াক্কা না রেখেই সেটাকে বড় করে তারা।

সব সময় বিশটা কন্টার মজুত থাকে এখানে। এই ধরনের বিশেষ সিস্ট্রেশন মোকাবিলার জন্যেই চালু করা হয়েছে এই বেজ।

রিপোর্টটা পড়ল ম্যাকারভ, তারপর দেয়ালে ঝোলানো ম্যাপের কাছে এসে দাঁড়াল। ওটার বড়বড় অনুযায়ী লাল টোপের পরানো পিন দিয়ে কিছ কিছু জায়গায় চিহ্ন দিল। 'একটা গ্রুপ নেমেছে উপকূলে,' কাছে দাঁড়ানো এক স্পেসনাজ ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে বলল সে। 'এখানে আছে একটা সাপোর্ট শিপ। উপকূল থেকে চোদ কিলোমিটার দূরে। এখানে আছে একটা প্রাটিন আকারের রেইডিং পার্টি, উত্তরে যাচ্ছে। আনুমানিক বিশজন। কোন ভেহিকেল নেই।'

'ওরা কমান্ডো-টাইপ রেইড করতে এসেছে!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল স্পেসনাজ ক্যাপ্টেন।

মাথা দোলাল কর্নেল। 'এক্সপার্টদের সেরকমই ধারণা। এখানে দেখা যাচ্ছে বড় একদল...খুব সন্দেহ রেইনডিয়ার, আর এখানে এরা আমাদের বর্ডার পুলিশ।'

পাশের রুম থেকে এক তরুণ কমিউনিকেশন ম্যান এসে দাঁড়াল ম্যাকারভের পাশে। 'আমাদের নেতি ওই শিপটাকে ইন্টারসেপ্ট করতে যাচ্ছে, স্যার,' বলল সে স্যালুট করে।

'হুম!' ট্র্যাপারস' হাটের স্পেসনাজ পার্টনের সরিয়ে এনে ওখানে বর্ডার পুলিশ মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিল ম্যাকারভ। স্পেসনাজদের অন্য কাজে লাগাতে হবে খুব শীঘ্রি।

ব্রাসেলস্। রাত আটটা।

পালাও, রানা

ভয়ে ভেতরে ভেতরে কাঁপছে সান্ধ্য। ভাবছে, শেষ হয়ে গেছে সে। ভবিষ্যৎ তো গেছেই, এখন স্পাইন্ডের অভিযোগে বিচারে প্রাণটাও যাবে।

আজকের দিনটা ফিলপটের কাছে জবাবদিহি করেই কেটেছে তার। লোকটা প্রায় নির্ভুলভাবে প্রশংসা করে দিয়েছে এরিক ব্রাউনের সত্যিকার পরিচয়। পূর্ব জার্মান এয়ার ফোর্সের পাইলট ছিল সে কয়েক বছর আগে। পরে স্টাসিতে যোগ দিয়েছে। তার নামে পশ্চিম জার্মান পুলিশের কাছে যে মোটা ফাইল আছে, তার প্রায় পুরোটাই ফ্যান্স কপিও দেখিয়েছে তাকে ফিলপট। আগেরদিন লন্ডনে বসে ওগুলো সংগ্রহ করেছে সে।

সেই থেকে ভেতরে ভেতরে মরে গেছে সান্ধ্য। সমস্ত স্বপ্ন একদম ধুয়েমুছে গেছে চোখের পানিতে।

ঠিক আটটার পরপর তিনবার ডোরবেল বেজে উঠতে চোখ মুছে উঠল সে। এরিক এসেছে। ঠিক সময়মতই। দরজা খুলে দিল সান্ধ্য।

'ওহ, কী একখানা দিন গেল!' ভেতরে ঢুকে বলল এরিক। কোটটা খুলে ছুঁড়ে দিল একটা চেয়ারের দিকে। সে পর্যন্ত পৌঁছল না ওটা, হাতখানেক সামনে মেঝেতে পড়ল, কিন্তু তুলে রাখার গরজ দেখা গেল না তার মধ্যে। চিন্তায় আছে। স্বাভাবিক। ডিয়েট্রিচ জানিয়েছে, মিউনিখ পুলিশ তার ব্যাপারে গতকাল থেকে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে।

তাই নিয়ে সারাদিন দুশ্চিন্তায় ছিল সে, আর ভাল লাগছে না। এখন খেয়েদেয়ে লম্বা একটা ঘুম...সান্ধ্যর ওপর চোখ পড়তে সচকিত হলো। 'কি হয়েছে, ডার্লিং?'

একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল সে, চোখাচোখি হতে মাথা নাড়ল, কান্না চাপল অনেক কষ্টে। 'কিছু না।'

'আহা, বলবে তো!' মেজাজ তিরিফি হয়ে উঠল এরিকের। 'এমনিতেই চিন্তায় আছি, তার মধ্যে এসব ন্যাকামো...'

'কিসের এত চিন্তা?' শান্ত গলায় বলল সান্ধ্য। 'কোন চিন্তা, নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। একটা কথা বলো, ডার্লিং, ডিপিসির মীটিঙের দিন কোথায় রাত কাটিয়েছ তুমি?'

থতমত খেয়ে গেল সে। 'কি!'

'স্টাসির চাকরি করছ কতদিন থেকে?'

এবার শ্রেফ হী হয়ে গেল এরিক, আমতা আমতা করতে লাগল।

'মিস্টার ফিলপট!' উঁচু গলায় ডাকল সান্ধ্য। চমকে উঠল এরিক, বেডরুমে কয়েকটা ছায়ার নড়াচড়া দেখে ঘুরেই দৌড় দিল। কিন্তু দরজার বাইরে নতুন চমক অপেক্ষা করছিল-চার বিখালদেহী পুলিশ পুরো দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলেন জেনারেল স্যান্ডারসন ও ফিলপট। হাতকড়া পরিয়ে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো এদিককে। জানালার পর্দা সরিয়ে পানিতরা চোখে গোটা দৃশ্যটা দেখল সান্ধ্য, তারপর দৃঢ় পায়ে বাধরুমে গিয়ে ঢুকল। পরদিন দুপুরে বাথটাবে মৃত পাওয়া গেল তাকে।

বা হাতের কবজির রগ কেটে আত্মহত্যা করেছে মেয়েটা। টকটকে লাল হয়ে আছে বাথটাবের পানি।

জোর করে চোখ মেলল ওয়েস্টন, মাথা ঝাড়া দিয়ে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করল। হাতের তালু দিয়ে হুইলহাউসের বাপসা কাঁচে ডলা দিল সে, একটা অর্ধবৃত্ত একে তার ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল। তুঘারপাত হচ্ছে।

ঘড়িতে চোখ বুলাতে গিয়ে মেজাজ বিগড়ে গেল। পাঁচটা বাইশ মিনিট। অর্থাৎ এখন ভোর, এবং বৃহস্পতিবার। অর্থাৎ নতুন দিন। খুব ধীর গতিতে ভেসে চলেছে নর্দার্ন লাইট, এঞ্জিন অফ, রাডারও অফ। অন্যরা নিচে ঘুমাচ্ছে। নাস্তা খেয়ে ভাল ফেলার কথা ওদের।

ফ্রান্স থেকে এক কাপ কফি ঢেলে নিয়ে চুমুক দিল ওয়েস্টন। এখানে তাদের কি কাজ, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে বসল। কাছের ইসফিওর্ড রাডার সাইটের কথা ভাবল। ওখানে রুশদের লং রেঞ্জ রাডার স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে। প্রাথমিক নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। বিশাল কারবার। কাজ শেষ হলে জাহাজে করে মারমানক থেকে আসবে রাডারের যন্ত্রপাতি। ওয়েস্টন শুনেছে অ্যাসেম্বলিঙের পর জিনিসটার উচ্চতা দাঁড়াবে প্রায় দশতলা এক বিল্ডিংয়ের মত।

জাহাজে আনতে হবে ওটাকে। কারণ ওই রাডারের স্ক্যানার এতই বড় যে কোনমতেই প্লেনে করে আনা সম্ভব নয়। যত বড় প্লেনই হোক।

মুচকে হাসল ওয়েস্টন। আসলে কোনদিনই আসবে না ওটা। কেননা মেজর মাসুদ রানার মিশন সফল হওয়া মাত্র গোটা এলাকায় টোটাল ব্লকেড ঘোষণা করতে যাচ্ছে ন্যাটো। আকাশ, সাগর সব সীল করে দেয়া হবে। কোন রুশ জাহাজ বা প্লেন এই এলাকার ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারবে না।

সচকিত হলো ওয়েস্টন, ইকোসাউন্ডার অন করল। একটা আঁকাবঁকা লাইন আঁকা হতে লাগল কাগজে। ত্রিশ ফুট পানিতে আছে এখন নর্দার্ন লাইট। ম্যাপ দেখল সে। মাছের খোঁজে যেদিকে যাওয়ার ইচ্ছে পলসেনের, সেদিকেই ভেসে চলেছে ট্রলার। রাডার অন করল, সঙ্গে সঙ্গে ফোটা দুটো চোখে পড়ল-একটা ছোট, একটা বড়। ক্যাথোড স্ক্রীনের বারটার প্রতি চক্করের সাথে একটু একটু করে বড় হচ্ছে ও দুটো।

বিপদ।

রাডারে জাহাজের আকৃতি বোঝা যায়, পরিচয় জানা যায় না। তবে ওয়েস্টন নিশ্চিত ওগুলো রুশ, এবং ওদের দিকেই আসছে। তাড়াহাড়ি সঙ্গীদের ঘুম ভাঙাল ওয়েস্টন। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। পালাবার চেষ্টা করলে বিপদ হবে, কাজেই ঠিক হলো যেসব জিনিস দেখলে ব্যাটারদের সন্দেহ হবে, সেগুলো পানিতে ফেলে দেয়া হবে। হুড়োহুড়ি করে তাই করল ওরা।

কিন্তু কাজ পুরোটা শেষ হওয়ার আগেই এনে পড়ল বড় ফোটাটা-আন্ত এক রুশ ডেস্ট্রয়ার। শিপটা চোখে পড়ার আগেই ওটার ডেকিলেশন মেশিনারির ভুতুড়ে আওয়াজ উঠল। পুরো খেমে থাকলেও সন্দেহ করবে ওরা, তাই তাড়াহাড়ি নর্দার্ন লাইটের এঞ্জিন স্টার্ট দিল পলসেন। সবাই মিলে ফোরডেকে

শুটিয়ে রাখা জাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, যেন এখনই ফেলবে। মনে মনে প্রমাদ গুণছে সবাই। ওরা যদি শিপে ওঠে, তাহলে বিপদ। আর যা-ই হোক, অন্তত ফলস্ হোল্ডটা লুকিয়ে রাখার উপায় নেই।

হোল্ডের ভেতরে হোল্ড ওটা। ওপর থেকে তাকালে কেউ ফাঁকটা ধরতে পারবে না, কিন্তু এঞ্জিন রুমের দরজা খুললেই কম সারা।

'বাক্সহেড ডোর আগলে রাখতে হবে কায়দা করে,' ওয়েসটন বলল। 'ওদেরকে যেতে দেয়া যাবে না ওদিকে।'

'চেষ্টা করব,' পলসেন বলল।

তার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, তুমারের পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল উঁচু একটা কাঠামো, ডেস্ট্রয়ারের বো। ফুল অ্যাস্টার্ন দিয়ে পানিতে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা। গ্রেটকোট ও পীকড হ্যাট পরা এক অফিসার এসে দাঁড়াল ব্রিজে, মুখের সামনে লাউডহেইলার ধরে নরওয়েজিয়ান ভাষায় বলল, 'এঞ্জিন অফ করো!'

'কেন?' পাল্টা চেঁচাল পলসেন।

'আমরা তোমার শিপ চেক করব। অফ করো!'

আর কিছু করার নেই, কাজেই এঞ্জিন অফ করে দিল ডিলন। একটা আউটবোর্ডে চড়ে নর্দার্ন লাইটে এসে উঠল রুশরা।

'ক্যাপ্টেন কে?' প্রশ্ন করল সেই অফিসার। এক লেফটেন্যান্ট।

'ও,' পলসেনকে দেখাল ওয়েসটন।

'এই এলাকায় কি করছ তোমরা?' তার দিকে ঘুরে কড়া গলায় জানতে চাইল সে।

'মাছ ধরার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি,' পলসেন বলল। 'কেন?'

'সোয়ালবারের পানি সীমায় এসে পড়েছে তোমরা।'

'এসে আবার পড়লাম কোথায়?' বিস্ময় ফুটল পলসেনের চেহারায়ে। 'এ তো আমারই দেশ।'

চোয়াল দৃঢ় হলো অফিসারের। রেগে উঠছে। 'সব ধরনের শিপকে এই এলাকা থেকে সরে থাকতে আদেশ দেয়া হয়েছে, জানো না? আমরা সার্চ করব এটা।'

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদেরকে বাক্সহেড ডোর থেকে দূরে সরিয়ে রাখার আশ্রয় চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো পলসেন, ফলস্ হোল্ড দেখে ফেলল ব্যাটারী। 'এটা কেন? কি আছে ওর মধ্যে?'

'কিছু না,' বলল সে। 'বিশ্বাস না হয় চেক করে দেখতে পার।'

'তোমাদেরকে তোমাদের শিপসহ অ্যারেস্ট করা হলো,' ঘোষণা করল লেফটেন্যান্ট।

'কি অভিযোগ?'

'সময়মত জানানো হবে।' ওয়াকি-টকির সাহায্যে কারও সাথে কথা বলতে শুরু করল সে।

ঘুম থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে আসুদ রানা। পুরো সচেতন নয়। কিন্তু ওরই

মাঝে কয়েকটা চেহারা আবছা ভাবে চোখের সামনে ভেসে উঠল। কি যেন এক ফিশিং ট্রলারে করে ওর বাহিনীর ডিকয় হিসেবে এসেছে মানুষগুলো।

আরেকটু সচেতন হলো ও। চোখ বুজে ভাবল ভার্জিনিয়া রিজের কথা। ওর সন্দেহ ছিল ওদের মিশনের কথা যে করে হোক, রুশদের কানে পৌঁছবেই। সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিতে তৎপর হয়ে উঠবে তারা। তখন এই ডিকয় ওকে সাহায্য করবে। ও হ্যা, নর্দার্ন লাইট ওটার নাম। ওই ট্রলার খোলামেলা এগোবে বলে ওটার ওপরেই সন্দেহ পড়বে রুশদের, তা জেনেই ওটাকে পাঠানো হয়েছে।

রানা ভাই চেয়েছে। কারণ তাতে ওর সুবিধে। রুশরা ওদের ওপর নজর রাখবে, সেই ফাঁকে অন্য পথে আসবে ও। প্রতিপক্ষ কিছু বুঝে ওটার আগেই ধ্বংস করে দেবে তাদের রাডার। নড়ে উঠল ও, চোখ মেলল ধীরে ধীরে। প্রথম কয়েক মুহূর্ত মনে হলো বৃষ্টি অ্যাভলানশের তলায় জ্যান্ত কবর হয়েছে ওর। এয়ার পকেট আছে বলে বেঁচে আছে অলৌকিক উপায়ে। এখনও মরেনি।

শান্ত থাকো, নিজেকে বলল ও। নোড়ো না, আতঙ্কিত হয়ো না। একই সঙ্গে পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল, স্নো হোলটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল চোখের সামনে। কঠিন বরফের এক শেলফের ওপর শুয়ে আছে রানা, স্ট্রীপিং ব্যাগ আর শেলফের মাঝে রয়েছে একটা পাতলা ম্যাট।

ওর দু'ফুট দূরে একই রকম এক শেলফে অঘোরে ঘুমাচ্ছে সোহানা। দু'জনের মাঝখানে খোঁড়া আছে একটা এবড়োখেবড়ো ট্রেঞ্চ, ঠাণ্ডা বাতাস ধরে রাখার জন্যে। একটা মোমবাতি জ্বলছে, মাথার ওপরের বরফের ছাদ ধীরে ধীরে গলিয়ে একটা খিলানমত তৈরি করছে ওটার সরু শিখা।

শুধু আলো আর উষ্ণতাই দিচ্ছে না ওটা, ছোট একটা গর্ত দিয়ে বাইরে থেকে অক্সিজেনও টেনে আনছে ভেতরে। যতক্ষণ ওটা জ্বলবে, ততক্ষণ দম নেয়ার জন্যে যথেষ্ট অক্সিজেন পাবে রানা-সোহানা।

ঘড়ি দেখল ও। আটটা বেজে আট মিনিট। জিরো এইট জিরো এইট আওয়ার, বৃহস্পতিবার।

উঠতে ইচ্ছে করল না ওর, শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে। গতকালের কথা ভাবল, ট্র্যাপারস' হাট বেহাত হয়ে যাওয়ায় দলকে অকল্পনীয় কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়েছে কাল। নিরাপদ আরেক আশ্রয়ের খোঁজে পুরো আট ঘন্টা অমানুষিক কষ্ট করতে হয়েছে। তারপর উপযুক্ত এক ঢাল পেয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে গর্ত খুঁড়ে। ওদিকে ক্লাস্তিতে নেতিয়ে পড়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত বাকহার্ড চেষ্টা চালিয়ে গেছে বোডোর সাথে যোগাযোগ করার, কাজ হয়নি।

জোর করে উঠে পড়ল রানা, স্ট্রীপিং ব্যাগ থেকে বের করল নিজেকে। পা দুটো যাতে জমে শক্ত হয়ে না যায়, সে জন্যে পলিথিনের ব্যাগে রাখা স্নো শূ বের করে পরে নিল। মাথার মধ্যে ঘুরছে ট্র্যাপারস' হাটের কথা। ওটার ভেতরে গভীর পর্ত করে রাখা ছিল বাড়তি খাবার, অ্যামিউনিশন ইত্যাদি। ওজলো না পাওয়ায় খুব যে ক্ষতি হয়েছে তা নয়, ওসব ছিল অতিরিক্ত।

পাওয়া গেলে প্রয়োজনে সময় বেশি নিয়ে আসল কাজ সারা যেত। কিন্তু এখন সেটা হবে না, এই যা। এখন যা করতে হবে, তা হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে

কাজ সেরে সোজা কেটে পড়া। এমনিতেও অবশ্য তা না করে উপায় নেই এখন, ব্রকেড ঘোষণার সময় কাছিয়ে এসেছে। যে-সময় ওগুলো ট্রাপারস হাতে রাখা হয়, তখন আরও দু'দিন পরে ব্রকেড ঘোষণা করার কথা ছিল। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভালই হয়েছে ওগুলো বেহাত হওয়ায়।

ওহার সাথে ছোট একটা টানেল, টানেলের মাধ্যমে আরেকটা খাড়া টানেল-ভেতরে আসা-যাওয়ার পথ। একটা করে ফোল্ডিং ঢাকনা খাড়া স্কি পোলের মাধ্যমে বসিয়ে বন্ধ করা হয়েছে প্রতিটা গর্তের মুখ। তার আগে ঢাকনার ওপর পুক করে তুষার বিছিয়ে নিতে হয়েছে যাতে বাইরে থেকে সহজে কারও চোখে না পড়ে ব্যাপারটা। ভেতরে নিজেকে তাড়া খাওয়া জন্তুর মত লাগছে রানার। মাথা তুললেই ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারী।

মুদু ঝাঁকি দিয়ে সোহানার ঘুম ভাঙল ও। 'ওঠো। সকাল হয়ে গেছে।'

বুক পর্যন্ত চেইন নামিয়ে ব্যাগের ভেতর থেকে উকি দিল ও, পিটপিট করে তাকাল। 'ক'টা বাজে?'

'সোয়া আটটা,' বলল রানা। 'উঠে পড়ো, আমি অন্যদের খোঁজ নিয়ে আসছি।'

যে কায়দায় ওহামুখ বন্ধ করা হয়, সেটা রিভার্স করে সত্তর্পণে নাক জাগাল ও। নরম, বড় বড় ফেটায় তুষার পড়ছে নাকেমুখে। পড়ই গলে যাচ্ছে। তবে সামনের কয়েকশো গজ স্পষ্ট দেখতে পেল ও। ঢালু হয়ে নেমে গেছে উপত্যকা। সাগর সমতলে দৃষ্টিসীমা কতদূর হতে পারে অনুমান করার চেষ্টা করল ও। ভাল হোক, মন্দ হোক, গত আট ঘণ্টা এখানে ভালই ছিল দল। উপত্যকার অনেক উঁচুতে, মেঘের আড়ালে। এখন এই তুষারপাতও সাহায্য করবে ওদের। ট্র্যাক ঢেকে দেবে।

আন্দাজে হাওয়ার্ড স্মিথ ও পলের ওহা খুঁজে বের করল রানা। ওর সাড়া পেয়ে ওহামুখের খানিকটা তুষার ধসিয়ে বেরিয়ে এল ওরা দুজন।

'নাস্তা খেয়ে নাও,' বলল ও। 'পলের সাথে কথা বলে রুট ঠিক করে নাও।'

'রাইট, মেজর,' তৎক্ষণাৎ রাজি সে।

'আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব আমরা।'

ওহার ফিরে রানা দেখল সোহানা পিচ্চি এক গ্যাস বার্নার জ্বলে তুষার চাপিয়েছে কফি তৈরির জন্যে। 'বাইরে ওয়েদার কেমন, রানা?' ওকে ঢুকতে দেখে জানতে চাইল।

'আমাদের জন্যে মোটামুটি। ওদের জন্যে সুবিধের নয়।'

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে প্রস্তুত হয়ে নিল ওরা, বেরিয়ে পড়ল। 'বাকহাড! আরও ওপরে উঠলে রেডিও ইন্টারফিয়ারেন্স কমবে মনে হয়?' প্রশ্ন করল রানা।

'না, স্যার!' বলল সে। 'খুব একটা কমবে না, এইচ এফ-এ এরকমই থাকবে। তবে ওয়েদার ভাল হলে কমার চান্স আছে। এখন একবার চেষ্টা করে দেখব, স্যার?'

'দেখো।'

একই ফল হলো এবারও, আধঘণ্টা চেষ্টার ফল শূন্য। কোডেড মেসেজ

আগের দিন থেকেই সেটের স্টোরে জমা করা ছিল, অ্যান্টেনা সেট করে শুধু ট্রান্সমিটার বাটন টিপে দিয়ে জবাবের জন্যে অপেক্ষায় থাকল সে। এল না জবাব। ঘিরে দাঁড়ানো সবাইকে দেখে নিল এবার রানা।

'পরিস্থিতি সম্পর্কে কাউকে নতুন করে কিছু বলার দরকার নেই,' বলল ও। 'তবু বলছি, আমাদের কাছেপিঠেই শত্রুর টহল বাহিনী রয়েছে। ওয়েদারের সুযোগ নিয়ে ওদেরকে ফাঁকি দিতে হবে আমাদের। মনে রাখবে, এই ফাঁকি দেয়াটাও আমাদের ক্রটিন কাজ।'

একটু বিরতি দিয়ে আরেকবার মুখগুলো দেখে নিল ও। 'কমিউনিকেশন সিস্টেম নিয়ে কিছুটা সমস্যায় আছি আমরা এ মুহূর্তে। তবে সেটা একেবারেই সাময়িক। আমাদের উইথড্রল কো-অর্ডিনেটের ক্ষেত্রে ওটা কোন সমস্যা হবে না, কেননা তখন আমরা ভিএইচএফ সেট ব্যবহার করব। ঠিক, বাকহাড?'

'অল দ্য ওয়ে, স্যার!' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

'এখন, আগামীকাল সন্দের মধ্যে ফাইনাল লেইং-আপ পয়েন্টে পৌঁছতে হবে আমাদেরকে, যে কোন মূল্যে। যাতে পরদিন ভোরের মধ্যে রাডার ধ্বংস করে দেয়া যায়। ঠিক, সূর্যাস্তের সময় হামলা চালাব আমরা, সত্যি সত্যি সূর্য উঠুক বা না-ই উঠুক। সে জন্যে সময় আছে ছত্রিশ ঘণ্টারও কম। এর মধ্যে অন্তত পঞ্চাশটা হ্যালি ও পাস অতিক্রম করতে হবে আমাদেরকে, কাজেই সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথে যাব আমরা।'

অপেক্ষমাণ মুখগুলোর ওপর নজর বোলাল রানা। এরমধ্যে সবার চেহারায় দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তি ফুটে উঠেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তীক্ষ্ণ ছুরির মত ধারাল ঠাণ্ডা বাতাসের কামড়ে হতচ্ছাড়া চেহারা হয়েছে। আর দু'দিন পর মনে হবে পরনের সবকিছু বুঝি জীবনভর পরে আছে ওরা। ঘামের দুর্গন্ধে ভুতও পালাবার পথ খুঁজবে।

'দুর্গম জায়গায় আমাদের চলা একটু বীর হবে,' আবার শুরু করল ও। 'কয়েক ঘণ্টা পর পর পয়েন্ট ম্যান বদল করব আমি। প্রথম পয়েন্ট ম্যান হবে পল, তারপর মিলার, এইভাবে চলবে। স্মিথ নেভিগেট করবে আপাতত। শত্রুর সাথে দেখা হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি না, কিন্তু যদি হয়, 'থমে শ্রাগ করল। 'কি করতে হবে তোমাদের জানা আছে। ব্যাড ভিজিবিবিলিটির জন্যে পরস্পরের খুব কাছাকাছি থাকতে হবে আমাদেরকে। দুই থেকে তিন মিটারের মধ্যে।'

এরপর কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ও সিগনাল সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করল রানা। সবশেষে প্রাস্টিক কোডেড ম্যাপ তুষারে বিছিয়ে কোন রুট ধরে এগোবে, দেখিয়ে দিল।

কাজ শেষ হতে ওটা ভাঁজ করে পারকার ভেতরে, বুকের কাছে রাখল ও। 'বাকহাড?'

'নেগেটিভ, স্যার।'

'ওকে, সেট প্যাক করো,' মনে মনে উদ্বিগ্ন হলেও চেপে রাখল রানা। 'আরেকটা কথা, সবাই এক ট্র্যাকের ওপর দিয়ে চলবে। দ্বিতীয় কোন ট্র্যাক চাই না। লেট'স মুভ।'

সাতটা ভৌতিক কাঠামো এক সারিতে দাঁড়াল ছয় ফুট পরপর। রানা সবার পিছনে। সোহানা ওর আগে। 'রেডি' বলল হাওয়ার্ড শ্বিথ, স্টিক চালাল। ছিটকে উঠল তুঘার, চলতে শুরু করল লাইন।

দেখতে দেখতে মেঘ আর তুঘার বৃষ্টির মধ্যে মিলিয়ে গেল কাঠামোগুলো।

নরফোক, ভার্জিনিয়া।

SACLANT অ্যাডমিরাল কিঙের অপারেশনস রুমে গোটা পূর্ব আটলান্টিক ও আর্কটিক পরিস্থিতি ডিসপ্রে করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও নরওয়ের ন্যাটো প্রতিনিধি আছেন সেখানে। আর আছেন বিসিআই প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। একটু উদ্ভিগ্ন।

সোয়ালবার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স সূত্র মারফত যত খবর পাওয়া গেছে, তার সব একত্রিত করে একদিকের দেয়ালজোড়া বিশাল ম্যাপের গায়ে ছোট ছোট আলোর সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা আছে। সোভিয়েত নর্দান ফ্রীটের কোন জাহাজ এ মুহূর্তে কোথায় আছে, তা পরিষ্কার দেখানো হয়েছে ওখানে, তার সাথে ন্যাটো টাস্ক ফোর্সের সমস্ত শিপের অবস্থানও।

উত্তরে আর্কটিক আইস প্যাক, পশ্চিমে গ্রীনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড এবং পূর্বে সোভিয়েত দ্বীপ নোভাইয়া জেমলাইয়া পর্যন্ত বিশাল এলাকা আক্ষরিক অর্ধে ঘেরাও করে রেখেছে ন্যাটোর টাস্ক ফোর্স। ওদিকে আর্চঅ্যাক্সেল বা আরখানজেলস্কাই এবং কোলা পেনিনসুলায় এ মুহূর্তে মজুত ৩৫০ রুশ কমব্যাট প্রেনের মোকাবিলা করার জন্যে আইসল্যান্ডের মার্কিন এয়ারবেস ও স্কটল্যান্ডের আর এ এফ বেসে ৬০০ কমব্যাট প্রেন রেডি।

ওদিকে পল মিডল্যান্ডের সাথে মাসুদ রানার সাক্ষাৎ হয়েছে। ওদের আসল অস্ত্র-ড্রাগন মিসাইল লঞ্চার। ওজন সমস্যার জন্যে ওগুলো ক্রিসফোর্ডের দায়িত্বে পাঠিয়েছে রানা। কথা ছিল পথে সমস্যা বুঝলে ওগুলো সাপরে ফেলে দিয়ে রানাকে ডিসট্রেন্স সিগন্যাল পাঠাবে সে। তাহলে ও বিকল্প ব্যবস্থা নেবে।

কিন্তু সিগন্যাল পাঠায়নি মেজর। অর্থাৎ ওগুলো নিয়ে নিরাপদেই পৌঁছেছে সে জায়গামত। কিন্তু...ঘড়ি দেখলেন অ্যাডমিরাল কিং।

নরফোকে এখন বাজে ৮.৫৮ ঘণ্টা, সোয়ালবারে ১৪.৫৮ ঘণ্টা। এখানেও বৃহস্পতিবার সকাল এখন। অ্যাডমিরাল কিং ও ভাইস অ্যাডমিরাল শিপলেক ভেতরে ভেতরে জীষণ অস্থির। তাদের দুশ্চিন্তার কারণ রুশ সাবমেরিন। গ্রীনল্যান্ডের পূর্বে লিনা ট্রাফ নামে একটা এলাকা আছে সাগরে, পানি অনেক গভীর সেখানে। নরওয়ের উপকূলে ন্যাটোর যে সীবেড সেক্সর পাতা আছে, তার আয়ত্তের বাইরে। অথচ জায়গাটা ন্যাটোর মেইন ফোর্সের পিছনে।

এই ট্রাফ রুশ সাবমেরিনের সর্প পোলে বাওয়ার অন্যতম সূত্র। কিন্তু ওই এলাকা মার্কিন বা ন্যাটোর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ওখানে এ মুহূর্তে প্যাক আইসের নিচে কি ধরনের সোভিয়েত সাবমেরিন ওর পেতে আছে, কেউ জানে না। সেটাই তাদের দুশ্চিন্তা আর গভীর উদ্বেগের কারণ।

চুক্তি ধরিয়ে ঘন ঘন টানছেন কিং, নজর ম্যাপে, নরওয়ের পাঁচটা ফ্রিগেট ও

তিনটে করভেটের ওপর। ওগুলো আলাদা অবস্থানে রয়েছে। তবে একটা রয়েছে ন্যাটোর স্ট্যান্ডিং ফোর্সের সঙ্গে।

ব্রাসেলসের ঘটনা শুনে হতভম্ব তিনি, রীতিমত অশ্রদ্ধা এসে গেছে ইংরেজ জাতীয় ওপরে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, এত সতর্কতা অবলম্বনের পরও দুই পরসার এক ইংরেজ সেক্রেটারি বারোটো রাজিয়ে দিয়েছে মাসুদ রানার ক্র্যাভেস্টাইন মিশনের।

যত বিশ্বাসঘাতক সব ইংরেজদের মধ্যেই জন্মায় কেন? তিক্ত মনে ভাবছেন তিনি। ফিলবি, ব্রেক, ব্রান্ট, তারপর এই এক হারামজাদী, ওহ গড!

'কুস্তাটা ডুবিয়েছে আমাদেরকে,' বন্ধু ও ডেপুটি শিপলেকের উদ্দেশে বললেন তিনি। 'নর্দান লাইট ধরা পড়েছে। এবার দলবলসহ মাসুদ রানার পালা। ওদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের। খুব তাড়াতাড়ি।'

তার মনের অবস্থা বুঝতে একটুও সমস্যা হলো না ভাইস অ্যাডমিরালের। রাহাত খানকে আড়চোখে দেখে নিয়ে বললেন, 'এই মুহূর্তে সেটা কি ঠিক হবে? মাসুদ রানার ওপর পূর্ণ আস্থা আছে আমার। ও শেষ পর্যন্ত...'

'বুঝি নেয়ারও একটা সীমা থাকে, শিপলেক,' বাধা দিয়ে বললেন কিং। 'সব জেনেওনেও কোন ভরসায় এতগুলো মানুষের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকি? মাসুদ রানা কাজ শেষ করে আসতে পারবে, সে ভবসা আমারও আছে। কিন্তু যদি না পারে?'

ঘুরে রাহাত খানকে দেখলেন অ্যাডমিরাল। 'আমি ভার্জিনিয়া রিজ মিশন ক্যানসেল করতে যাচ্ছি, খান। তোমার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে।'

'আমার মনে হয় তোমার সিদ্ধান্তই ঠিক,' বললেন রাহাত খান। 'আমরা সাহায্য করছিলাম আর একটা বিশ্বযুদ্ধ যাতে বেধে না যায়, সেজন্যে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বৈরী। ওদেরকে আর এগোতে দেয়া সত্যিই বোকামি হবে।'

ব্যক্তিগত এইডের দিকে ফিরলেন এবার কিং। 'কমান্ডার, যে কোন একটা ডেস্ট্রয়ারকে ওদের তুলে আনার নির্দেশ দিন,' নরওয়েজিয়ান প্রতিনিধির চেহারায় তীব্র হতাশা দেখেও না দেখার ভান করলেন তিনি। দৃঢ় গলায় যোগ করলেন। 'আমি ব্যক্তিগতভাবে এই নির্দেশ দিচ্ছি। আই সেন্ট দেম ইন, অ্যান্ড আই উইল ড্যাম ওয়েল গেট দেম আউট রাইট নাই।'

রাহাত খানের চেহারা থেকে উদ্বেগের ছায়া দ্রুত কেটে গেল। ওদিকে নরওয়ের প্রতিনিধির ক্ষেত্রে ঘটল উল্টোটা। ট্রুমসোয় বিশটা সী কিং রেডি আছে তাদের, আর আছে চারশো হাইলি ট্রেন্ড আধা কমান্ডো বাহিনী ফলশ্রিময়েগার।

ভার্জিনিয়া রিজের মিশনের সাফল্যের খবর প্রচার হওয়ামাত্র তাদেরকে নিয়ে ঝড়ের গতিতে লংইয়ারবিয়ন গিয়ে হাজির হওয়ার কথা ছিল ওগুলোর। কশর ভাঙমত কিছু বুঝে ওঠার আগেই এয়ারফিল্ড দখল করে নেয়ার কথা ছিল। গেল সব।

'মনে হচ্ছে পাসে পৌঁছে গিরেছি আমরা,' চাপা, উত্তেজিত গলায় বলল পল মিডল্যান্ড, পয়েন্টম্যান।

প্রায় সবাই টের পেল ব্যাপারটা, কেননা স্কি বাধাহীনভাবে গড়াচ্ছে এখন। আন্টিমিটারে চোখ বোলাল রানা-৭৪০ মিটার। তার মানে পর্বতশ্রেণীর ফাটলের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা, যেটা কলেসডালেনের দিকে গেছে।

'বিশ্রাম নেয়া যাক কিছুক্ষণ,' বলল রানা। এগিয়ে এসে নরওয়েজিয়ানের পাশে দাঁড়াল। তুম্বার পড়া খেমে গেছে কয়েক ঘণ্টা আগে। আকাশ উজ্জ্বল, তবে অস্পষ্ট। সূর্যের দেখা নেই।

অবাক হয়ে সামনে তাকিয়ে আছে প্রত্যেকে। নাক বরাবর সামনে দাঁড়িয়ে আছে বরফমোড়া বিশাল এক পাহাড়। বরফের আড়াল থেকে জায়গায় জায়গায় কালচে, এবড়োখেবড়ো পাথরের দেয়াল বেরিয়ে আছে। পাহাড়টার চূড়া দেখা যায় না, মেঘের আড়ালে।

'ওটার ওপাশে প্রাচীর বেরগেট,' ঘোষণা করল পল মিডল্যান্ড।

যদিও বলার প্রয়োজন ছিল না, ম্যাপ দেখতে দেখতে ওসব মুখস্থ হয়ে গেছে প্রত্যেকের। প্রাচীর বেরগেটের সমতল মাথা ছাড়িয়ে আরও দেড় হাজার ফুট উঠে গেছে এপাশের চূড়াটা। পাশেই আছে একটা 'ইউ' আকৃতির গ্লেশিয়ার, যার এক বাহু চলে গেছে নিচের লংইয়ারবিয়েন উপত্যকার দিকে।

'একবার গ্লেশিয়ারে পৌঁছতে পারলে হলো,' পল মিডল্যান্ড বলল। 'আর কোন সমস্যা হবে না।'

অনেক দূরে কন্টারের আওয়াজ উঠতে সতর্ক হয়ে উঠল রানা। 'চৌচৌ উঠল, 'পিছনে চলো সবাই! মেঘের নিচে!'

সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল দলটা, তুম্বার ছিটিয়ে ফেলে আসা পথ ধরে ছুটল। বেশিদূর যেতে হলো না, গজ পঞ্চাশেক যেতেই আড়াল পাওয়া গেল। বেশি ঘন মেঘ নয়, তবে ওদেরকে আড়াল করে রাখার জন্যে যথেষ্ট।

রাতের জন্যে ওখানেই আশ্রয় নেবে সিদ্ধান্ত নিল রানা।

লংইয়ারবিয়েন হারবারের এক ইনার মুরিঙে বেঁধে রাখা নর্দার্ন লাইটে এসে উঠল কর্নেল ম্যাকারভ। দুই বর্ডার পুলিশ ওটার পাহারায় ছিল, তাকে দেখে কড়া স্যালুট করল লোক দুটো। মাথা নেড়ে কেবিনের দিকে এগোল সে। এখনও ওটার মাস্টে নরওয়ের পতাকা টাঙানো রয়েছে।

তার ডাকে ছুম ভেঙে গেল ওয়েস্টনের। 'আবার কি?' হাই তুলে নরওয়েজিয়ানে প্রশ্ন করল সে।

'হোল্ড দেখতে এসেছি,' ম্যাকারভ গম্ভীর।

'ওহ, গড! আবার?' বাক্স থেকে নামল সে। 'আর কতক্ষণ এখানে আটকে রাখা হবে আমাদেরকে?'

কর্নেলের গাঙ্গীর্যে ফাটল ধরল। হাসল সে। 'যতক্ষণ না নেভি এসে পৌঁছায়।'

এরকম দুইদিক ধারণালা মন্তব্য শুনে সতর্ক হয়ে গেল ওয়েস্টন। কোন নেভির কথা বলছে ব্যাটা? ভাবল সে, নরওয়ের?

তার অবস্থা বুঝতে পেরে আবার হাসল ম্যাকারভ। 'এবার আমার একটা

প্রশ্নের উত্তর দাও, ভায়া। কতজনকে তীরে নামিয়েছে?'

মানুষটার চোখে কৌতুক দেখল ওয়েস্টন। ম্যাকারভ যে তার সম্পর্কে সবকিছুই জানে, সে সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তার। নাম, ব্যাক, নর্দার্ন লাইটে কোথেকে উঠেছে সে, ওটার মালিক কে, কোনকিছুই জানতে বাকি নেই তার। ভার্জিনিয়া রিজ মিশনের দুঃসাহসিক অভিযানের ব্যাপারে সে এমন কি শ্রদ্ধাশীলও।

'বলেছি তো আমরা মাস ধরতে এসেছি,' ওয়েস্টন বলল।

'অথচ ধরা পড়েছ অন্য অভিযোগে, তাই না?'

'সেটা যে কি তাই তো এখনও জানতে পারিনি।'

'নেভার মাইন্ড, ক্যাপ্টেন,' মাথা ঝাঁকাল ম্যাকারভ। 'আমরাও যে-কোন সময় এমন পরিস্থিতিতে পড়তে পারি।'

ফলস হোল্ড পরীক্ষা করে মাথা ঝাঁকাল সে। 'ওকে, থ্যাঙ্কস এনি ওয়ে।'

ওয়েস্টনের পেট থেকে গলগল কয়েক বের করা যায় কি না ভাবল কিছুক্ষণ ম্যাকারভ। তারপর বাদ দিল সে চিন্তা। সেটা কখনও হবে না। তার মত একজন কমান্ডো অত সহজে মুখ খোলে না।

একটু পর হোল্ড থেকে বেরিয়ে এল ম্যাকারভ। সে নিজে কমান্ডো দলের নেতা হলে কোনদিক থেকে প্রাচীর বেরগেট আক্রমণ করত, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল।

পরবর্তী ফটোগ্রাফিক রিকনাইসন্স রিপোর্টের অপেক্ষায় থাকল অধৈর্য চিন্তে।

এগারো

রোজ সকালে নাস্তার সময়ে আর ঘুমাতে যাওয়ার আগে অসলো রেডিওর খবর মন দিয়ে শোনে অ্যানি। ইসফিওর্ড বা বেলসান্ড স্টেশনের খবর শোনা যায় না ক্রুশদের জ্যামিং-এর কারণে।

এতদিন অসলোর খবর তবু কিছুটা শোনা যেত, গত তিনদিন থেকে তাও আর ঠিকমত শোনা যাচ্ছে না। খবরের মাঝখানে বারবার বাধা দেয়া হয়। অবশ্য আজকের রাতের খবরে বাধা দেয়া হচ্ছে না। বিস্মিত হলো সে ব্যাপারটা লক্ষ করে, মন দিয়ে খবর শুনতে লাগল। এক পাঠিকা একঘেয়ে কণ্ঠে পড়ছে:

'নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ঘোষণা করেছে যে আজ মধ্যরাত থেকে সোয়ালবারের চতুর্দিকে কঠোর নেভাল ব্লকেড ঘোষণা করা হবে। বিচার মন্ত্রণালয় জনসাধারণকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানিয়েছে। একই সাথে... বিচ্ছিন্ন শৌ শৌ করে উঠল রেডিও, আর কিছু শোনা গেল না।

কিন্তু জাতে কিছু আসল-গেল না অ্যানির, 'জাস্টিস মিনিস্ট্রি' শব্দ দুটো শুনে চাইছিল সে। ওর মধ্যে তার জন্যে বিশেষ এক বার্তা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের গোপন রেডিও সেটের মাধ্যমে মোর্স সঙ্কেত ট্যাপ করতে লাগল সে,

কন্ট্রোলারকে জানিয়ে দিল 'সে শুনেছে'।

দু'মিনিট পর সাড়া দিল কন্ট্রোলার: অ্যাকটিভেট উলফহাউন্ড টু অর্গানাইজ সিভিল ডিস্টার্বেন্স। টপ প্রায়োরিটি কীপ রাশিয়ান পুলিশ অকুপাইড নেত্র ৪৮ আওয়ারস।

কাগজটা পুড়িয়ে ছাই কমোডে ফেলে ফ্লাশ করে দিল মেয়েটা, তখনই বেরিয়ে পড়ল উলফহাউন্ডের গলার শেকল খুলে দিতে।

গত দু'সপ্তাহ থেকে সুকৌশলে স্থানীয় নরওয়েজিয়ান বনি শ্রমিক নেতাদের সাথে গোপন বৈঠক চালিয়ে আসছে সে। দেশের স্বার্থে, স্বাধীনতা রক্ষার স্বার্থে তাদের সাহায্য যে-কোন মুহূর্তে প্রয়োজন হবে, জানানো আছে সবাইকে।

ভারিও প্রস্তুত।

নাশ্তা খাওয়ার সময় রেইডিং পার্টিকে কি ভাবে ফাঁদে ফেলা যায়, তাই নিয়ে নতুন করে মাথা ঘামাতে শুরু করল ম্যাকারভ। ওটা কোনও অবজার্ভেশন পার্ট নয়তো? হঠাৎ চিন্তাটা মাথায় এলো, ধরা যাক তা-ই, কিন্তু কি দেখতে এসেছে তারা?

ফিরে গিয়ে কিসের ওপর রিপোর্ট করবে? এয়ারফিল্ড? নাকি রাডার সম্পর্কে? না, তার কোন যুক্তি নেই। আমেরিকান স্যাটেলাইটের কন্ট্রোল সে খবর অনেক আগেই জানা হয়ে গেছে সবার। অর্থাৎ অবজার্ভেশন নয়, ডেসট্রাকশনই ওদের উদ্দেশ্য। কোন সন্দেহ নেই।

এয়ার ডিফেন্স কমান্ড থেকে রাত্রে আসা কিছু ফটোগ্রাফিক ইন্টারপ্রিটেশন রিপোর্টে চোখ বোলাল সে। কিছু হীট সোর্সের আভাস আছে তাতে। ওগুলো কি, বাজে ওয়েদারের জন্যে সনাক্ত করতে পারেনি তাদের স্যাটেলাইট। সে কাজ এখন ম্যাকারভকে করতে হবে।

হীট সোর্সের একটা উৎস, একদল মানুষ বা হরিণ যাই হোক, পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে উত্তর পূর্বদিকে যাচ্ছিল গতকাল সন্ধ্য পর্যন্ত। হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গেছে দলটা। পরে যত ইনফরমেশন ছবি তোলা হয়েছে, কোনটাতেই নেই সোর্সগুলো। কেন? বাই দ্য ওয়ে, হরিণ এত চালাক শ্রাবী হলো কবে থেকে? দলটার চলার গতি, হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া, কোনটাই মেলে না হরিণের সাথে। পোলার বেয়ারের সাথেও মেলে না। তাহলে?

ম্যাপে দলটার রুট পজিশন চিহ্নিত করল সে, একটু একটু করে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল-উপকূল থেকে কলেসডালেনের দিকে গেছে সোর্সগুলো। সবার অলঙ্কে লংইয়ারবিয়ন পৌছতে হলে ম্যাকারভ নিজেও ওই রুট বেছে নিত।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে কলেসডালেন থেকে চকুর মেরে আসার সিদ্ধান্ত নিল কর্নেল। বিশ মিনিট পর তাকে এবং এক কুড়ি ফাইটিং পেট্রল নিয়ে আকাশে উঠল প্রকার একটা এমজাই-সিঙ্ক। কেবিনে পাদাণাদি করে বসে আছে লোকগুলো, তাদের অল্পপাতি টাশির মত উচু হয়ে আছে ক্রোয়ে। কর্নেল বসেছে সামনে।

উপকূলরেকা ধরে মিনিটে মাত্র দুই কিলোমিটার গতিতে কলেসডালেনের দিকে উড়ে চলল এমআই-সিঙ্ক। একটু পর আর-পরিত্যক্ত কোলেসবুকতা জেট

ও কিছু পরিত্যক্ত মাইন পেরিয়ে এল। কয়েকজন বর্ডার পুলিশ মুখ তুলে হাত নাড়ল ওটার উদ্দেশে।

নিচে কুয়াশা নেই এ মুহূর্তে, দেখতে পেল ম্যাকারভ। ব্যতাস আছে বেশ। পাহাড়ের ফাঁক-ফোকর দিয়ে আসা জোর ব্যতাসে দুলে উঠছে কন্টার, ঝাঁকি ঝাঞ্চে। সামনের তুম্বারমোড়া পাহাড়ের মাথা ঢাকা পড়ে আছে মেঘের আড়ালে। ওদিকে ঘন তুম্বারপাত চলেছে।

ম্যাপে নজর বুলিয়ে নিল পাইলট। বঙ্গল, 'আর পাঁচ মিনিট, কমরেড পলকভনিক।'

জায়গামত পৌছে পিচ কন্ট্রোল নিজের দিকে টানল লোকটা, গতি পড়ে গেল কন্টারের। লেজের দিক বানিকটা নিচ হয়ে গেল। কো-পাইলট নিচের তুম্বারে চোখ বোলাতে লাগল সতর্কতার সাথে। ম্যাকারভ আর সে একই মুহূর্তে দেখতে পেল ট্রেইলটা। ঠিক ওটার ওপরে পৌছে ভেসে থাকল কন্টার, ব্রোটারের ডাউনওয়াশে ট্রেইল যাতে মুছে না যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে পাইলট।

বিনকিউলারের সাহায্যে ট্রেইলটা খুব ভাল করে দেখল ম্যাকারভ, একটাই ট্র্যাক, তবে বেশ গভীর। এবং চওড়াও বেশি। একজন মানুষের ট্র্যাক কখনও এত গভীর আর চওড়া হতে পারে না। ধীরে ধীরে কঠিন হাসি ফুটল কর্নেল ম্যাকারভের মুখে।

'ট্র্যাক ফলো করো,' পাইলটকে নির্দেশ দিল সে। যতদূর সম্ভব ওটাকে অনুসরণ করতে চায় সে, তাতে পেট্রল বাহিনীর কষ্ট কমবে।

কিন্তু হলো না, আধ মিনিট যেতে না যেতে ভিজিবিলাটি যাপ করে পঞ্চাশ মিটারে নেমে এল। শূন্য কন্টার দাঁড় করিয়ে ফেলতে বাধ্য হলো পাইলট। 'আর যাচ্ছে না। কমরেড পলকভনিক। ল্যান্ড করব?'

সামনে তাকিয়ে আছে ম্যাকারভ, ট্রেইলটা হারিয়ে গেছে সামনের হিম-ঝঞ্ঝার আড়ালে। এখন যদি লোকগুলোকে এখানে নামিয়ে দেয়া হয়, ঝড় শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের দেখা পাওয়ার আশা নেই, ভাবছে সে। অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত লোকগুলোর সার্চ প্যাটার্ন ইচ্ছে থাকলেও পুনর্নির্ন্যাস করা সম্ভব হবে না।

এদিকে ঝড়ের কারণে অল্প সময়ের মধ্যে শত্রুর ট্রেইল মুছে যাবে। মহাসমস্যা! কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না ম্যাকারভের। এই মুহূর্তে তাকে জিততে হবে। জিততেই হবে।

'ল্যান্ড' হুঙ্কার ছাড়ল সে। কেবিনে চলে এল। পেট্রল বাহিনীর অফিসারকে নির্দেশ দিতে লাগল দ্রুতকর্তে। 'ট্রেইল অনুসরণ করো। যদি শত্রুর দেখা পাও, পরবর্তী নির্দেশের জন্যে আমার সাথে যোগাযোগ করবে রেডিওতে। শত্রুকে জ্যান্ত ধরতে হবে, ইউ হিয়ার? সবক'টাকে জ্যান্ত চাই আমি।'

'রাইট, কমরেড পলকভনিক।' মাথা ঝাঁকাল অফিসার।

'আমি প্রাতি বেরগেটে ফিরে যাচ্ছি,' বলল কর্নেল। 'যদি ব্যাটারের দেখা পাও, ধাওয়া করে মালভূমিতে নিয়ে আসবে, তাহলে আমাদের দুই দলের মধ্যে আটকা পড়বে ওরা। ওকে?'

'ওকে!' রটপট দরজা খুলে নেমে পড়ল লোকটা। হুঙ্কার ছাড়ল সঙ্গীদের।

উদ্দেশ্যে, 'আউট!'

'গুড লাক!' অফিসারের কাঁধে চাপড় লাগাল ম্যাকারভ। ওরা রেড আর্মির এলিট ফোর্সের বিশেষ দল, ভাবল সে। ওরা যদি কাজটা করতে না পারে তাহলে কেউ পারবে না।

ব্যারেক্টসবার্গ ঘাঁটিতে ফিরতেই কবীর চৌধুরীর একটা মেসেজ পেল সে। তাতে শীমি এক গ্লাটন স্পেসনাজ লংইয়ারবিয়নে পাঠানোর নির্দেশ আছে।

'কেন?' কমিউনিকেশন অফিসারকে জিজ্ঞেস করল কর্নেল। 'কি জন্যে...'

'নরওয়েজিয়ান খনি শ্রমিকরা দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে শহরে, কমরেড পলকডনিক। বর্ডার পুলিশ সামাল দিতে পারছে না।'

খবরটা শোনামাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলল সে, কঁকড়ে গেল ভেতরে ভেতরে। রায়ট! খনি শ্রমিকরা... তা-ও ঠিক এমন সময়? ওদিকে ফিফিং বোট, রেইডিং পার্টি, এদিকে রায়ট, কি ঘটছে এসব?

যদিও নির্দেশ পালন করতে দেরি করল না সে, সঙ্গে সঙ্গে খ্রিশজন স্পেসনাজ পাঠিয়ে দিল লংইয়ারবিয়নে। ১২০ জন ছিল ওরা, তার মধ্যে ৩০ জন এখানকার বেসের পাহারায় রয়েছে। পাহাড়ে শত্রুর খোঁজে লেগে আছে ৩০ জন। বাকি ছিল ৫০ জন, তার থেকেও ৩০ জনকে হারাতে হলো। এখন যে ক'জন আছে, তাদের সাহায্যে রাডার রক্ষা করতে হবে তাকে। এ ছাড়া আর কোন উপায়ও তো নেই।

নর্দার্ন লাইট যেখানে বাধা, সেখান থেকে শহরের হই-চই শোনা গেলেও দেখা যায় না কিছু। অনেকগুলো উঁচু শেড আর ওয়্যারহাউস দৃষ্টিপথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

জনতার ডাঙচুর, চিৎকার ও রুশ বর্ডার পুলিশের গুলির শব্দ শুনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে ডিলন ওয়েসটন ও ক্রিফোর্ড। একই অবস্থা ট্রলারের সশস্ত্র দুই গার্ডেরও।

'কি ঘটছে শহরে?' পলসেন জিজ্ঞেস করল হোল্ড থেকে বেরিয়ে। চোখ ফোলা তার, ঘুম থেকে উঠে এসেছে। 'রায়ট বেধেছে মনে হচ্ছে?'

'নিয়ত!' তেড়ে এল গার্ডদের একজন, ঝট করে রাইফেল তুলল তাকে লক্ষ্য করে। 'গো ব্যাক, ইন দ্য কেবিন। অল!'

পিছিয়ে এসে হুইল হাউসে বসল চার কমার্ডো। 'এবার কেটে পড়ার সময় হয়েছে,' বলল ওয়েসটন।

হুইল হাউসের দরজা ইচ্ছে করেই খোলা রাখা হয়েছে যাতে শহরের কোলাহল শোনা যায়। কান পেতে আছে ওরা। আওয়াজ ক্রমেই বাড়ছে। দুই গার্ড অস্থির হয়ে উঠতে শুরু করেছে, ভয় পেয়েছে বোঝাই যাচ্ছে। কি যেন পরামর্শ করল লোক দুটো, একজন মাথা দুলিয়ে হুইল হাউসের দিকে তাকাল, তারপর ঘুরেই ছুটল শহরের দিকে। অবস্থা দেখতে যাচ্ছে নিচুই।

লোকটা চোখের আড়ালে চলে যেতে ক্রিফোর্ডের দিকে ফিরল ওয়েসটন। 'ওই ব্যাটাকে কায়দা করে এখানে নিয়ে আসতে পারলে হত,' বলে হাসল। 'তুমি

অসুস্থ, জেইগ। কেবিনে গিয়ে জোরে চেঁচাও। পলসেন, ওকে সাহায্যের ডান করে।'

এক মিনিট পর হুডমুড় করে হুইল হাউস থেকে বেরিয়ে এল ওয়েসটন। গার্ডের উদ্দেশ্যে চেঁচাল, 'কমরেড, এদিকে আসুন! ভাড়াভাড়া!'

ঘুরে তাকাল লোকটা, কিন্তু নড়ল না।

'কমরেড!' আবার ডাকল সে জরুরী ভঙ্গিতে। মুখস্থ কিছু রুশ বুলি ঝেড়ে দিল। 'আসুন! জলদি!'

'দা?'

'এদিকে আসুন! আমাদের এক সঙ্গী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হসপিটালে নিতে হবে তাকে।'

আর কিছু না বুঝলেও 'হসপিটাল' শব্দটা ঠিকই বুঝল সে, অপ্রশস্ত কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে এগিয়ে এল। তাকে পথ করে দেয়ার জন্যে সরে দাঁড়াল ওয়েসটন, হাত তুলে কেবিন দেখাল। উঁকি দিল গার্ড, ক্রিফোর্ডকে ব্যাস্তেজ বাধা পা ধরে আছড়পাছড় করতে দেখে ভুরু কুচকে উঠল তার। পলসেন 'ধরে রাখতে' পারছে না তাকে।

নড়ল না গার্ড, কেবিনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকল। তার দিকে এগোল ওয়েসটন, একহাত দেহের পিছনে, একটা রেক্স ধরা আছে মুঠোয়।

পাঁচ মিনিট পর রুশ বর্ডার পুলিশের ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় কেবিন থেকে বের হলো ওয়েসটন, হাতে রাইফেল। ওটার নল পলসেনের পেটে ঠেকিয়ে হুম্বিতম্বি করতে দেখা গেল তাকে, মনে হলো ট্রলার ছাড়ার নির্দেশ দিচ্ছে।

একটু পর ঘাট ছেড়ে পিছিয়ে এল নর্দার্ন লাইট, ঘুরে সর্বোচ্চ এগারো নট গতিতে ছুটল খোলা সাগরের দিকে।

খাড়া দেয়াল বেয়ে বড়সড় একেকটা গিরগিটির মত ওপরে উঠে চলেছে ভার্জিনিয়া রিজের সদস্যরা। যত উঠছে, বাতাসের মাতমও বাড়ছে ততই।

এ মুহূর্তে দলের নেতৃত্বে রয়েছে মাসুদ রানা। বাতাসের যত চাপই থাক, তা নিয়ে খুব একটা ভাবছে না ও। কেননা পিছন থেকে আসছে বাতাস, তাতে বরং সুবিধেই হচ্ছে সবার, অল্প পরিশ্রমে উঠে যেতে পারছে।

অবশ্য চূড়ায় কি অবস্থা হবে ও জানে না। কেউ জানে না। বিজ অতিক্রম করে চার কিলোমিটার দীর্ঘ গ্রেসিয়ার পাড়ি দিতে হবে দলকে, তারপর লংইয়ারবিয়ন। ওদিকের উপত্যকা হবে ভিন্ন প্রকৃতির, হয়তো বাতাসও হবে ভিন্ন রকম।

প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে দল। থেকে থেকে পার্শ্বকার, হুড়ে প্রচণ্ড টান পড়ছে। হুড়ের নিচে উলের ব্যানডানা দিয়ে নাকমুখ আচ্ছাদিত বেধে নিয়েছে সবাই, চোখে পুগলস। তারপরও পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসা বাতাসের চাপে থেকে থেকে দম অটিকে আসছে। একটু পর পর খামছে রানা, পিছন ফিরে দেখে নিচ্ছে ছায়াগুলো ওকে অনুসরণ করছে কি না ঠিকমত।

ওর পিছনে রয়েছে সোহানা, রানাকে খেমে পড়তে দেখলে ও-ও খামছে, নিজের পিছনেরজনকে দেখে নিচ্ছে, সে দেখছে তার পিছনেরজন আছে কি না, এই ভাবে চলছে দলটা। এখানে তাপমাত্রা মাইনাস আটশ ডিগ্রী। ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত হওয়ার প্রচণ্ড ঝুঁকি আছে এই আবহাওয়ায়।

এত ঠাণ্ডায় খুব অভিজ্ঞ পাহাড়ীও জায়গা ছেড়ে নড়ে না, শুধু বেচে থাকার জন্যে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। কিন্তু ওদের সে উপায় নেই। জায়গামত পৌছার তাড়া আছে। আন্টিমিটারে চোখ বোলাল ও-উনিশশো ফুট। আরও অল্পত আড়াইশো ফুট উঠতে হবে।

পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে রানা, বগলের কাছে বিচ্ছিরিরকম চটচটে অনুভূতি। ঘাম। কঁচকির কাছেও একই অনুভূতি। বেশি ঘামলে বিপদ, জমে বরফ হয়ে যাবে থামলেই। অন্যদের কি অবস্থা নিজেই দিয়েই বুঝতে পারছে রানা, তাই আর দেরি না করে এক ঘণ্টার জন্যে বিশ্রাম ঘোষণা করল।

পাহাড়ের বড় বড় ফাটল, আড়াল বুঁজে নিয়ে যে যার টেন্ট শীট মুড়ি দিয়ে বদে পড়ল সবাই। বাতাসের আক্রমণ ঠেকাতে ব্যক্তিগত প্যাক ও ইকুইপমেন্টের আড়ালে বসল। রানা ও সোহানা বসল কাছাকাছি।

ওকে উসখুস করতে দেখে সোহানা মাথা ঝাঁকাল। টেঁচিয়ে বলল, 'কি হয়েছে?'

'ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের সাদা পাচ্ছি না।'

'কখন থেকে?' উদ্বেগ ফুটল ওর চেহারায়।

'বেশিক্ষণ হয়নি,' মিথ্যে বলল রানা। সত্যি বললে সোহানা ঘাবড়ে গিয়ে এখনই পানি ফুটাতে লেগে যাবে। রানাকে বাধা করবে তার মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে বসে থাকতে।

'একদম সাদা নেই?' সোহানা নাছোড়বান্দা।

'একটু একটু আছে,' আবারও মিথ্যে বলতে হলো ওকে। কেননা এখনই কিছু করতে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। কয়েক ঘণ্টা পর ভালয় ভালয় শেষ স্টেপেজে পৌছতে পারলে পা নিয়ে মাথা ঘামাবে রানা, এখন নয়। 'তোমার কি অবস্থা? কোন সমস্যা নেই তো?'

মাথা নাড়ল ও-নেই।

সোহানার অগোচরে আঙুলটা নাড়ার কসরত চালিয়ে যেতে লাগল ও, কাজ হচ্ছে না। একদম সাদা নেই। কোন অনুভূতিই নেই ওটায়। গগলস পরিষ্কার করে আবার চোখে দিল রানা।

বড় খামার অপেক্ষায় থাকল। লক্ষণ দেখে বুঝতে পারছে আর দেরি নেই, খেমে যাবে সে-কোন সময়।

হিসেবে গোলমাল হয়ে গেলে অথবা ওরুতর কোন সমস্যা দেখা দিলে ঘাবড়ে যাবে, এমন বান্দাই নয় কবীর চৌধুরী। বরং রেগে আছে সে, একদমই তাকিয়ে আছে সামনে দাঁড়ানো বর্ডার পুলিশের লেফটেন্যান্টের দিকে। খামার মত দাঁড়িয়ে আছে সে, ভেতরে ভেতরে ঘামছে ভয়ে।

'আপনি জনতার ওপর গুলি চালাবার অর্ডার দিয়েছেন?' ভরাট গলায় প্রশ্ন করল সে। 'তাদের মাথার ওপর দিয়ে নয়?'

'ওরা...ওরা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল, স্যার।' কোনমতে চি-চি করে বলল লেফটেন্যান্ট। 'সামাল দেখা যাচ্ছিল না। প্রথমদিকে ফাঁকা গুলিই করেছিলাম, স্যার!'

'আপনি বুঝতে পারছেন কত বড় ক্ষতি করে বাসেছেন আপনি নিজ দেশের আন্তর্জাতিক ইমেজের?' ঠাণ্ডা, নিরাসক্ত গলায় বলল কবীর চৌধুরী। 'কতজন মারা গেছে?'

'তিনজন, স্যার।'

কিছু সময় ভাবল সে। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'এখন যান, আপনার কি ব্যবস্থা করা যায় পরে ভেবে দেখব আমি।'

সতেরোজন রুশ বর্ডার পুলিশ আহত হয়েছে রায়টে, লেফটেন্যান্ট বেরিয়ে বেতে সামনে পড়ে থাকা রিপোর্টটা দেখল সে। তার মধ্যে চারজনের অবস্থা উন্নতর। বাচরে কি না সন্দেহ। কয়েকটা রুশ গাড়িতে আঙুন ধরিয়ে দিয়েছে নরওয়েজিয়ান শ্রমিকরা, হামলা চালিয়েছে রুশ মাইনেও। এখন পরিস্থিতি শান্ত, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে আবার...

উঠে পড়ল সে। আরেক আপাত মারাত্মক সমস্যার কথা মনে পড়েছে, নর্দান লাইট পানিয়ে গেছে। অবশ্য ওদের সেরকমই ধারণা। কিন্তু কবীর চৌধুরী জানে তা সত্যি নয়। ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তে আবার ওঁাকে তাড়া করে ধরে ফেলতে পারে রুশ নেভি। কিন্তু সে তা চায় না।

তার ধারণা ওটায় করেই ফিরে যাবে আমেরিকান রেইডিং পার্টি, অল্পত চেষ্টা করবে। দলের সবাই উঠুক আগে, তারপর সবাইকে একসঙ্গে আটক করবে সে। ম্যাকারভ নিশ্চয়ই এতক্ষণে দলটার অবস্থান সনাক্ত করতে পেরেছে, তাড়া করে বেড়াচ্ছে ব্যাটারদের।

কমান্ডো বাহিনীর পালাবার দৃশ্য কেমন হতে পারে, অনুমান করতে গিয়ে হাসি পেল কবীর চৌধুরীর। নিশ্চয়ই ইন্দুরের মত...

বারো

দুপুরের দিকে বাতাসের গতি কমল, তুষারপাতের পরিমাণও। ভিজিবিলাটি বেড়ে চলিশ-পঞ্চাশ মিটারে দাঁড়াল। সে অসহ্য পরিবেশ, তাতে হাওয়ার্ড স্মিথ তার নিভা শেল্ড করার রকটিন তুলে গেছে। কয়েকদিন শেভ করার সুযোগ না পাওয়ায় গজিয়ে ওঠা খোঁচা খোঁচা দাড়ির কাছে অন্যদেরও কৃতজ্ঞ মনে হলো। দাড়ির জন্যে ঠাণ্ডা সামান্য হলোও কম লাগে।

মিসাইলের বিযুক্ত অংশগুলো হাত বদলের নির্দেশ দিন মাসুদ রানা, ঠাণ্ডায় প্রায় জমাট বেঁধে যাওয়া হাত-পা নেড়ে এই কাজটুকু শেষ করতেই অনেক সময়

লাগল ওদের। তারপর আবার শুরু হলো চলা। এক সময় চূড়োর উঠে এল দল।
ধেমে দাঁড়িয়ে চারদিকে গ্লেনসিয়ারের বিস্তৃতি দেখছে। তাদের এবং গ্লেনসিয়ারের
প্রান্তের মাঝে বিশাল এক ফাটল-হাঁ করে আছে।

'নিচের দিকে বরফ গলা শুরু হয়ে গেছে,' মিডল্যান্ড বলল।

'সে তো বুঝলাম,' ত্রেভিনস্কি বলল অধৈর্য কণ্ঠে। 'কিন্তু এখন এই ফাটল
পার হওয়ার উপায় কি? আগামী গ্রীষ্মের আগে রাস্তা পাওয়া যাবে বলে তো মনে
হয় না।'

'টেক ইট ইঁজি,' রানা বলল। 'একটু নিচে নেমে দেখা যাক পাওয়া যায় কি
না।'

বেশ খানিকটা নামতে পাওয়া গেল রাস্তা। তুষারমোড়া কঠিন বরফ আর
পাথরের মধ্যে চার ফুট ফাঁক সেখানে। ব্যাকপ্যাক আর কি খুলে ওপারের উদ্দেশে
লাফ দিল ডেপুটি হাওয়ার্ড স্মিথ। কিন্তু পুরো যেতে পারল না, কিনারার নরম
তুষারে পা পিছলে গেল তার। তাতে অবশ্য সমস্যা হলো না, দু'হাতে কিনারা
আকড়ে ধরে ওপরে তুলে ফেলল সে নিজেকে। কঠিন বরফে একটা স্পাইক গেঁথে
সেফটি লাইন দিয়ে নিজেকে বাঁধল তার সাথে।

'দুটো করে কি বাঁধা মজবুত করে,' নির্দেশ দিল রানা। 'ব্রিজ বানাও।'

তাই করা হলো, দুটো সরু, সমান্তরাল প্রাঙ্কের মত দেখতে হলো ব্রিজ।
একজন একজন করে চার হাত-পায়ে তর করে পার হতে লাগল দলটা। সবশেষে
এল মেডিক জনসনের পালা। পিঠের বোঝাটা অন্যদের তুলনায় বেশ বড় তার।
সতর্কতার সাথে ওপারে পৌঁছল সে, এক হাত বাড়িয়ে গ্লেনসিয়ারের দেয়াল
ছুঁয়েছে, এমন সময় একদিকের স্কির বাঁধন সরে গেল জায়গা থেকে। বেশি নয়,
কিন্তু তার ভারসাম্য টলিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

কাত হয়ে গেল কি, কয়েক মুহূর্ত অনিশ্চিত ভঙ্গিতে খুলে থাকল জনসন,
তারপর ভারসাম্য হারিয়ে ঝপ করে খুলে পড়ল অতল ফাটলের মধ্যে। অন্য
স্কিটাকে ধরার জন্যে শেষ মুহূর্তে হাত বাড়িয়েছিল সে, কিন্তু বেশি তাড়াহুড়া করে
বসায় ব্যর্থ হলো। কোমরে বাঁধা সেফটি লাইনে ঝুলতে লাগল। টান পড়ায়
কিনারার তুষার কেটে বসে যেতে লাগল লাইন, ওপারে দাঁড়ানো বাকি সবাই টেনে
ধরে রেখেছে ওটা।

'নড়বে না!' চিৎকার করে বলল রানা। পিঠের বোঝা ফেলে এগিয়ে এল সামনে।
'ভয় নেই। আমরা টেনে তুলছি তোমাকে। দড়িতে টান পড়লে কিনারা থেকে দূরে
ধাকার চেষ্টা করো। ওকে?'

পাধুরে দেয়ালে পা ঠেকিয়ে নিজেকে স্থির রাখল জনসন, অজান্তেই এক
নজর নিচে তাকিয়ে শিউরে উঠল। তাকে ফ্যাকাসে বসে উঠল। মুখ তুলে রানাকে
দেখল, ভরসা খুঁজছে।

'ঘাবড়িয়ে না,' রানা বলল। 'আমরা আছি তোমার সাথে। রেডি? স্মিথ,
পুল!' ওর ভয় ছিল জনসনের ভার সহ্যে পারবে না লাইন, ছিড়ে যাবে। কিন্তু
শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু ঘটল না, সতর্কতার সাথে লোকটাকে তুলে আনল ওরা।
ততক্ষণে ঘেমে উঠেছে সবাই।

'সরি, ফেলার্স,' ইটু গেড়ে বসে বলল জনসন। হাত-পা নেড়েচড়ে দেবতে
লাগল।

'যে কারও বেলায় ঘটতে পারত,' রানা বলল। 'লেট'স মুভ।'

'মেজর!' পিছন থেকে ডাকল মেডিক্যাল কর্পসমান। 'মনে হচ্ছে কবুজি
ভেঙে গেছে, স্যার।' চোখমুখ বিকৃত করে বা হাত তুলে দেখাল। 'কেউ একজন
ব্যাভেঞ্জ করে দেবে, প্রীজ? ভাগ্য ভাল জান হাত ভাঙেনি।'

মিলার এগিয়ে গেল তার দিকে, ঠাণ্ডা অগ্রহা করে গ্রাভস খুলে পরীক্ষা করে
দেখল তার কবুজি। একটা হাড় সত্যিই ভেঙেছে বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল।
তাড়াতাড়ি ব্যাভেঞ্জ বেঁধে দিল বাকহাউডের সাহায্যে। 'দেয়ার ইউ আর, মেট,'
গ্রাভস পরে নিয়ে বলল।

'থ্যান্কস, সার্জেন্ট,' রানা বলল। মনে মনে প্রার্থনা করল এটাই যেন শেষ
দুর্ঘটনা হয়। ভরসার কথা যে অল্পের ওপর দিয়ে গেছে ধাক্কাটা, ডান হাত ভাঙেনি
জনসনের। তাহলে দলের জন্যে বোঝা হয়ে উঠত লোকটা। এখন থেকে রেডিও
অপারেট করবে ও, ঠিক করল রানা, মেডিকের দায়িত্ব পালন করবে বাকহাউড।

মাঝারি গতিতে নামতে শুরু করল দল। বাতাস উল্টোদিক থেকে বইছে
এখন। তুষার বড় ধেমে গেছে। গ্লেনসিয়ারের শেষ মাথায় পৌঁছে থামল রানা,
ফাটল এখানে মাত্র দুই ফুট চওড়া। মিডল্যান্ডকে অনুসরণ করে রিজের কিনারা
ধরে এগোল দল-দ্বিগুণ সতর্কতার সাথে।

আঠারোশো ফুট নিচে রয়েছে লংইয়ারবিয়ন, চোখের আড়ালে। রাজার
থেকে খুব সম্ভব ছয় মাইল দূরে রয়েছে এখন দলটা।

ঘড়িতে বাজে ১৬০০ ঘণ্টা।

ভার্জিনিয়া রিজের অপারেশন শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই।

ক্যামোফ্লেজ পেইন্ট করা চার চাকার এক ভ্যানের ওপর রয়েছে সদ্য বসানো রুশ
আর্লি ওয়ার্নিং রাডারটা। ভ্যানের সাইডে একটা দরজা, ওপরে ডিম আকৃতির
একজোড়া বিরাট ডিশ এরিয়াল। একটা রয়েছে সামনের দিকে, অনেকটা
বুলডোজার ব্রেডের মত দেখতে। ওটার কাজ ইনকামিং এয়ারক্র্যাফট সনাক্ত
করা। অন্যটা ছাদের মাঝখানে ঘুরছে ধীরগতিতে। মিনিটে পনেরোবার ঘোরে
ওটা। গুলন করছে মোটর।

দ্বিতীয় এরিয়েলের ওপরে আছে একটা দীর্ঘ হরাইজন্টাল বার। সামনের মেইন
এরিয়েল যখন কোন এয়ারক্র্যাফট পিক করে, তখন এই বার 'ইন্টারোগেটিং'
সঙ্কেত ছুঁড়ে দেয় বাতাসে। এই ইন্টারোগেটিংয়ের জবাব দেয়ার জন্যে রুশ প্লেনে
ট্রান্সপন্ডার নামে এক ধরনের ডিভাইস আছে। ক্র্যাফট যদি নিজেকে দেয়, তাহলে
সাথে সাথে সঙ্কেতের জবাব দেবে ওটা। আর যদি তা না আসে, অর্থাৎ খুল জবাব
আসে, তাহলে ওটাকে শত্রুপক্ষের ধরে নেয়া হয়। এই সিস্টেমের নাম
'আইডেন্টিফিকেশন ফ্রন্ড অর এনিমি'।

কন্টারে বেঁধে প্রাচী বেরনেটে তুলে আনা হয়েছে ভ্যানটা। তার আগে ওটার
প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্যে আনা হয়েছে টনকে টন মাটি আর নুড়ি। রাজার

স্থাপনের কাজ তাড়াতাড়ি সারার জনো। নইলে বরফ পুরো না গলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত মক্কেকে। কাজেই আপাতত কাজ চালাবার জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভ্যান থেকে এক সেট কেবল চলে গেছে কাছেই গুপ্তন করতে থাকা মোবাইল জেনারেটরের দিকে, আরেক সেট চলে গেছে অনেক দিচের লংইয়ারবিয়ন এয়ার ফিল্ডের কন্ট্রোল সেন্টারে। ওগুলোর কাজ ডাটা ট্রান্সমিট করা। ভ্যানের কাছে রয়েছে পুরু বরফের তৈরি একটা ঘর, টেকনিশিয়ানদের ব্যবহারের জন্যে। দুজন টেকনিশিয়ান থাকে ওটায়, রাডারের অটোম্যাটিক অপারেশন মনিটর করে। প্রয়োজনে সরাসরি কন্ট্রোল সেন্টারের সাথে কথা বলতে পারে তারা।

শত্রু এলে কোনদিক থেকে আসবে, আগেই তা অনুমান করে রেখেছে ম্যাকারভ। তাই ওদিককার দেয়াল বেশি মজবুত করে তুলেছে। দুই মিটার চওড়া বরফের ব্লক দিয়ে তৈরি ওটা।

সাধারণ স্মল আর্মসের গুলি ঠেকিয়ে দিতে যথেষ্ট। তাছাড়া হাটের ভেতরে আগে থেকে অনেক কিছু মজুতও করেছে ম্যাকারভ-পুচুর গুলি, জ্বালানি, খাবার, একটা শক্তিশালী ৮২ এম এম মটার ও গোটা কয়েক ম্যান-পোর্টেবল স্ট্রেলি অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট মিসাইল। আরও খুশির কথা, এস্টাবলিশমেন্টের পাহারায় যে স্পেৎসনাজ দলটি রয়েছে, তাদের সাথে আছে নতুন ৫.৪৫ এমএম একে-৭৪ অ্যাসল্ট রাইফেল। পুরনো একে-৪৭ থেকে অনেক উন্নতমানের রাইফেল ওটা। হালকা। কাধে ঝুলিয়ে রেখে চলার ওপরই গুলি ছোড়া যায়। চল্লিশ রাউন্ড গুলি আটে ওটার প্লাস্টিক-ম্যাগাজিনে।

মিয়নফিওর্ডের মিলিটারি অ্যাকটিভিটির খবরে বোঝা যাচ্ছে রাডারের ওপর আক্রমণ আসছে, কাজেই এমন এক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে কর্নেল, যাতে কেবল রাডার রক্ষাই নয়, যারা আক্রমণ করতে আসবে, তারা যাতে জ্যান্ট ফিরে যেতে না পারে, সে কাজও হয়। সমস্ত আয়োজন চূড়ান্ত। এখন সময়ের অপেক্ষায় আছে কর্নেল। জানে, রাতে মেঘ কেটে যাবে। আক্রমণ যদি আসে, ওই সময়ই আসবে।

কুঁড়েঘরের পাহারায় বারোজন স্পেৎসনাজ আছে এ মুহূর্তে। তাদের জন্যে এমন ডিউটি রোস্টার করেছে সে, যাতে পালা করে দুই ঘণ্টা ডিউটি ও চার ঘণ্টা রেস্ট নিতে পারে প্রত্যেকে। এর ফলে সবসময় অটিন জন করে রেস্ট থাকছে। এতে তার দুই-তৃতীয়াংশ শক্তি প্রতি মুহূর্ত সতর্ক থাকবে।

টেকনিশিয়ান দু'জনকে গোণার রাইরে রেখেছে ম্যাকারভ, কারণ তারা এয়ার ফোর্স পারসোনেল। কোন ধরনের অ্যাকশনের ট্রেনিং নেই। যুদ্ধ যদি হাতাহাতি লড়াইয়ে পরিণত হয় ওরা বরং তখন সমস্যার কারণ হয়েই দাঁড়াবে।

বাইরে থেকে এক টেকনিশিয়ান এলে ভেতরে ঢুকল, সেই সাথে এলো এক ঝালক হাড়জমানো ঠাণ্ডা বাতাস ও উড়ন্ত তুষার। সেন্টারের তাপে গরম করা ঘর মুহূর্তে আইসবক্সে পরিণত হলো।

'দরজা বন্ধ করো, গাধা কোথাকার! খেকিয়ে উঠল ম্যাকারভ। 'আক্কেল সবটুকু দেশে রেখে এসেছ নাকি?'

'দুগুণিত, কমরেড পলকভনিক,' তাড়াতাড়ি ওটা বন্ধ করে দিল সে। 'কন্ট্রোল সেন্টার থেকে রোয়ারে আপনাকে ডাকছেন কমরেড চৌধুরী।'

উঠে দাঁড়াল কর্নেল। 'চলো।' হাট থেকে বেরিয়ে এলো, জোর বাতাস আর তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে প্রায় অন্ধের মত এগোল ভ্যানের দিকে; খাটো ল্যাডার বেয়ে ঢুকে পড়ল ভ্যানের উচ্চ অভ্যন্তরে। মৃদু গুপ্তন করছে যন্ত্রপাতি। কাস্টম-বিল্ট কনসোল আর প্রচুর বৃত্তাকার আলোকিত স্ক্রীনে প্রায় বোঝাই ওটা। বাইরের পৃথিবীতে কি ঘটছে, ভেতর থেকে বোঝার কোন উপায়ই নেই।

একটা সুইডেলে বসে টেলিফোন তুলল কর্নেল। 'ইয়েস!'
'ম্যাকারভ!' উত্তেজিত শোনাল কবীর চৌধুরীর গলা। এই ডাকটাও অপরিচিত, ডুক কোচকাল কর্নেল।

'স্যার!'
'ওপরের অবস্থা কি?'
'কোন ভেভেলপমেন্ট নেই, স্যার। নর্মাল।'

'ঠিক আছে। কিন্তু খেয়াল রাখবেন, শত্রুকে জ্যান্ট ধরতে হবে আপনাকে। যদি রাডার হুমকির মুখে পড়ে, কেবল তখনই ওদেরকে খুন করতে পারবেন আপনি। আদার ওয়াইজ না। ইট'স অ্যান অর্ডার। বুঝতে পেরেছেন?'

না দেখেও ম্যাকারভ বুঝল তার সহকারী ক্যাপটেন পাপুকিনকে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে কথা বলছে মানুষটা। ওকে সাক্ষী হিসেবে পরে ব্যবহার করবে প্রয়োজন হলে। 'ইয়েস, স্যার!' রাগ চেপে রেখে বলল।

'রাডার রক্ষা করা আর শত্রুকে জ্যান্ট ধরা, দুটোই সমান জরুরী। কোনটার বেলায় টিল দেয়া চলবে না।'
'ওকে, স্যার!' ফোন রেখে গজগজ করতে করতে কুঁড়েঘরে ফিরে এল সে।

ছয়টার খানিক পর থেমে পড়ল রানা। বুঝল, জায়গামত পৌছে গেছে। উল্টোপাল্টা বাতাসে তুলোর মত উড়ছে তুষার। অবশ্য বাতাসের তেজ কম এসেছে অনেকটাই।

একটার ভেতরে দু'জন করে আশ্রয় নিতে পারে, এমন সাইজের কয়েকটা গর্ত খোঁড়ার নির্দেশ দিল ও, তারপর খাওয়া-দাওয়া। জনসন তার রেডিও নিয়ে বসে পড়ল নিজেদের পজিশন ট্রান্সমিট করার জন্যে। এদিকে রানা হাওয়াড শ্বিথকে এক পাশে ডেকে নিয়ে খুব নিচু কণ্ঠে আক্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছে।

'এখানে রাত একটা পর্যন্ত থাকব আমরা,' বলল ও। 'তারপর দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে এগোব।'

'অলরাইট, স্যার,' মাথা ঝাঁকাল ডেপুটি লীডার।
'আসল মুহূর্তে টোটাল সারঞ্জাইজ চাই। আমি অর্ডার না দেয়া পর্যন্ত কেউ গুলি ছুড়বে না। অবশ্য যদি বাধ্য না হতে হয়।'

'রাইট। আমি জানিয়ে দেব সবাইকে।'
রেডিও ছেড়ে উঠে এল জনসন। চিন্তিত। 'স্যার, বারবার চেষ্টা করেও ওদের

সাদা পাচ্ছি না। লাইনে ভীষণ ইন্টারফিয়ারেন্স হচ্ছে এখনও।

মুখ দিয়ে জঘন্য খিন্তি বেরিয়ে আসছিল রানার, সময়মত সামলে নিল সোহানা কাছেই রয়েছে দেখে। ওদের দুজনের জন্যে গর্ত খুঁজছে সোহানা। 'ওকে, জনসন, বলল রানা। আগে বিশ্রামের আয়োজন শেষ করো। পরে দেখা যাবে।' শ্মিথের সাথে বাকি আলোচনা সেরে নিজেদের গর্তের দিকে এগোল ও। জনসন ও বাকহার্ড দুকে পড়ল পাশের গর্তটায়, হাত দশেকের মধ্যে।

লোকটা যে যোগাযোগের চেষ্টা ছাডেনি, একটু পরই তা বোঝা গেল। বড়জোর দশ মিনিট পর গর্ত থেকে উঁকি দিল সে, 'স্যার! মেজর!' নিচু গলায় ডাকল।

খাওয়া ফেলে উঠল রানা। 'কি?'

'বোডো সাদা দিয়েছে, স্যার! কিন্তু...ইট'স অ্যান অপ ইমিডিয়েট!' উঠে এসে ওয়ান টাইম প্যাডে ডিকোড করা মেসেজটা ওকে দিল সে।

ডুক কুঁচকে উঠল রানার। প্রথমে সোহানা, তারপর শ্মিথের দিকে তাকাল ও-বিস্মিত, হতাশ। ওটা সবাইকে শুনিয়ে পড়ল রানা, লেখা আছে: ভার্জিনিয়া রিজ ক্যানসেলড। কন্ট্যাক্ট সাউথ উইন্ড ফর এক্সফিটারেশন। এনিমি পেট্রল রিপোর্টেড ইওর এরিয়া। অ্যাকনলেজ।

চূপ করে থাকল ও। অন্যরাও নীরব। যে জাহাজ থেকে মিশন শেষে ওদেরকে তুলে নিতে কন্টার আসবে, সেটার নাম সাউথ উইন্ড। এই মেসেজ দেয়ার জন্যে কতক্ষণ ধরে চেষ্টা করছে কন্ট্রোল? ভাবল রানা, একদিন? দু'দিন?

এরকম মুহূর্তে এই মেসেজ কেন? ফাঁস হয়ে গেছে ভার্জিনিয়া রিজের কথা? জেনে গেছে প্রতিপক্ষ?

এনিমি পেট্রল রিপোর্টেড ইওর এরিয়া-এই কটা শব্দের মধ্যে কী ভয়ঙ্কর বিপদ লুকিয়ে আছে, বুঝতে পেরে চিন্তায় পড়ে গেল ও। নিশ্চয়ই মিশনের কথা ফাঁস হয়ে গেছে, কোথাও থেকে লীক করেছে খবর। নইলে একেবারে শেষ মুহূর্তে অ্যাডমিরাল কিং এরকম সিদ্ধান্ত নিতেন না।

টার্গেটের এত কাছে এসে ফিরে যেতে হবে? ভাবছে রানা। এত কাছে এসে? আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেখানে...কিন্তু এ নির্দেশ তো অমান্যও করতে পারে না ও। একা রানা নয়, আরও অনেকগুলো জীবনের প্রশ্ন এর সাথে জড়িত, নির্দেশ অমান্য করলে যদি বিপদ ঘটে যায়? যদি রুশ টহল বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যায় ওরা? বা কারও মৃত্যু হয়? কি জবাব দেবে?

কাছেপিঠে রুশ পেট্রলের উপস্থিতির কথা প্রায় প্রথম থেকেই জানত রানা, ধরে নিয়েছিল নিরাপত্তামূলক নিয়মিত টহলে আছে তারা। কিন্তু এই মেসেজ প্রমাণ করে তা সত্যি নয়। ওদেরকেই খুঁজছে ব্যাটারী। অর্থাৎ এখানকার রুশ কন্ট্রোল জানে ওদের আগমনের কথা।

কি করবেন এখন, স্যার? নিম্ন জিজ্ঞেস করল।

'ভাবছি' গভীর গলায় বলল ও। মেসেজের জবাব লিখল: ইওর অপ ইমিডিয়েট রিসিভড। উইন্ড ফোর্স ফোর। ডিজিবিগিটি ১০০ মিটার। ওটা তুলে দিল জনসনের হাতে। 'পাঠিয়ে দাও।'

'রাইট, স্যার।'

'পিআরসি' রেডি রাখো। যে কোন মুহূর্তে কন্টার কল করতে হতে পারে। চারদিকে কড়া নজর রাখবে সবাই।

'ওকে, স্যার।'

রানাকে দেখে বার্নারে এক প্যান ঠাসা তুষার চাপাল সোহানা। 'এখন কি? ফিরে যেতে হবে?'

খোঁচা খোঁচা দাড়ির মধ্যে দিয়ে গাল চুলকাল ও। চিন্তিত। 'বুঝতে পারছি না কি করব। এত কাছে এসে ফিরে যেতে হবে ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।'

এ নিয়ে আর কিছু না বলে কাজে লেগে পড়ল সোহানা, তুষার গলা পানি টগুগু করে ফুটছে দেখে বলল, 'কই, জুতো খোলো। দেখি কি অবস্থা তোমার পায়ের।'

ডান পায়ের স্নো শূ ও পুরু উলের মোজা খুলে ফেলল ও, দেখল টকটকে লাল হয়ে আছে বুড়ো আঙুলটা। সাবধানে ওটাকে পানিতে চোবাল রানা, প্রথমে কিছুই টের পাওয়া গেল না। মিনিট তিনেক পর ব্যথা শুরু হলো-প্রচণ্ড টনটনে ব্যথা। দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকল ও।

আধঘণ্টা পর খাবার গরম করে খেয়ে নিল দু'জনে।

'নেভি এই এলাকা থেকে সরে যেতে বলছে আমাদেরকে,' পলসেন বলল। 'বলছে বিপজ্জনক এলাকায় এসে পড়েছি আমরা।'

'মরার যন্ত্রণা!' ক্রিসফোর্ড বলল বিরক্ত কণ্ঠে। 'ভাগ্য এত উল্টোপাল্টা করছে কেন?'

মাররাত হতে আর ঘণ্টা দুয়েক বাকি, অনেক আগেই ইসফিওর্ডের বটলনেক এন্ট্রান্স পেরিয়ে এসেছে নর্দার্ন লাইট। ধক্ ধক্ করছে ওটার ডিজেল এঞ্জিন। নরওয়েজিয়ান ফ্ল্যাগ উড়িয়ে চলছে ট্রলার। ওয়েসটনের ধারণা ছিল উপকূলের বারো মাইলের ভেতরে থাকলে রুশ নেভি কিছু করতে পারবে না।

তবু ব্যাটারী ইঁদুর-বেড়াল খেলাছে ওদের সাথে, ওরা সবাই বুঝতে পারছে ব্যাপারটা। নিরাপত্তার খোঁজে দক্ষিণে এগোনোও ঠিক মনে হচ্ছে না, কারণ ব্যারেন্ট সাগরই আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। নরওয়েজিয়ান নেভির দেয়া খবর অনুযায়ী আর তিন ঘণ্টা পর ওই সাগরে রুশ নেভির বিরুদ্ধে টোটাল ব্লকেড ঘোষণা করতে যাচ্ছে ন্যাটো। সমস্যা।

'আমার মনে হয়,' চার্টের ওপর চোখ রেখে ডিলন বলল, 'উল্টোদিকে যাওয়াই এখন নিরাপদ হবে আমাদের জন্যে। উত্তরের প্যাক আইসের দিকে।'

'চ্যানেল ক্রুজ শিপগুলোও ওদিকেই যাবে,' ওয়েসটন বলল। 'দর্শনীয় এক দৃশ্য হবে।'

'গুলি মারো দৃশ্যের!' বলল ক্রিসফোর্ড। 'আমরা...'

'আমি চাইছি, খারেকাছে কোথাও কোন ইনলেট থাকলে তার ভেতরে ঢুকে বসে থাকতে। বা খাড়া কোন ফাটল...' ম্যাপে টোকা দিলে একটা খুঁদে ফিওর্ড দেখাল ওয়েসটন। বিশ মাইল সামনে রয়েছে ওটা। 'এখানে লুকিয়ে থাকতে পারি না আমরা?'

'সেইন্ট জনসফিওর্ডে?' খুশি হয়ে উঠল ডিলন। নিশ্চই পারি! কিন্তু ওখানে পৌছতে তিন ঘণ্টা লাগবে।

'লাগুক, চলে।' হাসল ওয়েস্টন। ট্রেনিং কাজে লাগানোর সুযোগ একটা পাওয়া গেছে ডেবে বত্রিশ পাঁচ দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। ওখানে একবার পৌছতে পারলে ঘাপটি মেরে বসে থাকা যাবে সমস্ত সুইচ অফ করে। ক্রিফের খুব কাছে থাকলে নর্দার্ন লাইটের রাডার ইকো সনাক্ত করতে পারবে না কেউ। 'এরিয়াল ফটোগ্রাফির হাত থেকে হয়তো বাঁচা যাবে না,' বলল সে। 'তবে সে চেষ্টা এখনে করা হবে বলেও মনে হয় না। দুই-একদিন নিশ্চিতে কাটিয়ে দেয়া যাবে।'

কাউকে ডেকে দিতে হলো না, এমনিতেই ঘুম ভেঙে গেল মাসুদ রানার। আসলে সত্যিকারের ঘুম যাকে বলে, তা ওর আসেইনি। শত্রু কাছেই রয়েছে, এই চিন্তা অবচেতন মন জুড়ে বসে থাকলে ঘুমাতে পারে না রানা। শ্রোত্র চোখ বুজে পড়ে ছিল।

মেঘ দ্রুত কেটে যাচ্ছে দেখল ও। পাহাড়ের মাথায় লেগে আছে ছোট ছোট টুকরো হয়ে, যেন দীর্ঘ সময়ের আশ্রয় ছেড়ে যেতে চাইছে না মন। গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও, জনসনকে কন্টার কল করতে বলে এদিক-ওদিক তাকাল। দলের সঠিক অবস্থান জানা খুব জরুরী এখন। পিছনে দক্ষিণ, ওদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আকাশছোঁয়া সেই রিজ। আগে ওটাকে যত কাছে মনে হচ্ছিল, এখন সেরকম লাগল না।

পশ্চিমে তাকাল রানা। লাইয়ারবিয়েন উপত্যকা হাঁ করে আছে ওদিকটায়। কম্পাস চেক করে ভুলটা ধরতে পারল ও। প্লাটা বেরগেটের যেখানে পৌঁছার কথা ছিল, সেখান থেকে অন্তত এক হাজার মিটার দূরে এসে আশ্রয় গেড়েছে ওরা। ঘন কুয়াশার কারণে অন্য এক ছোটখাট রাইজকে মূল রিজের তলা ধরে নিয়েছিল, যার ফলে এই বিপত্তি ঘটে গেছে।

ম্যাপে চোখ বুলাল রানা ভাল করে, তারপর জনসনের উদ্দেশ্যে বলল, 'স্যাউথ উইন্ডকে জানাও, আমাদের পজিশন সেভেন্ট এইট ফিফটিন নর্থ, ফিফটিন পাঁচ ইন্সট।'

কথাটা শেষ করেই বোকা বনে গেল রানা। একচুল নড়ছে না। ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সোহানা আর জনসনও হঠাৎ মূর্তি হয়ে গেছে সামনের অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে। মেঘের শেষ টুকরোটাও সরে গেছে প্লাটা বেরগেটের কেন্দ্র থেকে, আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়েছে রুশ আলি ওয়ানিং রাডার।

'ডাউন!' মুহূর্তে সামলে নিয়ে চিৎকার করে উঠল ও, বুক দিয়ে আছড়ে পড়ল ভূমারে। ব্যস্ত হাতে বিনকিউলার চোখে লাগাল। এক লাফে সামনে চলে এল গোটা এস্টাবলিশমেন্ট। ভ্যান আর হাটের ওপর চোখ বুলাল ও। মনে হলো একটা ডিপার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ভ্যানটা, ওটার সামান্য দূরে একটা হাট, ছাদে পুক হয়ে জমে আছে ভূধর।

ওগুলো কি? স্নো কুটার?
ভূমারের তেরি ব্যারিকেডের ওপাশে বেশ কয়েকটা মাথা দেখতে পেয়ে

ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল ও। ইয়াল্লা! রাডারের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা...? মর্টারও আছে ওদের সাথে? ওটার কালো মাথা ব্যারিকেডের ওপর দিয়ে খানিকটা জেগে আছে। সাদা ড্রেস পরা এক সৈনিককে ওটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। অফিসার হবে খুব সম্ভব, হাতে একটা মেগাফোন। একদম খোলা জায়গায় বুক চিত্তিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

খুব দ্রুত কম্পাস বেয়ারিং নিল রানা। অনড় জনসনের হাত থেকে মাইক্রোফোন কেড়ে নিয়ে নিজেই ট্রান্সমিট করতে লাগল। 'দিস ইজ সিগ্ন। শত্রুর চোখে পড়ে গিয়েছি আমরা, মিশন বাতিল করা সম্ভব নয়। ওদের পজিশন আজিমাথ থ্রী ওয়ান টু ডিগ্রী ফিফটিন হান্ড্রেড মিটারস। সেভ দ্য কন্টার ইমিডি়েটলি।'

রাশিয়ানদের এত কাছে রয়েছে ওরা, বিশ্বাসই হচ্ছে না রানার। কালো ব্যারেলটার ধোয়ার মেঘ দেখল ও শেষ মুহূর্তে।

শত্রুর দেখা পেয়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না কর্নেল ম্যাকারভ। একই জায়গায়, একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কমান্ড দিচ্ছে। তার হিসেবে ষোলোশো মিটার দূরে আছে শত্রু, তবু রেঞ্জ আরও কমিয়ে সাড়ে পনেরোশো মিটারে গোলা বর্ষণ চালিয়ে যেতে বলল সে। শত্রুকে খতম করা উদ্দেশ্য নয়, জায়গায় আটকে রাখতে চায় ওদেরকে। একই সাথে সিগন্যালারকে নিজেদের ফাইটিং পেট্রলের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে বলল সে, এক্ষণে গ্রেনিয়ারের মাথায় পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই দলটা।

'কমরেড পলকভনিক,' কাজ শেষ হতে চেষ্টা করে বলল সিগন্যালার। 'ওরা ছয় হাজার মিটার দূরে আছে এখনও।'

ওয়েদার যত পরিষ্কারই হোক, ভাবল ম্যাকারভ, এত পথ স্কি করে আসতে কম করেও এক ঘণ্টা লাগবে। নিজে মাইক্রোফোন তুলে নিল সে, পেট্রল বাহিনীর অফিসারকে নির্দেশ দিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসে পিছন থেকে শত্রুকে ঘিরে ফেলতে। ওরা যাতে রিট্রিট করতে না পারে, সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলল।

মাইক্রোফোন সিগন্যালারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সামনে তাকাল সে, তখনই চোখে পড়ল ব্যাপারটা। ওপক্ষের দু'জন উন্মত্তের মত স্কি করে মালভূমির নিচু, শিরার মত এক রিজের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের একজনের কাঁধে মিসাইল লগ্গার।

ওই জিনিস দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল ম্যাকারভ। ড্যাম ইট! তার রাডার ভ্যান আর্মাড নয়, মিসাইল হিট করলে সর্বনাশ। যে কোন মিসাইল হোক, কোন ব্যাপার নয়। রাডার খতম হয়ে যাবে। মর্টার ত্রুদের শিরটা লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিল সে। এক ভীত-সন্ত্রস্ত টেকনিশিয়ান ভ্যান থেকে বেরিয়ে হেঁচট বেতে বেতে ছুটে এল তার দিকে।

'পশ্চিম দিক থেকে দুটো এয়ারক্র্যাফট আসছে, কমরেড পলকভনিক! হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, একইসাথে স্যালুট করার কসরতও করল। 'রেঞ্জ পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার, স্পীড একশো সত্তর। খুব সম্ভব হেলিকপ্টার, হস্টাইল।'

'ধ্যাক্ষ ইউ, কমরেড,' হাত নেড়ে লোকটাকে দূর হয়ে যেতে বলল। ব্যাটা আতঙ্কে নীল হয়ে উঠেছে দেখে তার প্রতি বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গেছে মন।

মনে মনে হিসেব শুরু করে দিল সে প্রায় কম্পিউটারের গতিতে। অজ্ঞাত কন্টার দুটোর গতি, দূরত্ব, তার সাথে টাইমিং, মিসাইল, সবই বিশেষ কিছু ইঙ্গিত দিচ্ছে। খুব সম্ভব ধারেকাছে কোন গান শিপ থেকে আসছে কন্টার, অর্থাৎ নিখুঁতভাবে সমন্বিত এক হিট-আন্ড রান মিশনের মুখে পড়েছে ম্যাকারভ।

চোদ্দ মিনিট কি তারও কম সময়ের মধ্যেই সম্ভবত সব শেষ হয়ে যাবে। সে ফেরে তার ফাইটিং পেট্রল পৌছতে পারছে না, লংইয়ারমিয়েন থেকে রিইনফোর্সমেন্ট আনিয়ে নেয়ারও সময় নেই। তাতেও অনেক দেরি হয়ে যাবে। এখন যা করার তাকেই করতে হবে। সামনের ওদেরকে ঘেরাও করতে হবে, ভাবল সে। স্নো স্কুটারে করে কয়েকজন স্পেসনাজকে পাঠিয়ে দেবে ব্যাটারদের ঠাঙ্গ করতে। একই সঙ্গে চলবে মটারের গোলাবর্ষণও।

এদিকে সে নিজের স্ট্রোলা মিসাইল নিয়ে কন্টারের মুখোমুখি হবে। উপায় নেই। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সূর্য উঁকি দিল তার পিছনে, উত্তর দিগন্তে। এবার আরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে শত্রুদের। আর্কটিকের মাঝরাতের সূর্যের আলো নিশ্চয়ই ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে, ভাবল কর্নেল।

ব্যাপারটা তার জন্যে বোনাস হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে বড্ড লেট বোনাস, এই যা।

দশ সেকেন্ডের ব্যবধানে পরপর চারটে মটার বাতাসে তীক্ষ্ণ শিস কেটে ওদের সামনে এসে পড়ল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কানে তাল লাগে গেল সবার, তুষারের মেঘ লাফিয়ে উঠল শূন্যে। শ্রাপনল আর ছোট ছোট বরফের টুকরো বো বো করে ছোটাছুটি করে বেড়াল। রানা ও সোহানা খুব কাছাকাছি মুখ তুজে পড়ে থাকল তুষারে। জনসন রেডিওর পাশে, অন্যরা যে যেখানে পেরেছে শুয়ে পড়েছে।

গোলা বর্ষণ বন্ধ হতে একে একে মুখ তুলল সবাই, হাত দিয়ে মুখে লেগে থাকা তুষারের গুড়ো পরিষ্কার করে সামনে তাকাল। 'হেভেনস টীথ!' বলে উঠল জনসন। 'এবারেরগুলো নির্ঘাত মাথায় পড়বে!'

তেরো

এখনই বিপদের আশঙ্কা নেই দেখে ভড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা, কয়েক গজ সামনে প্রায় পাশাপাশি সাজি হওয়া চারটে গজ দেখে ভুরু কুচকে উঠল। মতলব কি ব্যাটারদের? ভাবছে ও টার্গেট সংশোধনের চেষ্টা না করে, একবারও না খেমে ভুল টার্গেটে এতগুলো শেল খরচ করার অর্থ কি? ওদেরকে জায়গায় আটকে রাখার জন্যে?

সে যা-ই হোক, তার পিছনে মাথা ঘামানোর মত সময় নেই। যা করার খুব দ্রুত করতে হবে।

'শ্মিথ!' হাক ছাড়ল ও। 'ড্রাগন বের করো, কুইক!' হাত তুলে দূরে শিরার মত জেগে থাকা একটা রাইজ দেখাল। 'ওটার আড়ালে যাচ্ছি আমরা দু'জন। ওখান থেকে মটার এমপ্রেসমেন্ট আর রাডারের ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি এদিক সামাল দাও। ওরা হয়তো আমাদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবে, ঠেকাও ওদের। আমরা যদি সময়মত ফিরতে না পারি, ওখান থেকে পিক করবে, অল রাইট?'

'স্যার!' ইতস্তত করতে লাগল ক্যাপ্টেন। 'আপনারা দু'জন...'

'হোয়াই? এনিথিং রং?'

'না, স্যার। আপনি বললে আমি আর ব্রেভিনস্কি...'

'তু হোয়াট আই সে, ম্যান! রান!'

'রাইট!' ঘুরে নিজের গর্তের দিকে ছুটল সে ড্রাগন আনতে।

'সোহানা, স্কি পরে নাও। মিলার!'

'মেজর!'

'ওয়াচ!'

ত্রিশ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে স্কি পরে নিল রানা ও সোহানা, তারপর মিসাইলের বিযুক্ত অংশ কাঁধে নিয়ে একেবেঁকে ছুটল। রানা আগে, সোহানা পিছনে।

তার আগেই নিজের স্পেশাল স্লাইপার রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেছে মিলার। সাইটে চোখ রেখে স্থির হয়ে শুয়ে আছে। ছয়শো গজের মত দূরে রয়েছে শিরটা, দুই কমান্ডো সেদিকে ছুটেছে স্প্রিন্টারের মত। দেহ সামনে ঝুকে আছে, হাত আর পা ঠোল খাচ্ছে নিয়মিত ছন্দে, কাঁধ ঘনঘন ডানে-বায়ে করছে। রাইফে পৌছতে পাঁচ থেকে ছয় মিনিট লাগবে ওদের, মিলার ভাবল।

মটার বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল মাটি, রাইজের একটা ওপাশে পড়েছে গোলা। চোখের কোণ দিয়ে রাডারের কাছে নতুন তৎপরতা দেখতে পুয়ে ঘুরে তাকাল মিলার। আটজন রশ সৈন্য দৌড়ে গিয়ে চারটা স্নো স্কুটারে উঠে বসল, এক গাদা তুষার ছিটিয়ে এদিকে মুখ করে ছুটে আসতে শুরু করল। সরাসরি সূর্যের আলো পড়ায় ফণিকের জন্যে দৃষ্টি বলসে গেল মিলারের। কয়েকবার চোখ পিট পিট করে আবার তাকাল সে, দেহটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে।

টেলিস্কোপিক সাইটের সাহায্যে স্কুটার বাহিনীকে অনুসরণ করতে লাগল মিলার। বেশ খানিকটা ঘুরে আসছে ওরা। মতলব পরিষ্কার, মেজর রানা ও সোহানার পিছনে পৌছতে চাইছে। তাই যদি হয়, দ্রুত হিসেব কষে ফেলল মিলার, তাহলে তার পাঁচশো গজ সামনে দিয়ে যেতে হবে ওদেরকে: এহুং তার রাইফেলের নির্ভুল লক্ষ্যভেদের দূরত্বও পাঁচশো গজই।

তবে হারামিরা বেশি জোরে ছুটেছে। এই গতিতে চলমান টার্গেটে চেষ্টা করলে স্কি ঠিকই লাগতে পারবে সে, কিন্তু তাতে শিকার মরবে কি না সন্দেহ। আরেকটু ঘুরল মিলার, ব্যারেল ঘোরাল। লীডিং স্কুটার ঘুরে গেছে, সোজা তার দিকেই আসছে। ড্রাইভারের হেলমেট পরা মাথা একদম স্পষ্ট দেখতে পেল সে।

এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই ঝপ করে নিচের দিকে নেমে গেল স্কুটার, গিরিখাতে নেমে পড়েছে।

একটু পরই আবার দেখা দিল ওটা। নাক উঁচু করে ছোট্ট এক লাফে এপারে এসে পড়ল। পরপর তিনটে ঝলি করল মিলার, ড্রাইভারকে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখল। পরমুহূর্তে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল স্কুটার। ওটা উল্টে পড়ার আগমুহূর্তে ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল দ্বিতীয়জন।

'একটা গেল,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'আর তিনটে...' অন্যগুলোকে চট করে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে থেমে গেল। বিপদ টের পেয়ে স্কুটার ছেড়ে নেমে পড়ল লোকগুলো, তার ডান ও বাঁ দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল আধখানা চাদের মত গোল হয়ে। শুয়ে পড়ে ক্রল করে শিরাটার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

ওদিকে রানা ও সোহানা পৌঁছে গেছে ওটার আড়ালে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পা স্থির স্ট্র্যাপমুক্ত করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। ফোস ফোস করে হাঁপাচ্ছে। একটু সামলে নিয়ে মুখ তুলল রানা, ঠিক তখনই আরেকটা শেল এসে পড়ল কয়েক গজ সামনে। টুপ করে ডুব দিল ও। রাইজের একটা অংশ উড়িয়ে নিয়ে গেল গোলাটা। মেটাল ফ্র্যাগমেন্ট আর পাথরের ছোট ছোট টুকরো ছিটকে উঠল আকাশে।

সামলে নিয়ে ব্যস্ত হাতে ড্রাগন লঞ্চারের বাইপডের ভাঁজ খুলল রানা, ওটাকে দাঁড় করিয়ে অপটিক্যাল সাইট অ্যাডজাস্ট করে টিউবের শেষ মাথা কাঁধে তুলে নিল। দাঁতে দাঁত চেপে নির্দেশ দিল, 'লোড!'

সাথে সাথে প্রথম রাউন্ড টিউবে ঠেসে দিল সোহানা, একই মুহূর্তে রানাও ফায়ারিং মেকানিজম টেনে দিল, রুশ তুরা তখন আরেক রাউন্ড গোলা ছোঁড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এক ঝলক ধোঁয়া বের হতে দেখল রানা ড্রাগনের লেজ দিয়ে, কয়েক সেকেন্ডের জানো প্রজেক্টাইলটাকেও স্পষ্ট দেখতে পেল—কাঁপা কাঁপা, কালো একটা বিন্দু, একেবেরে ছুটে যাচ্ছে।

এক মুহূর্ত পর রুশ মর্টার পিট ছিটকে উঠে গেল আকাশে, একই সাথে একটা উজ্জ্বল হলদেটে আলোর ঝলকও দেখা গেল, মর্টারের একটা শেল বিস্ফোরিত হয়েছে। রানার মনে হলো, গোড়া থেকে ছিড়ে যাওয়া রক্তাক্ত একটা হাতও উড়ে যেতে দেখেছে ও।

খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু হতে পারল না। বাতাসে শিস কাটার তীক্ষ্ণ শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও, এদিকেই আসছে। ধ্বংস হওয়ার আগমুহূর্তে রুশ মর্টারের ছোঁড়া শেষ গোলা। অজানা আশঙ্কার ভেতরটা কুকড়ে গেল ওর—আওয়াজটা বাড়ছে। ওদের চারদিকের সাদা পৃথিবী আচমকা বিস্ফোরিত হলো, লঞ্চার উড়ে গেল রানার কাঁধ থেকে।

কতক্ষণ পর হুঁশ হলো খেয়াল নেই ওর, কোথাও আঘাত লেগেছে কি না, অনুভব করার চেষ্টা করল। না, লাগেনি। ভাগ্যবশতাকে ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় কানের কাছে কাউকে পোজাত শুনে অনেক কষ্টে উঠে বসল। সোহানাকে হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে থাকতে দেখে হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ

খেল গেল যেন দেহে, প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে উঠে বসল রানা।

সোহানার রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে তুষার, প্রচুর রক্ত পড়ছে। আঘাতটা ডান পায়ে লেগেছে ওর, হাঁটুর পিছন দিকে। বাঁ পা খালি। স্নো বুটটা দুই গজ দূরে পড়ে আছে। এক লাফে ওর কাছে গিয়ে বসল রানা।

'সোহানা!' ক্রম গলায় ডাকল ও। 'সোহানা!'

সাড়া নেই। তবে এখনও বেচে আছে ও, ধীরগতিতে ওঠানামা করছে বুক। নিখর দেহটার নিচে রক্তের দ্রুত বিকৃতি দেখে আপনাপ্রাণি গাল কুচকে উঠল রানার। তাড়াতাড়ি ওয়েব গিয়ার থেকে একটা ফিল্ড ড্রেসিং বের করে ঝুঁকে বসল ও, সোহানার পায়ের হাঁ হয়ে থাকা বড়সড় ক্ষতটা বেধে ফেলল মজবুত করে। কিন্তু রক্ত পড়া পুরোপুরি বন্ধ হলো না তাতে, ড্রেসিং ভিজে উঠল দেহতে। পারকার নিচে গলায় পেঁচানো নিজের উলের ব্যানডানাটা খুলে ফেলল রানা, ওটা দিয়ে হাঁটুর নিচে কাষে বাঁধল।

এবার কাজ হলো। শিরায় চাপ পড়তে কমে এল রক্ত পড়া। আরও কয়েকটা ঝাঁকি খেয়ে চোখ মেলল সোহানা। ঘোলা চাউনি, কিছু দেখছে বলে মনে হয় না। ওর মুখের মধ্যে একটা মরফিন ক্যাপসুল ছেড়ে দিল রানা, গাল ধরে ঝাঁকাল। 'গিলে ফেলো, সোহানা! ক্যাপসুলটা গিলে ফেলো!'

চোখের মণি নড়ে উঠল সোহানার, চাউনি জ্যান্ত হয়ে উঠল। খানিক এদিক-ওদিক করে স্থির হলো রানার উদ্বিগ্ন মুখের ওপর।

'রানা!' অস্পষ্ট গলায় ডাকল সোহানা। হাসতে চাইল, কিন্তু ব্যথায় কুঁচকে উঠল চোখমুখ। 'কি-কি হয়েছে, রানা?'

'তেমন কিছু না,' ওর মুখের ওপর জমে ওঠা তুষার পরম যত্নে সরিয়ে দিল রানা। 'কিছু না। পায়ে একটা সপ্লিন্টার বিধেছে তোমার। ভয় নেই, আমি ব্যান্ডেজ করে দিয়েছি। কপ্টার এসে পড়বে এখনই। কোন চিন্তা নেই।'

চোখের পাতা বুজে 'হ্যাঁ' বোঝাল সোহানা।

'চুপ করে শুয়ে থাকো। আমি বাকি কাজ সেরে আসছি।'

জবাবের অপেক্ষায় না থেকে উঠে পড়ল রানা, ভয়ের কিছু নেই। সেরে উঠবে সোহানা, আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। লঞ্চার কুড়িয়ে নিয়ে লোড করল ও, কাঁধে তুলে নিল টিউব। বাইপডের ওপর লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টিপে দিল। পারকার ওপর দিয়েও ওটার উত্তাপ অনুভব করল রানা। গাইডেন্সের দিকে মন দিল।

ভ্যানের সাথে ড্রাগনের সংঘর্ষের ইমপ্যাক্ট হলো দেখার মত। মাটির ভিত ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ওটা, পরমুহূর্তে দাঁউ দাঁউ করে আঙন জ্বলে উঠল পেটের কাছে। স্ক্যানার ধোমে গেছে। ভ্যানের যে একটা সাইড দরজা আছে, জানত না রানা। জানল একটু পর, ভেতর থেকে মশালের মত সারা দেহে জ্বলন্ত আঙন নিয়ে লাফাতে লাফাতে এক টেকনিশিয়ানকে বেরিয়ে আসতে দেখে। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে পুরো ভ্যানে আঙন ধরে গেল।

পিছনের কুঁড়ে থেকে কয়েকজন সৈন্যকে দৌড়ে বেরিয়ে আসতে দেখল ও। তাদের একজনের হাতে লম্বা একটা টিউব। মিসাইল! তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল

রানা, আরেক রাউন্ড ঠেসে দিল লাঞ্চারে। আর চারটে মিসাইল আছে ওর স্টকে।

ততক্ষণে অনেক কাছে চলে এসেছে স্নো স্কুটারের সাত সৈন্য। কয়েক পা দৌড়ে আসছে ওরা, শুয়ে পড়ে গুলি করছে, আবার উঠে দৌড়ে আসছে। ওদিকে মিলার, নেইলসন, বাকহার্ড, ব্রেভিনক্সিসহ অন্যরা ব্যস্ত লোকগুলোকে সামলাতে। ওর মধ্যেও কন্টারের কথা ভোলেনি হাওয়ার্ড স্মিথ। ও দুটোকে গাইড করতে হবে। রেডিওর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে সে।

'দিস ইজ সিক্স। আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে শত্রু বাহিনী। আমাদের পজিশন থেকে তিনশো গজ পুবে, রিপটি, তিনশো গজ পুবে রয়েছে ওরা। এগিয়ে আসছে।'

'তিন মিনিট পর মার্কার ছুঁড়বেন,' জবাব দিল পাইলট। 'কি ধরনের অস্ত্র রয়েছে শত্রু বাহিনীর হাতে?'

'মূলত রাইফেল,' স্মিথ বলল। 'মটার ছিল, ধংস করে দেয়া হয়েছে।'

'আমরা আসছি। তিন মিনিটের মধ্যে।'

'কন্টার আসছে,' চেঁচিয়ে সবাইকে জানাল সে। স্ট্রোব লাইট জ্বালানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কাজ হলো না। ধোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু তাতেও সমস্যা আছে, বাতাস যেদিক থেকে বইছে, তাতে ধোয়ার ব্যবস্থা করলে বরং উল্টো হবে। শত্রুকে নয়, ওদেরকেই ঢেকে ফেলবে তা।

অ্যাকশন সব সময় চিন্তা শক্তি বাড়িয়ে দেয় কর্নেল ম্যাকারভের। এ মুহুর্তেও তাই হয়েছে। তার সাদা হুডওয়ালা ওভারস্যুটের ফার আঙনের আঁচে কুকড়ে গেছে, পুড়ে কাপো হয়ে গেছে। পুরো সময়ই যে সে দাঁড়িয়ে ছিল, তা নয়। দূরে মিসাইল লঞ্চারের ধোয়া দেখতে পেয়ে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়েছিল। নইলে বোঁকামি হত।

কিন্তু চোখের সামনে এত সাধের রাডার ধংস হয়ে যেতে দেখামাত্র নিজেকে ফিরে পেয়েছে সে। নতুন প্র্যান নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে দিয়েছে। মটার গেছে, এখন আছে কেবল স্ট্রোব, ওটা দিয়েই শত্রুর কন্টারের মুখোমুখি হওয়ার কথা ভাবছে। তার বাঁ দিকে তিনজন স্পেংসনাজ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের একজনকে হাট থেকে লঞ্চারসহ মিসাইলটা নিয়ে আনতে বলল সে।

লোকটা ফিরে আসতে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'পজিশন নাও। হেলিকপ্টারটা চাই আমার। আমি বললেই ফায়ার করবে।'

শেষদিকের কথাগুলো রানার ছোঁড়া ড্রাগন বিস্ফোরিত হওয়ার বিকট শব্দে চাপা পড়ে গেল। ছিন্তিন্ন হয়ে গেছে কুঁড়েঘর ওটার ধাক্কায়।

'শুয়ে থাকো!' সৈনিককে নির্দেশ দিল সে। 'কন্টার না পৌঁছানো পর্যন্ত মাথা তুলবে না।'

মিসাইল যে ছুঁড়ছে, তার একটা ব্যবস্থা এখনই করা দরকার, ভাবল কর্নেল। নইলে কন্টার এসে পড়লে হয়তো স্ট্রোব কোন কাজে আসবে না। এদিকে পাহারা দেয়ার কিছু নেই, বেশি লোকের প্রয়োজনও নেই। তাই বাকি যে দুই সৈনিক ছিল, তাদেরকে স্কি করে দ্রুত শিবিরের দিকে যেতে নির্দেশ দিল কর্নেল। মিসাইলটাকে স্ক্রু করে দিয়ে আসতে বলল। ওখানে একজন আছে এখন, জানে

সে। তার সঙ্গী হয় নিহত, নয়তো আহত। ব্যাটাকে রাইফেলের রেঞ্জ পেয়ে যদি...

চোখে বিনকিউলার লাগাল। শত্রু বাহিনীর পুবেদিক থেকে এগোতে থাকা স্পেংসনাজ বাহিনীর অগ্রগতি দেখে সমুদ্র হলো কর্নেল। ওদের অগ্রগতি চমৎকার। তার মানে সব আশা ফুরিয়ে যায়নি এখনও, কবীর চৌধুরীর ইচ্ছে পূরণের একটা সুযোগ হয়তো এখনও আছে। ওই লোকটাকে সমুদ্র করা গেলে হয়তো...

হেলিকপ্টারের ওপর চোখ পড়ল ম্যাকারভের-দুটো। উচু রিজ ঘুরে এগিয়ে আসছে। বানিকটা হলুদ ধোয়া লাফিয়ে উঠতে দেখল সে শত্রুর মূল দলের অবস্থানের কাছে, তারপরই তুষারে খুব দ্রুত ছড়াতে লাগল হলুদ রং। ওটা মার্কার। কল্পনায় ক্যানিস্টারটা দেখতে পেল কর্নেল। উপুড় হয়ে রং ছড়াচ্ছে, দ্রুত গলে যাচ্ছে তুষার। ধোয়ার কুণ্ডলীটা বাতাসের টানে রিজের দিকেই উড়ে যাচ্ছে দোবে মনে মনে হাসল সে।

দুটো কন্টারের মাঝে একশো মিটারের মত ব্যবধান সম্ভবত। প্রথমটা লেজ নিক্ষেপ করে ল্যান্ডিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'ফায়ার!' হুকার ছাড়ল ম্যাকারভ। মনে মনে প্রার্থনা করল, ব্যাটার এইম যেন নির্ভুল হয়। অবশ্য একটু এদিক সেদিক হয়ে গেলে সমস্যা নেই। স্ট্রোব উত্তাপ-সহনীয় মিসাইল, এয়ার ক্রাফটের কাছে পৌঁছতে পারলে উত্তাপের সূত্র, অর্থাৎ ওটার এঞ্জিন নিজেই খুঁজে নেবে।

পনেরো সেকেন্ড পর তার প্রার্থনা কবুল হলো। শূন্যে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল প্রথম কন্টার, মিসাইলের বিস্ফোরণ ও স্ট্রোবের পাত ছেঁড়াখোঁড়ার ভয়াবহ শব্দ উঠল। আছড়ে পড়ল ওটা কাত হয়ে। একটু পর আকাশে লাফিয়ে উঠল দাঁউ দাঁউ আঙন। আনন্দে নেচে উঠল কর্নেলের বুক, রেডিও মাইক্রোফোন মুখের সামনে তুলে ধরল মহাব্যস্ত হয়ে।

'অ্যানল্ট!' চেঁচিয়ে কমান্ড করল। 'নাউ! গেট দেম!'

তুষারের বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সাত স্পেংসনাজ, এলোমেলো পায়ে ছুটল শত্রুর দিকে। বিনকিউলারে চোখ রেখে সেদিকে তাকিয়ে আছে কর্নেল। আশা পূরণের অপেক্ষায় আছে। সে জানে এটাই তার শেষ সুযোগ।

মার্কারের হলুদ ধোয়া বাতাসের টানে পল মিডল্যান্ডকে ঘিরে ফেলেছে। প্রথম কন্টারকে সঙ্কেত দিতে যাচ্ছে সে। নাকের সামনে হাত দিয়ে বাতাস করে বদ গন্ধওয়ালা ধোয়া তাড়াতে ব্যস্ত। একটু একটু করে কেটে গেল ধোয়া, মুখ তুলে তাকাল সে।

অন্যতঃ হয়ে দেখল প্রথম কন্টারটা নরওয়েজিয়ান এক সী কিং। দেহের পাশে জাতীয় প্রতীক আঁকা আছে ওটার। সামলে নিয়ে সঙ্কেত দিতে শুরু করল সে। নামছে সী কিং, ব্রাইডিং ডোর খুলে গেছে। পাগলের মত হাসতে লাগল মিডল্যান্ড। কিন্তু পরমুহুর্তে হঠাৎ করে যন্ত্রটার ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকি খেতে দেখে গলার কাছে আটকে গেল তার হাসি। মিসাইলের শব্দ শুনে পায়নি।

চোখের সামনে সুন্দর, নককবাকে কন্টারটাকে ভেঙেচুরে আছড়ে পড়তে দেখে চরম বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সে। পরক্ষণে কেবিনের ভেতরে ক্রু চীফকে নিজের দিকের দরজা খোলার জন্যে টানা হ্যাঁচড়া করতে দেখে হুঁশ হলো, ছুটে গেল সে। ককপিটে দুই পাইলটকে দেখল স্থির হয়ে বসে আছে। স্ট্র্যাপের টানে ঝুলছে। রক্তের আর মাংসের দুটো দলা। ভয়ে ভয়ে কাত হয়ে পড়ে থাকা কন্টারের ওপরে উঠে দাঁড়াল মিডল্যান্ড।

ওকে দেখতে পেয়ে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠল ক্রু চীফ, জরুরী ভঙ্গিতে বারবার বাইরে থেকে দরজা খোলার ইঙ্গিত করতে লাগল। দুই-তিন হ্যাঁচকা টানে ওটা খুলে ফেলল পল, হাত বাড়িয়ে লোকটাকে বের করে আনল। তার হেলমেটের সাথে ইন্টারকমের ছেঁড়া লীড ঝুলছে খানিকটা। হেলমেট ছুড়ে ফেলে দিল লোকটা, পলের পিছন পিছন দৌড় দিল।

আট-দশ পা গিয়ে পিছনে হালকা বিস্ফোরণের শব্দ ও পিঠে গরম ভাপ লাগতে ঘুরে তাকাল পল। ক্রু-চীফও ঘুরল। সী কিংকে ঘিরে আগুনের নৃত্য দেখতে পেল তারা। দুই পাইলট যে যার সীটে তেমনি অনড়। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় কন্টার দেখতে পেল পল, এগিয়ে আসছে।

ওদিকে ডেপুটি লিডার শিথ প্রথম কন্টারের করুণ পরিণতি দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বেকুব হয়ে গেল। একটু পর সামলে নিয়ে দ্বিতীয়টার আমেরিকান পাইলটের সাথে কথা বলতে শুরু করল।

'ওকে, কামন ইন,' বলল সে। 'ওদেরকে ঠাণ্ডা করার জন্যে মিসাইল আছে আমাদের কাছে।'

'শিওর থিং,' জবাব দিল পাইলট। ভয় পেয়ে থাকলেও গলার স্বরে তা বোঝা গেল না। 'আমি আসছি।'

'আপনার ঠিক পঞ্চাশ গজ সামনে আমাদের চারজন আছে, একজন আহত। প্রথমে ওদেরকে তুলে নিয়ে আসুন।'

একটু বিরতি। 'হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি।'

'ফাইভ ক্যাল মেশিনগান নিয়ে এসেছেন সঙ্গে?' প্রশ্ন করল শিথ হাওয়ার্ড।

'অবশ্যই!'

'ওভ! ওদের আশেপাশে শত্রুপক্ষের রাইফেল বাহিনী আছে, সাবধানে যাবেন। বেস্ট অভ লাক!'

বড়জোর দশ ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেল কন্টার। সিএইচ-৪৬ ওটা, পেটে বড় করে MARINE CORPS লেখা দেখে বড় শান্তি লাগল শিথের।

একটু পরই ওটার পার্সপেক্স ব্রিস্টার থেকে মেশিনগানের টানা আগুয়াজ গুনতে পেল সে। একই সাথে পাইলটের গলাও। 'উই হ্যাভ ইওর গাইজ ডিজুয়াল,' বলল লোকটা। 'ব্র্যান্ড অলসো দ্য এনিমিঞ্জ।'

হাসল ডেপুটি। 'থ্রেট। তুলে আনুন ওদের।'

বরফের খোলা মাঠে স্তম্ভ করে রাখা ত্রিভুজ বোড়ার যন্ত্রপাতির আড়ালে গায়ে গায়ে বসে আছে মিলার, জনসন, নেইলসন ও বাকহার্ড। সুবিধের জন্যে স্তম্ভের পিছনে হ্যাঁচড়াপাচড়ে একটা গর্তও করে নিয়েছে। নেইলসন আহত, গুলি বেয়েছে

উরুতে। জনসন আগে থেকেই বেকার। আহত হাত দিয়ে রাইফেল তুলতে পারছে না বলে গুলি করতে পারছে না।

পিছনে রোটরের তীক্ষ্ণ চুই চুই শব্দে ঘুরে তাকাল মিলার, আমেরিকান কন্টারটা চোখে পড়তে খুশি হয়ে নতুন উদ্যমে শত্রু ঝুজতে লেগে গেল। প্রথম আটজনের মাত্র তিনজনকে ফেলতে পেরেছে সে, এখনও রয়ে গেছে পাঁচজন। বৃকে হেঁটে এগিয়ে আসছে। সেদিকে রাইফেল তাক করে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষায় আছে মিলার। মন চাইছে কন্টারে উঠে পড়ে, কিন্তু জোর করে মনটাকে সামনের দিকে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করল সে।

ধৈর্যের ফল পাওয়া গেল একটু পরেই। এক স্পেসনাজ পলকের জন্যে মাথা তুলেই নামিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল, বাট করে নল একটু ঘুরিয়ে হেয়ার ট্রিগার টেনে দিল মিলার। পিছনদিকে জোর এক ঝাঁকি খেল মাথাটা, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যাটা মরেছে কি না জানে না মিলার, তবু গোণায় ধরে নিল।

'এবার চলো!' চেষ্টায়ে বলল বাকহার্ড। আরেকবার চারদিক দেখে নিল মিলার। দেখতে পেল নেমে পড়েছে সি-এইচ ৪৬। পাইলট বুড়ো আঙুল ওপরমুখো করে ঘন ঘন বাকছে-উঠে পড়ার সঙ্কত দিচ্ছে। আরও একটু অপেক্ষা করার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু পাইলট ও সঙ্গীরা অধৈর্য হয়ে উঠছে দেখে উঠে পড়ল, নেইলসনের পাশে চলে এল। উরুতে গুলি খেয়েছে বেচারী। তাকে ফায়ারম্যানদের কায়দায় কাঁধে তুলে নিয়ে হেঁচট খেতে খেতে ছুটল কন্টারের দিকে। জনসন আর বাকহার্ডও আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

সুযোগ বুঝে উঠে পড়ল বাকি চার স্পেসনাজ, সমানে গুলি চালাতে আরম্ভ করল। এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে, কিন্তু স্কির কারণে সুবিধে করতে পারছে না। নেইলসনকে কন্টারে তুলে দিয়ে মিলার নিজেও উঠল, জনসন আর বাকহার্ড কি ইত্যাদি যা যা আছে, বাটপটু তুলে ফেলতে লাগল কন্টারে। লিডারের নির্দেশ আছে, কোন গিয়ার ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না।

জনসন উঠল সবার শেষে। কিন্তু তাড়াহড়ায় মনের ভুলে বাঁ হাতে ডোর ফ্রেম ধরে উঠতে গিয়ে ব্যথায় চিৎকার করে উঠল ভাঙা হাড়ে টান পড়ায়। বাঁ হাত ছেড়ে ডান হাতে ডোর ফ্রেম ধরার চেষ্টা করল সে। হলো না, পিঠ দিয়ে আছড়ে পড়ল ভূষারে। হ্যাঁচড়াপাচড়ে উঠে পড়ল, তখনই খেল গুলি। একদম ঘাড়ে। সামনের দিকে এক পা এগিয়ে এল সে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল মিলার। বাকহার্ডের সাহায্যে তুলে নিল প্রায় অচেতন লোকটাকে।

উঠে পড়ল কন্টার। জনসনকে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে ব্যস্ত হাতে তার পারকার হুড খুলে ফেলল বাকহার্ড, ফতটা দেখল। আটারিতে লেগেছে গুলি, দমকে দমকে রক্ত বেরোচ্ছে। আপনমনে মাথা নাড়ল হতাশ বাকহার্ড। রক্ত পড়া বন্ধ করতে উঠে পড়ে লাগল। নেইলসন আর মিলারও হাত লাগাল তার সাথে।

ঘুরে এগোল সিএইচ-৪৬, জ্বলন্ত সী কিংের ধোঁয়ার আড়ালে এসে শিথ, পল মিডল্যান্ড ও নরওয়েজিয়ান ক্রু চীফকে তুলে নিল। আন্দাজে গুলি ছুঁড়ছে স্পেসনাজ, একটু পর পর ফিউজলাজে ঠক ঠক করে বিধ্বংস একটা-দুটো।

শিথ উঠেছে সামনে, দুই পাইলটের মাঝখানে বসে আঙুল তুলে মাসুদ রানা

আর সোহানাকে দেখল সে। রাশিয়ানদের অবস্থান দেখে নিয়ে মাথা দোলাল পাইলট। 'কোন চিন্তা নেই।' ব্যাটারদের সঙ্গে মিসাইল নেই দেখে আশ্বস্ত হলো সে। রাইফেল দিয়ে বিশেষ কিছু করতে পারবে না ওরা।

হঠাৎ দূরে অন্য কিছু দেখতে পেল সে। 'শিট! হোয়াট দ্য হেল!'

স্মিথও তাকাল সেদিকে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া রুশ মর্টার পিটের কাছে কে যেন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, একা। বিনকিউলারে চোখ রেখে এদিকেই তাকিয়ে আছে।

'শালা, পাগল নাকি?' কন্টার রানা-সোহানার অবস্থানের দিকে ঘুরিয়ে দিল পাইলট। 'নেপোলিয়নের বাচ্চা!'

দূর থেকে লীডারকে দেখতে পেল স্মিথ, কাঁধে ড্রাগন মিসাইল, মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। ওর পায়ের কাছে রক্তের পুকুরের মধ্যে শুয়ে আছে সোহানা। 'হারি আপ! হারি আপ! হারি আপ!' বিড়বিড় করে বারবার বলতে লাগল সে। বাকি চার রাশিয়ান ওদের দৃশ্যে গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কন্টারের আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকাল রানা।

কিন্তু নড়ল না। কোন রকম ব্যস্ততা দেখা গেল না ওর মধ্যে। ঘুরে সামনে নজর দিল। শেষ মিসাইল ছুঁড়তে প্রস্তুত।

'ওটা কি?' রুশ মর্টার পিটের কাছে আরেকটা কাঠামো দেখতে পেয়ে টেঁচিয়ে উঠল স্মিথ। বিনকিউলার চোখে লাগল। পরক্ষণে দম আটকে এল তার। 'হোলি শিট! মিসাইল ছুঁড়তে যাচ্ছে ওরা!'

'মিসাইল' শব্দটা কানে যেতে আড়ষ্ট হয়ে গেল ক্যান্টেন। ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে চেহারা।

ব্যাপারটা চোখে পড়লেও রানা নির্বিকার, উত্তেজনার ছিটফোঁটাও নেই ওর মধ্যে। অনেকক্ষণ থেকে এই মুহূর্তটির অপেক্ষায়ই ছিল ও। আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা কাঠামোটোর পাশে প্রার্থিত কাঠামোটাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে ড্রাগনের ট্রিগারে চেপে বসল ওর তর্জনী। ওর মত ওই লোকটার কাঁধেও একটা স্ফা টিউব। দ্বিতীয় কন্টার লক্ষ্য করে ছুঁড়তে যাচ্ছে। মনে মনে তিন পর্যন্ত গুনল রানা, সাইটে চোখ রেখে দম বন্ধ করে ট্রিগার টেনে দিল। জোর এক বাকি খেয়ে উড়াল দিল ড্রাগন।

টিউব নামিয়ে একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। একটু পাশ ফিরে, এক হাঁটু ভেঙে। ক্রান্ত ভঙ্গি।

মাটির বুক থেকে দ্বিতীয় কাঠামোটাকে চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখে টিউব ছেড়ে দিল রানা। প্রথম কাঠামোটোও হাওয়া হয়ে গেছে। দু'মিনিট পর রানা সোহানাকে তোলার হলো কন্টারে। ক্রু চীফ আর গানার ব্যস্ত হাতে একটা হেঁচকারে গুইয়ে দিল সোহানাকে। একটা কমব্যাট জ্যাকেট ভাঁজ করে গুঁজে দেয়া হলো ওর মাথার নিচে।

'স্মিথ, গিয়ার কিছু পড়ে থাকেনি তো?' প্রশ্ন করল রানা।

'না, মেজর। সব তোলা হয়েছে।'

'এনি ক্যান্ডিলাট?'

'না। তবে জনসন গুলি খেয়েছে।'

লোকটাকে পরখ করে দেখল ও। পিছনদিকে আরেক হেঁচকারে শুয়ে আছে, জ্ঞান নেই। 'কোথায় লেগেছে?'

'বাড়ে, স্যার, বাকহার্ড বলল পাশ থেকে।'

'কি অবস্থা?'

মাথা ডানে-বায়ে করল সে। বিষণ্ণ।

একটু পর চোখ মেলল জনসন। মুখের ওপর লীডারকে ঝুঁকে বসা দেখে

ঠোঁট বঁকে গেল-হাসছে। 'স্যা-স্যার...মেজর, মি-মিশন...'

ব্যাপারটা সিনেমার মত মনে হলো রানার। মৃত্যুর আগমুহূর্তে এরকম প্রশ্ন ব্যস্তবে কেউ করে না। 'মিশন সাকসেসফুল, জনসন, বলল ও। 'হাস্তেড পার সেন্ট সাকসেসফুল। চিন্তা করো না, শিপে ফিরে যাচ্ছি আমরা। ওখানে বড় ডাক্তার আছে, ঠিক হয়ে যাবে তুমি।'

'সত্যি...মেজর!'

'অবশ্যই!' জোর দিয়ে বলল রানা। 'তোমার আঘাত সিরিয়াস কিছু নয়, বাকহার্ড বলেছে আমাদের। ছোট্ট একটা অপারেশন করলেই সেবে উঠবে তুমি। জাহাজে ফিরে...' ধেমে গেল মুঠোয় ধরা জনসনের হাতটা শিথিল হয়ে গেছে টের পেয়ে। নাড়ি দেখল-নেই।

ওর মিথো আশ্বাস শুনতে শুনতে মারা গেছে মেডিক জনসন।

একটু পর উঠল রানা, দীর পায়ে সোহানার কাছে এসে বসল। ওর একহাত মুঠোয় তুলে নিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল, 'ভয় নেই। মন শক্ত রাখো। জাহাজে পৌঁছলেনই...'

চোদ্দ

ট্রমসো, নরওয়ে।

হলধুল পড়ে গেল নেভাল এয়ারবেসে। এক কুড়ি সী কিং প্রায় একযোগে স্টার্ট নেয়ায় কাঁপছে গোটা এলাকা, আওয়াজে কান পাতা দায়। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই রোটর ব্লেডের ক্লিক, বলসে যায় নজর।

কাছেই ব্যারাকের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন নরওয়েজিয়ান আর্মি অফিসার চড়া গলায় একের পর এক নির্দেশ দিচ্ছে। ব্যারাক থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে ফুল ইউনিফর্মড তিনশো ফলশ্রিময়োগার, তাদের বুকের কাছে দু'হাতে ধরা আছে কারবাইন, নল একটু ওপরদিকে।

আগে থেকে নির্দিষ্ট করে রাখা সী কিং উঠে পড়ল তারা, এক এক করে আকাশে উঠে পড়ল ওগুলো। তিনটে করে তীরের মাথার আকৃতি নিয়ে হা-হা করে ছুটল লংইয়ারবিয়নের উদ্দেশে। একটা রয়েছে সামনে-লীডার, একটা পিছনে-টেইল।

এক ঘণ্টা পর লংইয়ারবিয়নের দক্ষিণ আকাশ ছেয়ে ফেলল সী কিং বহর,

এক এক করে নামতে শুরু করল এয়ারফিল্ডে। দুটো করে তীরের মাথা ল্যান্ড করে, সৈন্য নামিয়ে উঠে যায়, আবার দুটো তীরের মাথা নামে। দেখতে দেখতে এয়ারফিল্ড ভরে উঠল নরওয়েজিয়ান সৈন্যে। চারদিকের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাস্থলের দিকে ছুটে গেল তারা, একেবারে বিনা বাধায় দখল করে নিল সবকিছু।

বাধা দেয়ার কথা ভেবেছিল সোভিয়েত বর্ডার পুলিশ, কিন্তু ওপর থেকে কোন নির্দেশ না পেয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের কাজ দেখতে লাগল তারা।

প্রাটা বেরগেট রাজার ধ্বংস হওয়ার খবর পেয়ে বোজ-খবর নিতে তৎক্ষণাৎ সেখানে চলে গিয়েছিল কবীর চৌধুরী, আর ফেরেনি।

ওদিকে সন্দের দিকে প্রাণে বেঁচে যাওয়া তিনজন স্পেশুনাজ সহ ব্যারেন্টসবার্গ ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে কর্নেল ম্যাকারভ। ভীষণ ক্লান্ত তখন সে, চেহারা পুরাজয়ের গ্লানি।

নরওয়েজিয়ান ডেস্ট্রয়ার স্কল। ওটার ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন জোহানসন। চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে দূরের প্রকাণ্ড রাশিয়ান বাণিজ্য-জাহাজটির দিকে তাকিয়ে আছেন। গতকাল দুপুর থেকে ওটাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছেন তিনি। ডেডলাইনের অপেক্ষায় রয়েছেন।

ভোর তিনটেয় রাডারে দেখা গেল সোয়ালবারের বারো মাইলব্যাপী নিজস্ব পানিসীমায় ঢুকতে যাচ্ছে ওটা, দক্ষিণ প্রান্তের সরক্যাপের দিকে এগোচ্ছে।

ফুল অ্যাহেড নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন, গভীর চেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে ওটার দিকে ছুটে চলল স্কল। তার বো-র সাথে বাড়ি খেয়ে ভেঙে পড়ছে চেউ, ছিটকে উঠে ডেক আসিয়ে দিচ্ছে।

রুশ জাহাজের দশ কেবলের মধ্যে পৌছে ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সিতে রেডিও অন করলেন ক্যাপ্টেন, ওটা নরওয়ের পানিসীমায় ঢুকতে যাচ্ছে বলে সতর্ক করলেন। জবাবে ধমক লাগল রুশ ক্যাপ্টেন, কেটে পড়তে বলল। অ্যাকশন স্টেশন ঘোষণা করলেন ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপ্টেন। ইন্টারন্যাশনাল ওয়েভলেংথে কথা বলছেন তিনি, ফলে সবাই গুনতে পেল সে নির্দেশ।

গতি কমেছে না রাশিয়ান জাহাজটার? ভাবলেন তিনি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন ওটার প্রকাণ্ড হালের দিকে। নাহ, আগের কোর্সেই রয়েছে। ভেতরে ভেতরে স্নায়ু টানটান হয়ে আছে ক্যাপ্টেনের। জাহাজটার পিছনে কয়েক হাজার মাইলের উন্মুক্ত আর্কটিক সাগর, তাঁকে সাহায্য করার জন্যে পর্যাপ্ত নৌ-শক্তি রিজার্ভ আছে ওখানে, ডাকলেই ছুটে আসবে।

কিন্তু রুশ জাহাজটিকে সাহায্য করার জন্যে আছে ওদের গোটা নর্দার্ন ফ্লীট এবং তার বিমান বহর। যদি তাকে শেষ পর্যন্ত ধোলা ছুড়তেই হয়, কি হবে ফল? ওরাও নিশ্চয়ই ছেড়ে কথা বলবে না, হয়তো আক্রমণ করে বসবে। কিন্তু সে ভয়ে দ্বিধা করলেন না ক্যাপ্টেন, মাইক্রোস্কোপ তুলে নরওয়েজিয়ান ও ইংরেজিতে সতর্ক করলেন, যদি ওটা এখনই দিক না বদলায়, আক্রমণ করতে বাধ্য হবেন তিনি।

উত্তর নেই। একই গতিতে একইদিকে এগিয়ে চলেছে রুশ বাণিজ্য জাহাজ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে গান ক্রুদের ওটার রেঞ্জ ও বিয়ারিং জানালেন ক্যাপ্টেন, তারপর শেষবারের মত ওটাকে সতর্ক করার প্রস্তুতি নিলেন। এমন সময় সুমতি হলো রুশ জাহাজটার। স্টারবোর্ডের দিকে ঘুরে যেতে শুরু করল ধীরে ধীরে। একটু কাত হয়ে গেল গতির কারণে।

এক সময় ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে ফিরতি পথ ধরল রুশ বাণিজ্য জাহাজ। ছোট হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

লংইয়ারবিয়েন।

কন্ট্রোল টাওয়ারে নিজের ডেস্কে বসে আছে ফ্রেডারিক ফলভিক। আজ খুব ভাল লাগছে তার, খুশি খুশি লাগছে মনটা। সব আবার আগের মত নিজের মনে হচ্ছে।

রাশিয়ানরা চলে গেছে, যেতে বাধ্য হয়েছে। আগের মত অ্যারোফ্লোটের অফিসটা আছে অবশ্য, সীমিত কয়েকজন স্টাফও আছে—বাস, ওই পর্যন্তই। নতুন 'ম্যানিজার' এসেছে তাদের, সিমানভ। মন্দ নয় সে। সিভিলিয়ান, আচার আচরণ ভালই।

মুখ তুলে প্রাটা বেরগেটের দিকে তাকাল ফলভিক, গভীর চেহারা দাঁড়িয়ে আছে ওটা। মাথার বরফের তার এখন অনেকটা কমেছে তার, আর কদিন পর একদম গলে যাবে। তারপর একদিন ছোট ছোট লাল-হলুদ বুনো ফুল ফুটবে ওপরে, গোটা উপত্যকা ছেয়ে ফেলবে। রেইনডিয়ার ঘুরে বেড়াবে তার মধ্যে।

একটা ধাতব কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বাস্তবে ফিরে এল সে, মাইক্রোস্কোপের দিকে হাত বাড়াল। এক এসএএস ফ্লাইটের ক্যাপ্টেন ল্যান্ড করার অনুমতি চাইছে। বেখেয়ালে 'রানওয়ে ইজ ফ্রী ফর ল্যান্ডিং' বলতে যাচ্ছিল সে, শেষ মুহুর্তে সামলে নিল।

দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'ইউ আর ক্লিয়ার টু ল্যান্ড।'

মুচকে হাসল সে। অনেকদিন পর প্রচলিত ইডিয়মটা আওড়াবার সুযোগ পেয়ে ভাল লাগল।

তার জীবনের নতুন এক অধ্যায় শুরু হলো আজ থেকে।

আর, হ্যাঁ। মেয়েটা কথা দিয়েছে ওকে।



Lemon

A lonely man in the crowded planet